সুভাষচন্দ্র ও ব্রিটিশরাজ

নন্দ মুখোপাধ্যায়

মডার্ন কলাম
১০/২ এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : ১৯৬০

প্রকাশিকা :
লতিকা সাহা/মডার্ন কলাম
১০/২ এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ : দেবাশীষ দেব

মুদ্রাকর :
শ্রীদুর্গাপদ ঘোষ। শ্রীঅরবিন্দ প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রয়াত সংগীত শিল্পী ও সুরকার

শৈলেন মুখোপাধ্যায়-এর

স্মৃতির উদ্দেশ্যে

এই লেখকের অন্যান্য বই

Netaji Through German Lens.

Subhas Chandra Bose : The British Press,
Intelligence and Parliament.

Vivekananda's Influence on Subhas

জার্মানীর চোখে নেতাজী

বিবেকানন্দের আলোয় সুভাষ

ভারতে সন্ত্রাসবাদ—চার্লস টেগার্ট—অনুবাদ ও সম্পাদনা

ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টান অনুরাগীদের চোখে শ্রীরামকৃষ্ণ (যন্ত্রস্থ—সম্পাদনা)

Sri Ramakrishna in the eyes of Brahma and
Christian Admirers (Edited).

Ramakrishna : His Life and Sayings—Max Mueller
(Edited).

Keshub Chander Sen—Max Mueller (Edited).

Sri Sarada Devi : Consort of Sri Ramakrishna (Edited).

I Point to India—Max Mueller (Edited).

কয়েকটি কথা

ইংরেজ শাসককুল সুভাষচন্দ্রকে দেখেছিলেন ভারতে ব্রিটিশ শাসনের এক চরম শত্রু হিসেবে। তাঁকে সন্ত্রাসবাদী এবং বলশেভিক চিন্তাধারায় প্রভাবিত একজন আপোস-বিমুখ বিপ্লবী নেতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। আবার, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন সুভাষচন্দ্র অক্ষঃশক্তির সহযোগিতায় সশস্ত্র সংগ্রাম মারফৎ ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টা চালান, তখন তাঁকে ইংরেজ শাসকবর্গ ফ্যাসীবাদী ও নাৎসী বলে প্রচার শুরু করেন।

ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে তাঁর আপোসহীন মনোভাব এবং মানবজাতির কল্যাণে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করার জন্য তাঁর নিরবিচ্ছিন্ন লড়াইকে সমগ্র ইংরেজ জাতির প্রতি তাঁর ঘৃণার প্রকাশ বলে চিত্রিত করা হয়েছে। ভারতে ও বিদেশে তাঁর সংগ্রামী ভাব-মূর্তিকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে নষ্ট করার চক্রান্ত চালানো হয়েছে।

ইংরেজ শাসন ও শোষণের কবল থেকে ভারতকে মুক্ত করার বিষয়ে সুভাষচন্দ্র কঠিনতম পন্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী হলেও, তিনি ইংরেজ জাতিকে প্রাপ্য সম্মান দিতে কখনও কুণ্ঠিত হন নি। তিনি মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে ইংরেজ জাতির অবদানকে স্পষ্টভাষায় স্বীকৃতি জানান।

অপরপক্ষে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী ও রেকর্ডে সংরক্ষিত দলিলগুচ্ছ, যার বিশেষ বিশেষ অংশ এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, প্রকাশ করে যে সুভাষচন্দ্রের প্রতি সরকারী দৃষ্টিভঙ্গি চরম শত্রুভাবাপন্ন হলেও ব্রিটিশ কূটনীতিবিদ ও শাসকশ্রেণী তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, প্রখর বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বহু সম্ভ্রান্ত ব্রিটিশ নাগরিক ও পার্লামেণ্ট সদস্য তাঁর আত্মত্যাগের মানসিকতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তায় মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং তাঁর প্রতি অমানবিক ব্যবহারের জন্য নিজেদের সরকারের তিক্ত ও কঠোর সমালোচনা করেন।

বর্তমান বিষয়ের উপর লেখা আমার ইংরেজী গ্রন্থটির জনপ্রিয়তা ও পাঠকবর্গের অনুরোধ এই বইটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশের অনুপ্রেরণা দেয়। আমার বিশ্বাস সুভাষচন্দ্রের বিশাল কর্মময় জীবনের বহু অজানা দিক এই গ্রন্থে সর্বপ্রথম উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। সরকারী দলিল এবং সংবাদপত্রের রিপোর্ট এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্যকে বহু পরিমাণে বৃদ্ধি করবে এবং ভবিষ্যৎ গবেষকদের নিকট এই গ্রন্থ বিশেষ সমাদর লাভ করবে বলেই আমার ধারণা। যা' হোক সে বিচার পাঠকবর্গই করবেন।

লণ্ডনে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী ও রেকর্ডের ডাইরেক্টর মিঃ বি. সি. ব্লুমফিল্ড-এর নিকট আমি বিশেষভাবে ঋণী। সংরক্ষিত দলিলের ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার জন্য আমি Her Majesty's Stationery Office-এর নিকট কৃতজ্ঞ। একথা স্বীকার

করতে আমার দ্বিধা নেই যে এই গ্রন্থের প্রকাশ সম্ভব হ'ত না যদি না ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী ও রেকর্ড এবং ব্রিটিশ লাইব্রেরীর সংবাদপত্র বিভাগের কর্মীরা আমাকে সাহায্য করতেন। যাঁদের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী তাঁদের মধ্যে আছেন শ্রীমতী প্রতিভা বিশ্বাস, মিস্ মার্গারেট মিডেন, মিসের্স ওয়ার্ড, মিঃ এ. গ্রিফিন, মিঃ ডি. এম. মিচেল, মিঃ জি. হান্না, ডঃ পিঙ্গল, মিঃ এম. মোয়ার, মিঃ এম. জে. পোলক, মিঃ সিমস্ ও মিঃ ব্লেক।

গ্রন্থটি প্রকাশনার ব্যাপারে যাঁরা আমায় বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন তাঁরা হলেন সর্বশ্রী সৌরেন মুখোপাধ্যায়, কানাইলাল মুখোপাধ্যায়, পান্নালাল মুখোপাধ্যায়, রবীন মুখোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়, সুব্রত গাঙ্গুলী, শিবাজী গাঙ্গুলী, সঞ্জীব গাঙ্গুলী, মিঃ জি. পোরটেন, মিসের্স ভিলবার্জ ও শ্রীমতী সিগলিণ্ডে মুখোপাধ্যায় (ভিলবার্জ)। এঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আমার গবেষণার কাজে যাঁরা সর্বদা আমার উৎসাহ দিয়ে থাকেন তাঁদের নাম না উল্লেখ করলে আমি কর্তব্যচ্যুত হ'ব—এঁরা হলেন রামকৃষ্ণ মিশনের শ্রদ্ধেয় বিভূতি মহারাজ, বিশ্বনাথ মহারাজ, রথীন মহারাজ, অমিতাভ মহারাজ, বরুণ মহারাজ এবং প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীমনোজ বসু।

উপদেশ দিয়ে যাঁরা আমার বিশেষ উপকার করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন ডঃ সুব্রত গুপ্ত, ডঃ সুকুমার আচার্য, ডঃ ডি. এন. বক্সী, সর্বশ্রী সুপ্রিয় বন্দোপাধ্যায়, অমল সেনগুপ্ত অসীম কর, সুভাষ নাথ, বিজয় নাগ, দেবেন চট্টোপাধ্যায়, গৌতম বসু ও তপন চট্টোপাধ্যায়।

এই বইটির প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করে শ্রীমতী লতিকা সাহা জাতির প্রতি এক মহান কর্তব্য পালন করেছেন বলেই আমার ধারণা।

মূল ইংরেজী গ্রন্থের অনুবাদের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য শ্রীমান হিমাদ্রিকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে গবেষণামূলক কাজ করার বিশেষ উৎসাহ ও প্রেরণা পেয়েছিলাম আমার অগ্রজ প্রয়াত সংগীত শিল্পী ও সুরকার শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের কাছে। তাই তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থটি উৎসর্গ করলাম।

নন্দ মুখোপাধ্যায়

সাত-এর এইচ এস. আর. দাস রোড,
কলকাতা-৭০০০২৬
১লা ডিসেম্বর

কেমব্রিজ—প্রস্তুতির পথে এক নেতা

নতুন শাসনতন্ত্রের অধীনে একজন আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন আই. সি. এস-এর জীবন যেহেতু অসহনীয় হবে না এবং আগামী দশ বছরের মধ্যে ভারত স্বায়ত্তশাসনাধিকার লাভ করবে, জানকীনাথ বোস তাই তাঁর পুত্র সুভাষকে ১৯২০ সালে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বসাতে চেয়েছিলেন।

প্রস্তাবটি সুভাষকে অত্যন্ত বিস্মিত করল, কারণ পরিস্থিতির প্রভাবে তাঁর মনোবিদ্যা-সংক্রান্ত গবেষণার পরিকল্পনা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। মনোবিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের ব্যাপারে দুঃখিত ছিলেন না তিনি, কিন্তু ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে যোগদান এবং বৃটিশ সরকারের অধীনে একটি চাকরি গ্রহণের কি হবে? তিনি স্বপ্নেও সে কথা ভাবেন নি। সে যাই হোক তিনি নিজেকে বোঝালেন যে, এই স্বল্প সময়ের প্রস্তুতিতে তিনি কখনই আই. সি. এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবেন না। কারণ যে সময়ে তিনি ইংল্যাণ্ডে পৌঁছে পড়াশুনার স্থায়ী বন্দোবস্ত করে উঠতে পারবেন তারপর টেনেটুনে মাত্র আট মাস সময় অবশিষ্ট থাকবে এবং বয়সের কারণে তাঁর আর মাত্র একটি সুযোগই আছে। তিনি স্থির করলেন যে, প্রস্তাবটি গ্রহণ করবেন। কারণ তাঁর প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল, সুভাষের ভাষায়, "ইংল্যাণ্ডের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী অর্জন করা; অন্যথায় শিক্ষা-সংক্রান্ত বিভাগে অগ্রসর হতে পারব না আমি। যদি এখন আমি সিভিল সার্ভিস পড়তে অস্বীকার করি তাহলে আমাকে ইংল্যাণ্ড প্রেরণের প্রস্তাবটি এখনকার মতো (এবং সব সময়ের জন্য) হিমঘরে পাঠানো হবে।"[১] ১৯১৯ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর সুভাষ সমুদ্রযাত্রা করলেন।

সুভাষ ইংল্যাণ্ডে পৌঁছলেন অক্টোবরে আর অর্নাস পরীক্ষার জন্য কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা শুরু করলেন নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার বিষয়ে অধ্যক্ষ রেডডাওয়ের (Reddaway) মূল্যবান সাহায্যের স্বীকৃতি দিয়ে সুভাষ লিখেছিলেন, "রেডডাওয়ের সাহায্য ভিন্ন জানি না আমি ইংল্যাণ্ডে কি করতাম।"[২]

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের যে পরিমাণ স্বাধীনতা দেওয়া হতো এবং যে সার্বজনীন শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে সকলে দেখতেন তাঁদের তা সুভাষকে অত্যন্ত গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তিনি অনুভব করেছিলেন যে এই ব্যাপারটি ছাত্রদের চরিত্রের উপর এক অতি সুস্থ প্রভাব বিস্তার করে। "একি অপূর্ব পরিবর্তন," তিনি মন্তব্য করেছিলেন, "পুলিশ অধ্যুষিত কলকাতার মতো এক শহরের তুলনায়, যেখানে প্রতিটি ছাত্রকেই দেখা হয় একজন সম্ভাবনাময় বিপ্লবী আর সন্দেহভাজন ব্যক্তি হিসেবে।"[৩]

আরো একটি বিষয় সুভাষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল তা হল ইউনিয়ন সোসাইটির সভাগুলিতে অনুষ্ঠিত বিতর্কগুলি। সমগ্র পরিবেশটি ছিল অত্যন্ত আনন্দদায়ক। কারো মনের কথা বলা কিংবা যে-কোন ব্যক্তির সমালোচনা করার অবাধ স্বাধীনতা ছিল। পার্লামেন্টের নামজাদা সদস্যগণ এবং কখনও কখনও মন্ত্রিসভার সদস্যও সম্পূর্ণ সমানাধিকারের মানসিকতায় এইসব বিতর্কে অংশগ্রহণ করতেন আর অবশ্যই কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হতেন।

যদিও ভারতীয় এবং ইংরেজ ছাত্রদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল সাধারণভাবে আন্তরিক, তবু অতি অল্প ক্ষেত্রেই তা প্রকৃত বন্ধুত্বে পরিণত হতো। এর কারণ ছিল সাধারণ ইংরেজদের মধ্যে উপস্থিত এক লক্ষণীয় উন্নাসিক মনোভাব। আর ভারতীয়দের ক্ষেত্রে আপন স্বার্থ এবং জাতীয় সম্মান সম্পর্কে অত্যধিক স্পর্শকাতরতা। অমৃতসর হত্যাকাণ্ডের খল নায়ক জেনারেল ডায়ারের প্রতি মধ্যবিত্ত ইংরেজদের অত্যধিক সহানুভূতি ভারতীয় মানসিকতাকে আহত করত। সাধারণভাবে বলতে গেলে ইংরেজ এবং ভারতীয়দের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার মতো উপাদানের অভাব ঘটেছিল। সুভাষ লক্ষ্য করেছিলেন যে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে একমাত্র লেবর পার্টিরই ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্খার প্রতি সহানুভূতি ছিল এবং তাই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে লেবর পার্টির সদস্য অথবা সেইসব মানুষ যাঁরা লেবর অনুসৃত দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানসিকতার সমর্থক, তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার অধিকতর সম্ভাবনা আছে।

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রাপ্ত অবাধ স্বাধীনতা সুভাষকে

ভারতের তৎকালীন সেক্রেটারী অব স্টেট, আর্ল অব লিটন, মিষ্টার ই. এস. মণ্টেগুর সঙ্গে ভারতীয় ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষানবিশ বাহিনীতে (University Training Corps) অন্তর্ভুক্ত করানোর ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করতে উৎসাহিত করেছিল। ভারতীয় ছাত্রদের এ দাবির প্রতি সম্মতি জানাতে অক্ষম ছিলেন ইংরেজ সরকার। কারণ ভারতীয় ছাত্রেরা উক্ত বাহিনীর যোগ্যতা অর্জনের পর নিশ্চিত ভাবেই ইংরেজ সৈন্যবাহিনীতে নিয়োগের দাবি জানাবে। ইংরেজ সরকারের পক্ষে সে দাবি মেনে নেওয়া কষ্টকর হবে। লর্ড লিটন মন্তব্য করেছিলেন যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে মনে করেন যে আগামী দিনে ভারতীয় অফিসাররা অবশ্যই সম্মিলিত বাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণ করবে, কিন্তু কিছু কিছু মহলে দুর্ভাগ্যজনক ভাবে ভারতীয়দের প্রতি বিরূপতা ছিল এবং তা দূর করা সম্ভব হল না।

সুভাষ আধুনিক ইওরোপীয় ইতিহাস অধ্যয়ন করার সুযোগ পেয়েছিলেন কেমব্রিজে। সেই সঙ্গে পাঠ করেছিলেন সে সবের কিছু আকরগ্রন্থ, যেমন বিসমার্কের আত্মজীবনী, মেটারনিকের স্মৃতিচারণ, কাভুরের চিঠিপত্র ইত্যাদি। "আমার কেমব্রিজে পড়া এইসব মৌলিক দলিল", তিনি স্বীকার করেছিলেন, "আমার রাজনৈতিক বোধ গড়ে ওঠার পথে এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির আন্তর স্রোত সম্পর্কে ধারণাবৃদ্ধির পক্ষে অন্য আর সবকিছুর তুলনায় বেশী সাহায্য করেছিল।"

১৯২০ সালের জুলাই মাসের শুরুতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা আরম্ভ হল। কিন্তু সুভাষ যেহেতু পড়াশুনার জন্য মাত্র আট মাস সময় পেয়েছিলেন, তাই প্রত্যাশার তুলনায় নিতান্তই সামান্য প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষায় বসলেন। এ ছাড়াও, তাঁর বর্ণনা অনুসারে, আপন নির্বুদ্ধিতায় তিনি সংস্কৃত-পত্রে ১৫০ নম্বর নষ্ট করেছিলেন।

পরীক্ষার ফল ঘোষিত হ'ল ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি এবং সফলতার ক্রমানুসারে সুভাষ চতুর্থ স্থান অধিকার করলেন। ফলে এক সম্ভাবনাময় কর্মজীবনের দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত হলেন তিনি। ১৯২০ লালের ২২শে সেপ্টেম্বর দাদা শরৎ বসুকে পাঠানো এক চিঠিতে তিনি লিখলেন : "আমি বলতে পারি না যে আই. সি. এস-এর পদমর্যাদায়

প্রবেশের সম্ভাবনায় আমি খুব আনন্দিত হয়েছি। আমাকে যদি এ কাজে যোগদান করতেই হয়, তবে যে অনীহার সঙ্গে আমি আই. সি. এস পরীক্ষার জন্য পড়াশুনা করেছি ঠিক সেই ভাবেই এ কাজটিও করব। এক চমৎকার নিয়মিত মাইনে এবং অবসর জীবনে একটা ভাল পেনসন নিশ্চয়ই আমি পাব। যদি গোলামের মতো আজ্ঞাধীন হবার জন্য যথেষ্ট নত করতে পারি নিজেকে তবে হয়তো আমি একজন কমিশনারও হব। এক বংশবদ মানসিকতার সঙ্গে সহজাত কর্মক্ষমতা নিয়ে একজন এমন কি একটি প্রাদেশিক সরকারের চীফ সেক্রেটারী পর্যন্ত হবার উচ্চাশা করতে পারেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই চাকুরিই কি হবে আমার জীবনের চরম লক্ষ্য? সিভিল সার্ভিস একজন মানুষের জীবনে সর্বপ্রকার পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে আসতে পারে, কিন্তু এই প্রাপ্তি কি তাঁর সত্বার বিনিময়ে সংগ্রহ করা নয়? একজন আই. সি. এস-কে যে ধরনের চাকুরির শর্তাবলীর অধীনতা স্বীকার করতে হয়, আমি মনে করি, তার সঙ্গে জীবনের উচ্চ আদর্শের সামঞ্জস্যবিধান করা একটা ভণ্ডামি মাত্র।

"......উক্ত চাকুরির সমর্থনে অনেক কিছুই বলা যেতে পারে। এই চাকুরি মাত্র একটি বারেই আমাদের প্রত্যেকের প্রধানতম সমস্যার সমাধান করে দেয়—জীবিকার সমস্যা। কাউকে ঝুঁকি নিয়ে, কিংবা সাফল্য অসাফল্য সম্পর্কে কোন অনিশ্চয়তা নিয়ে মুখোমুখি হতে হয় না জীবনের। কিন্তু আমার মতো প্রকৃতির মানুষ, যে বেঁচে আছে এমন কিছু ভাব নিয়ে, যাকে নিশ্চিতভাবে অদ্ভুত বলা যেতে পারে, তাঁর পক্ষে সামান্যতম প্রতি-বন্ধকতাহীন পথ অনুসরণের পক্ষে শ্রেষ্ঠ পথ হতে পারে না......তা ছাড়া, সিভিল সার্ভিসে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে কোন মানুষের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থায় এবং সর্বাত্মকভাবে দেশসেবা করা সম্ভব নয়। সংক্ষেপে, জাতীয় এবং আত্মিক উচ্চাশা সিভিল সার্ভিসের শর্তাবলীর প্রতি আনুগত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।"[৬]

বিষয়টিতে পুনরায় ফিরে এসে ১৯২১ সালের ২৬শে জানুয়ারী তিনি তাঁর ভাইকে আবারও লেখেন: "নীতিগত ভাবে আমি এমন এক ব্যবস্থার অংশীদার হবার কথা ভাবতে পারি না যার প্রয়োজনের দিন ফুরিয়ে গেছে

এবং সমর্থন করছে এমন সব ব্যবস্থার যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে রক্ষণশীলতা, স্বার্থপর ক্ষমতা, হৃদয়হীনতা এবং লালফিতের ফাঁস।" বিদেশী শাসনের অধীনে এক দাসোচিত সিভিলিয়নের জীবনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছিলেন না। তিনি এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে, সিভিল সার্ভিসের পীড়াদায়ক প্রভাবের কাছে কিছুতেই নতি স্বীকার করবেন না। বিদেশী আমলাতন্ত্রের অধীনতা স্বীকার করতে এবং "একপাত্র সবজির" মতো নিজেকে বিক্রী করতে অস্বীকার করলেন তিনি। তিনি অনুভব করতেন "আমাদের একটা জাতি গঠন করতে হবে এবং হ্যাম্পডেন (Hampden) ও ক্রমওয়েলের (Cromwell) আপোসহীন আদর্শবাদের দ্বারাই তা করা সম্ভব।"[৭]

এই সময় তিনি তাঁর ভাই এবং বন্ধুদের কাছে যেসব চিঠিপত্র লিখেছিলেন তা থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা এবং শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের সুবিখ্যাত আদর্শ তাঁর উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

চাকুরিটি ত্যাগ না করে বরং তার ভিতরে প্রবেশ করে তার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবার যে পরামর্শ তাঁকে দেওয়া হয়েছিল তা অস্বীকার করে তিনি বলেন, উপর থেকে আসা প্রতিবন্ধকতা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বদলী হওয়া এবং প্রমোশন রদ সত্ত্বেও সে লড়াই একক ভাবে চালিয়ে যেতে হবে। "উক্ত চাকুরিতে থেকে একজন যে পরিমাণে ভাল কাজ করতে পারে", তিনি মন্তব্য করেন, "এর বাইরে থেকে তা করতে পারা একজনের কাজের তুলনায় নিতান্তই ক্ষুদ্র। মিস্টার আর. সি. দত্ত[১০] তাঁর চাকুরি সত্ত্বেও নিঃসন্দেহে অনেক কাজ করেছিলেন, কিন্তু আমি নিশ্চিত যে আমলাতন্ত্রের সদস্য না হলে আরো অনেক বেশী কাজ করতে পারতেন তিনি। তা ছাড়া এখানে নীতিগত প্রশ্নও জড়িত।

"......হয় নিশ্চিতভাবে আমি এই বাজে চাকুরিটি ত্যাগ করব এবং দেশের প্রয়োজনে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করব নিজেকে, অথবা বিদায় জানাব আমার সমস্ত আদর্শ এবং উচ্চাশাকে আর চাকুরিটিতে যোগদান করব আমি।"[১২]

অবশেষে মাতৃভূমির জন্য স্বামী বিবেকানন্দের চরম আত্মত্যাগের আহ্বান এবং পরাধীনতা থেকে ভারতকে মুক্ত করার জন্য অরবিন্দের আত্মনিয়োগ সুভাষকে ১৯২১ সালের মে মাসে তাঁর পদ পরিত্যাগে উৎসাহিত করল। তৎকালীন ভারতের স্থায়ী আণ্ডার সেক্রেটারী অব স্টেট এবং কেমব্রিজের অধ্যাপক স্যার উইলিয়াম ডিউক তাঁকে এই তাড়াহুড়া করে গ্রহণ-করা সিদ্ধান্ত থেকে বিরত করার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। ফিট্‌জ উইলিয়ম হলের অধ্যক্ষ মিস্টার রেড্ডাওয়ে (Mr Reddaway) সুভাষের কাজ আন্তরিকভাবে সমর্থন করলেন। যদিও প্রথমে তিনি বিস্মিত এবং হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন, কারণ ইতিপূর্বে আর কোন ভারতীয় এমন অস্বাভাবিক আচরণ করেন নি। কেমব্রিজের সিভিল সার্ভিস বোর্ডের সেক্রেটারী মিস্টার রবার্টস সুভাষের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে নতুন সংবিধানের অধীনে তিনি অন্তত কয়েকটা বছর চাকুরি করার চেষ্টা করুন। তাঁর ধারণা ছিল যে নতুন সংবিধানের অধীনে চাকুরিতে থেকেও সুভাষের পক্ষে দেশসেবা করা সম্ভব হবে। আর বছর দুয়েক বাদে যদি তাঁর মনে হয় যে এটা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় তবে অত্যন্ত যুক্তিযুক্তভাবেই তিনি এ চাকুরি পরিত্যাগ করতে পারেন। কিন্তু সুভাষ অটল রইলেন তাঁর সিদ্ধান্তে।

এ কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি না পদত্যাগপত্র জমা দেবার আগে সুভাষ ও মিষ্টার রবার্টসের মধ্যেকার বিতর্কের উল্লেখ করা হয়। এটি ঘটেছিল ইণ্ডিয়া অফিস থেকে সিভিল সার্ভিস শিক্ষানবিশদের জন্য বিলি করা কিছু মুদ্রিত নির্দেশাবলীকে কেন্দ্র করে। এর মধ্যে ভারতীয়দের সম্পর্কে কিছু অসম্মানজনক মন্তব্য ছিল। ভারতীয় শিক্ষানবিশরা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন এবং প্রতিবাদ জানাতে মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের অসন্তুষ্টির আশংকায় তাঁরা পিছিয়ে আসার চেষ্টা করেন। সুভাষ কিন্তু মরীয়া হয়ে উঠেছিলেন এবং একাই এগিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেন।

তিনি দেখা করলেন মিস্টার রবার্টসের সঙ্গে এবং মুদ্রিত নির্দেশাবলীর ভুল বিবৃতিগুলির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন

মিষ্টার রবার্টস। সরকারী দৃষ্টিভঙ্গি মেনে না নিলে শোচনীয় পরিণতির ভয় দেখালেন সুভাষকে। সুভাষ সরকারী দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা দাবি করলেন। চোখ রাঙানিতে কাজ হবে না বুঝতে পেরে এবার তাঁর মনোভাব পরিবর্তন করলেন মিষ্টার রবার্টস আর সুভাষের বক্তব্যের প্রতি ইণ্ডিয়া অফিসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সম্মত হলেন।

পক্ষকাল পরে মিস্টার রবার্টস ডেকে পাঠালেন সুভাষকে এবং পড়ে শোনালেন ইণ্ডিয়া অফিস থেকে আসা চিঠিটি। সেই চিঠিতে মুদ্রিত নির্দেশাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করানোর জন্য তাঁরা ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন সুভাষকে এবং আশ্বাস দিয়েছিলেন যে সেগুলি পুনরায় মুদ্রিত হবার সময় প্রয়োজনীয় সংশোধনগুলি করা হবে।[১২]

১৯২১ সালের জুন মাসের শেষ নাগাদ সুভাষ ভারতের উদ্দেশে ব্রিটেন ত্যাগ করলেন। তিনি ইংল্যাণ্ডে ছিলেন মাত্র কুড়ি মাস। কিন্তু যে শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তিনি, তা তাঁর ব্যক্তিত্বগঠন এবং পরবর্তী বছরগুলিতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কৌশল রচনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সাহায্য করেছিল।

অপর দিকে তাঁর চরিত্রের কিছুটা অনুধাবন করার সুযোগ পেয়েছিলেন বৃটিশ শাসকেরা যা তাঁদের পরবর্তী দু'দশক ধরে এই খেয়ালী যুবকটির বিরুদ্ধে সঠিক ব্যবস্থাগ্রহণে সাহায্য করেছিল।

৮. বিবেকানন্দের প্রভাব উল্লেখ করে সুভাষ লিখেছিলেন: "আমার মাত্র পনের বছর বয়সে বিবেকানন্দ আমার জীবনে প্রবেশ করেন। তখন অন্তরে এক বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল, ওলটপালট হয়ে গিয়েছিল সবকিছু...তাঁর প্রতিকৃতি এবং তাঁর শিক্ষা উভয় দিক থেকেই বিবেকানন্দ আমার সামনে এক পূর্ণ বিকশিত ব্যক্তিত্ব রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।" (এ্যান ইণ্ডিয়ান পিলগ্রিম, পৃঃ ৩৩-৩৪)। দেশপ্রেম সম্পর্কে বিবেকানন্দের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা এক স্থায়ী স্বাক্ষর রেখে গিয়েছিল তাঁর মনের উপর:

"তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে, কোটি কোটি দেব ও ঋষির বংশধর জন্তুপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ—কোটি কোটি লোক অনাহারে মরিতেছে। কোটি কোটি লোক শত শতাব্দী ধরিয়া অর্ধাশনে কাটাইতেছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ অজ্ঞানের কৃষ্ণমেঘ সমগ্র ভারতগগন আচ্ছন্ন করিয়াছে? তোমরা কি এই সকল ভাবিয়া অস্থির হইয়াছ? এই ভাবনায় নিদ্রা কি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে? এই ভাবনা কি তোমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া তোমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে—তোমাদের হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনের সহিত কি এই ভাবনা মিশিয়া গিয়াছে? এই ভাবনা কি তোমাদিগকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে? দেশের দুর্দশার চিন্তা কি তোমাদের একমাত্র ধ্যানের বিষয় হইয়াছে এবং ঐ চিন্তায় বিভোর হইয়া তোমরা কি তোমাদের নাম-যশ, স্ত্রী-পুত্র, বিষয়-সম্পত্তি, এমন কি শরীর পর্যন্ত ভুলিয়াছ? তোমাদের এরূপ হইয়াছে কি? যদি হইয়া থাকে তবে বুঝিও তোমরা প্রথম সোপানে—স্বদেশ হিতৈষী হইবার প্রথম সোপানে মাত্র পদার্পণ করিয়াছ।"
—বর্তমান গ্রন্থকার রচিত 'বিবেকানন্দের আলোয় সুভাষ'—পৃঃ ৯।

৯. ১৯২১ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী দাদা শরৎ বসুকে লেখা তাঁর চিঠিতে সুভাষ লিখেছিলেন: "অরবিন্দ ঘোষের পথ আমার কাছে রমেশ দত্তের পথের তুলনায় অনেক বেশী মহৎ, অনেক বেশী প্রেরণাদায়ক, অনেক বেশী মহিমান্বিত; অনেক বেশী নিঃস্বার্থ, যদিও অনেক বেশী কণ্টকময়...অরবিন্দ ঘোষের সুবিখ্যাত দৃষ্টান্ত বিরাট হয়ে ফুটে উঠেছে আমার দৃষ্টির সামনে। আমি অনুভব করি যে সেই দৃষ্টান্ত যে আত্মত্যাগ আশা করে আমার কাছ থেকে, তা দান করতে আমি প্রস্তুত।" (এ্যান ইণ্ডিয়ান পিলগ্রিম, পৃঃ ৯৮-৯৯) স্মরণ করা যেতে পারে যে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ সিভিল সার্ভিসের উন্মুক্ত প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, কিন্তু অশ্বারোহণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হবার জন্য চাকুরিটিতে যোগদানের উপযুক্ত বিবেচিত হন নি। তিনি বলেছিলেন যে, তিনি "আই. সি. এস.-এর জন্য কোন আগ্রহ বোধ করেন নি এবং ঐ বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের জন্য পথের সন্ধান করছিলেন। তিনি নিজে চাকুরিটি পরিত্যাগ না করে কোন কৌশলে অশ্বারোহণে অকৃতকার্য হতে পেরেছিলেন, কারণ তাঁর পরিবার তাঁকে চাকুরিটি পরিত্যাগ

করতে দিতেন না।" (করণ সিং লিখিত 'প্রফেট অব ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিজম', বোম্বাই, ১৯৬৭, পৃঃ ৩৭) শ্রীঅরবিন্দের নিজেকে উত্তম পুরুষ হিসেবে উল্লেখ করার বিষয়ে করণ সিং বলেছিলেন যে সংশোধন এবং সম্মতির জন্য তাঁকে দেওয়া তিনজন জীবনীকারের পাণ্ডুলিপি পড়বার সময় তিনি উক্ত লাইনগুলি টীকা হিসেবে লেখেন। ('প্রফেট অব ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিজম, পৃঃ ৩৬)

১০. নবজাগরিত বাংলার এক মহান ব্যক্তিত্ব। তিনি ১৮৭১ সালে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন এবং প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ন হিসেবে জেলার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর স্বাধীন মতামত এবং স্বদেশবাসীর অধিকার ঊর্ধ্বে তুলে ধরার প্রচেষ্টার জন্য তিনি কমিশনারের পদলাভে বঞ্চিত হন এবং স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। একজন প্রশাসক, দেশপ্রেমিক, ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যসেবী হিসেবে তিনি অত্যন্ত সুনাম অর্জন করেছিলেন। তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিও হয়েছিলেন—গ্রন্থকার।

১১. এ্যান ইণ্ডিয়ান পিলগ্রিম, পৃঃ ৯৭

১২. ঐ, পৃঃ ১০২-১০৩।

১৯২১ সালের ১৬ই জুলাই সুভাষ বোম্বাইতে অবতরণ করলেন এবং সেই দিন বিকেলেই তিনি সাক্ষাৎ করলেন মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে। ইতিমধ্যে গান্ধীজী ১৯২০ সালে ডিসেম্বর মাসে নাগপুর কংগ্রেস থেকে তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বানের সাহায্যে অবিসম্বাদী নেতা হয়ে উঠেছিলেন। বছর-খানেকের মধ্যে তাঁর স্বরাজলাভের প্রতিশ্রুতি সমগ্র দেশে আলোড়ন তুলেছিল। বসুর লক্ষ্য ছিল গান্ধীর লড়াইয়ের পরিকল্পনা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা গ্রহণ করা। আর সেই সঙ্গে তাঁর জানা পৃথিবীর অন্যান্য অংশের বিপ্লবী নেতাদের অনুসৃত পদ্ধতি ও কৌশলের আলোকে তা ঝালিয়ে নেওয়া। মহাত্মাজীর মন ও লক্ষ্য বুঝতে চেয়েছিলেন সুভাষ। কিন্তু সেই সাক্ষাৎকার সম্পূর্ণ হতাশ করেছিল সুভাষকে। কারণ তিনি দেখলেন, "মহাত্মাজীর প্রস্তুত-করা পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে স্বচ্ছতার দুঃখজনক অভাব। আর আন্দোলনের পরবর্তী অধ্যায়গুলি, যা ভারতকে তার কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে সে সম্পর্কে নিজেরই সুস্পষ্ট ধারণা নেই তাঁর।"[১]

সম্ভবত তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরেছিলেন মহাত্মাজী। কলকাতায় পৌঁছে তিনি চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পরামর্শ দিলেন সুভাষকে। ইংল্যাণ্ডে অবস্থানকালেই সুভাষ তাঁর রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করে চিঠি লিখেছিলেন সি. আর. দাশকে। পূর্বে সি. আর. দাশ যখন ক্যালকাটা বারের একজন নেতা ছিলেন সুভাষ একবার তাঁর পরামর্শ চাইতে এসেছিলেন। তখন সুভাষ ছিলেন রাজনৈতিক কারণে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত একজন ছাত্র।

সুভাষ শ্রী দাশের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং লক্ষ্য করলেন যে তিনি সেই মানুষটি নন যিনি "একদিনে হাজার হাজার টাকা রোজগার করেন আর তা খরচ করেন এক ঘণ্টায়। যদিও তাঁর বাড়ি তখন আর প্রাসাদ* ছিল না, তবু তিনি ছিলেন সেই মিষ্টার দাশ যিনি ছিলেন সর্বদাই যুবকদের বন্ধু।

তাদের উচ্চাশাকে বুঝতেন তিনি, মমত্ব প্রদর্শন করতেন তাদের দুঃখ-যন্ত্রণার প্রতি।"[২] তাঁর সাক্ষাৎকার চলাকালে, সুভাষ স্মরণ করেছিলেন, "আমি অনুভব করতে শুরু করেছিলাম যে, একজন মানুষ আছেন এখানে যিনি আপনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানেন—যিনি নিজের সবকিছু ত্যাগ করতে পারেন এবং অপরের দেবার মতো যা কিছু আছে তা দাবি করতে পারেন তাদের কাছ থেকে—তারুণ্য যাঁর কাছে অক্ষমতা নয়, বরং একটি গুণ। আমাদের কথাবার্তা যখন শেষ হয়ে এল ততক্ষণে আমার মন তৈরী হয়ে গেছে। একজন নেতাকে খুঁজে পেয়েছি বলে অনুভব করলাম এবং মনস্থির করলাম যে অনুসরণ করব তাঁকেই।"[৩]

সুভাষ নিজেকে সি. আর. দাসের হাতে ছেড়ে দিলেন আর শ্রীদাশ তাঁকে 'বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজের' প্রিন্সিপাল নিযুক্ত করলেন। ন্যশনাল ভলান্টিয়ার কোর-এর নেতাও হলেন তিনি, যে কাজটি তাঁর অত্যন্ত মনোমতো ছিল। এই সঙ্গে তিনি হলেন বাংলার কংগ্রেসের প্রধান প্রচার অধিকর্তা। প্রতিটি পদে; সি. পি. আই নেতা অধ্যাপক হীরেন মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন, "তিনি তাঁর যোগ্যতা প্রদর্শন করেছিলেন।"[৪] কংগ্রেসের প্রচারকার্য সুভাষ এতোখানি দক্ষতার সঙ্গে সংগঠিত করেছিলেন যে কলকাতার নামজাদা ইঙ্গ-ভারতীয় প্রাত্যহিক 'দি স্টেটসম্যান' লিখেছিল, কংগ্রেস যেমন এমন একজন দক্ষ মানুষকে পেয়েছে, ঠিক সেই সঙ্গে সরকার হারিয়েছে একজন উপযুক্ত প্রশাসককে। ১৯২১ সালে সেপ্টেম্বর মাসে ওয়ার্কিং কমিটির সভায় যোগদানের জন্য যেসব বিশিষ্ট কংগ্রেসী নেতা কলকতায় এসেছিলেন চিত্তরঞ্জন তাঁদের সকলের সঙ্গে সুভাষের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। মহাত্মাজীর সঙ্গে প্রাক্তন বিপ্লবীদের মীমাংসা ঘটানর ক্ষেত্র প্রস্তুতির দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল সুভাষের উপর। এই বিপ্লবীদের অনেকেই পাল্টা আঘাত না-করার নীতি অনুমোদন করতেন না। তাঁদের ধারণা ছিল একাজ জনগণকে নির্বীজ করে দেবে, এবং তাদের সংগ্রামী ক্ষমতাকে দুর্বল করবে। সত্যি কথা বলতে কি তাঁদের একাংশ ইতিমধ্যেই বাংলাদেশে অসহযোগ-বিরোধ প্রচারকার্য শুরু করে দিয়েছিলেন। লক্ষণীয় মজার ব্যাপারটি হল এর অর্থ সরবরাহ করত

'সিটিজেনস প্রটেকসন লীগ' নামের আড়ালে ব্রিটিশ মার্কেন্টাইল কমিউনিটি। আর তা বণ্টন করা হতো একজন ভারতীয় এ্যাডভোকেটের মাধ্যমে। তিনি সেই অর্থভাণ্ডারের উৎসের কথা প্রকাশ করেন নি।[৬]

অসহযোগ আন্দোলন গতিলাভ করল ১৯২৯ সালে নভেম্বর মাসে প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের ভারতভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে।[৭] প্রিন্স যেদিন বোম্বাইতে অবতরণ করলেন (১৭ই নভেম্বর), দেশ সেদিন 'হরতাল' পালন করল। স্থির হলো ২৪শে ডিসেম্বর যেদিন প্রিন্স কলকাতায় পদার্পণ করবেন সেদিন হরতাল পালিত হবে সেখানে। এই কর্মসূচীকে সফল করে তুলতে নিজেকে একান্তভাবে নিয়োজিত করেছিলেন সুভাষ। নিষিদ্ধ করা হলো তাঁর ভলানটিয়ার বাহিনীকে, কিন্তু আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। বাসন্তী দেবী এবং অন্যান্য মহিলাগণ গ্রেফতার হলেন। কিন্তু পরিস্থিতি অত্যন্ত ঘোরালো হয়ে উঠল। অবস্থা সামাল দিতে গ্রেফতারের দিন মধ্য-রাত্রির পূর্বেই সরকার শ্রীমতি দাশ ও তাঁর সঙ্গীদের মুক্তি ঘোষণা করলেন। কিন্তু জনগণের উৎসাহ এবং উত্তেজনা তখন উন্নীত হয়েছিল এক নতুন স্তরে এবং পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছিল সরকারকে। ১৯২১ সালের ১০ই ডিসেম্বর শ্রীদাস এবং সুভাষ সহ তাঁর অনুগামীরা গ্রেফতার হলেন। দীর্ঘ-বিচার যন্ত্রণার শেষে সুভাষকে তাঁর বিচক্ষণ গুরু শ্রীদাশ ও শ্রীশাসমলের সঙ্গে ছ'মাস হাজতবাসের শাস্তি দেওয়া হলো। শ্রীশাসমল ছিলেন বাংলার রাজনৈতিক সচেতন জেলা মেদিনীপুরের একজন অতি তেজস্বী নেতা। "মাত্র ছ মাস?" বিদেশী শাসকের হাতে পাওয়া প্রথম শাস্তি সম্পর্কে এই ছিল সুভাষের বিস্মিত প্রতিক্রিয়া। কারণ গান্ধীজীর আশ্বাস অনুসারে বছরখানেকের মধ্যে স্বরাজলাভের উদ্দেশ্যে আরো অনেক বেশী মূল্য দিতে প্রস্তুত ছিলেন তিনি। বৃটিশ সিংহ যে কেবল তার নখদন্ত প্রদর্শন করেছে তা তিনি অল্পই বুঝতে পেরেছিলেন। আন্দোলনের ঝড়ের কেন্দ্র কলকাতায় প্রিন্স পৌঁছবার পূর্বেই ভাইস্‌রয় লর্ড রীডিং প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের প্রতি জ্ঞাপন করা শীতল অভ্যর্থনায় হতাশ হয়ে এবং গান্ধীজীর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে আলোচনার মাধ্যমে একটা মীমাংসায় পৌঁছবার চেষ্টা করলেন। ঠিক হল যে কংগ্রেসী নেতারা

বিভিন্ন বিষয়ে সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতে পারবেন এবং প্রস্তাব দেওয়া হলো কিছু রাজবন্দীকে মুক্তি দেবার। কিন্তু প্রস্তাবটি ব্যর্থ হলো, কারণ গান্ধীজী খিলাফত আন্দোলনের নেতা আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের মুক্তি দাবি করলেন।[৮] গান্ধীজীর মনোভাবে হতাশ হলেন শ্রীদাশ। বছরখানেকের মধ্যে স্বরাজলাভের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন গান্ধীজী। পক্ষকাল মাত্র বাকী ছিল আর, অথচ স্বরাজের চিহ্ন চোখে পড়ছিল না কোথাও। শ্রী দাশ ভেবেছিলেন যে এই প্রস্তাবটি গ্রহণের মাধ্যমে কংগ্রেস তার মুখ রক্ষা করতে পারবে। কারণ বিপুলসংখক বন্দীর মুক্তি জনগণের দৃষ্টিতে এক বিরাট জয় হিসাবে প্রতিভাত হবে এবং নবপর্যায়ে আন্দোলন শুরু করার সম্ভাবনাও হবে উজ্জ্বল। হায়! তা হবার নয়।

১৯২২ সালের শুরুতে জনগণের উৎসাহ জাগিয়ে তুলতে মহাত্মাজী এক বিশেষ চেষ্টা চালালেন। ১৯২২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী লর্ড রীডিংকে এক চরমপত্র দিয়ে মহাত্মাজী জানালেন যে সপ্তাহখানেকের মধ্যে সরকার যদি তাঁর হৃদয় পরিবর্তনের কোন দৃষ্টান্ত না দেখান তবে তিনি গুজরাটের বারদৌলি মহকুমায় কর বন্ধের আন্দোলন শুরু করবেন। এ আন্দোলন বাংলাদেশে শুরু করার জন্যও বিস্তৃত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলো। চরমপত্রটি বিপুল উত্তেজনার সৃষ্টি করল সারা দেশে। কিন্তু সেই চরম উত্তেজনার উপশম ঘটালেন মহাত্মাজী নিজেই। উত্তরপ্রদেশের একটি গ্রাম চৌরি-চৌরায় গ্রামবাসীরা উত্তেজনার বশে একটি পুলিশ থানা জ্বালিয়ে দেয় এবং কিছু পুলিশকে হত্যা করে। এই সংবাদ পেয়ে মহাত্মাজী আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। গান্ধীজীর আচরণ সর্বত্র গভীর ক্ষোভের সঞ্চার করল এবং তাঁর সেনানায়কগণ, শ্রীদাশ, মতিলাল নেহরু (জওহরলালের পিতা) এবং লালা লাজপত রায় বন্দী অবস্থায় মহাত্মাজীর এই অদ্ভুত হঠকারী সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা করলেন। গভীর ক্ষোভের সঙ্গে জওহরলাল লিখেছিলেন: "যখন আমরা আমাদের অবস্থান ক্রমশই সংহত করে তুলছি বলে ধারণা জন্মাচ্ছিল এবং সমস্ত রণক্ষেত্রে এগিয়ে চলেছিলাম তখন আমাদের সংগ্রামের এই সমাপ্তির কথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলাম আমরা··· যা আমাদের আরো বিচলিত করে তুলেছিল তা হলো এই স্থগিতাদেশের

জন্য যে কারণ দেখানো হলো এবং এ থেকে যে পরিণতি ঘটতে পারে তার জন্য। চৌরিচৌরা হয়তো বা কিংবা প্রকৃতই এক নিন্দনীয় ঘটনা এবং অহিংসা আন্দোলনের মূলনীতির সম্পূর্ণ বিরোধী; কিন্তু সুদূরের একটি গ্রাম এবং মূলক্ষেত্র থেকে বহুদূরের একটি কৃষকের দল কি আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার সাগ্রামকে বন্ধ করে দেবে, এমন কি কিছুদিনের জন্য হলেও? কোন বিচ্ছিন্ন হিংসাত্মক ঘটনার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি যদি এই হয় তবে নিশ্চিতভাবে অহিংস সংগ্রামের দর্শন এবং কৌশলের মধ্যে কিছু একটা অভাব রয়েছে।"[৯] সুভাষ তাঁর হতাশার কথা ব্যক্ত করে লিখেছিলেন: "জনগণের উৎসাহ যখন চরম পর্যায়ে পোঁছেছে, তখন পশ্চাদাপসরণের নির্দেশ উচ্চারণ একটি জাতীয় বিপর্যয়ের তুলনায় কিছু কম নয়।"[১০]

কঠোর পরিশ্রম, নিজস্ব যোগ্যতা এবং চিত্তরঞ্জন দাশের আশীর্বাদে খুব অল্প সময়ের মধ্যে সুভাষ বিখ্যাত হয়ে উঠলেন। তিনি 'বাংলার কথা' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হলেন এবং একজন যুবনেতা হিসেবে সারা ভারত যুব লীগ গড়ে তুললেন। ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি নিজে তার সভাপতি হলেন। শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তাঁর কৃতিত্ব কম ছিল না। টাটা আয়রণ এণ্ড স্টীল কোম্পানির শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি এবং একবার সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়নে কংগ্রেসের সভায় সভাপতিত্বও করেছিলেন।

১৯২২ সালের গয়া কংগ্রেসে শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশের 'কাউন্সিলে' প্রবেশের প্রস্তাব নিয়ে শ্রীদাশ ও মতিলাল নেহরুর সঙ্গে মহাত্মাজীর অনুগামীদের বিরোধ ঘটে। প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে এক অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়ে শ্রী দাশ পদত্যাগ করেন। প্রায় তৎক্ষণাৎ শ্রীমতিলাল নেহরু, মহাত্মাজীর সমর্থকদের চরম বিস্ময়ের মধ্যে, আইন-সভায় প্রবেশের জন্য তাঁদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের চিন্তানুসারে অগ্রসর হবার আগ্রহ নিয়ে 'স্বরাজ পার্টি' গঠনের কথা ঘোষণা করেন। তাঁরা সঠিক ভাবেই অনুভব করতে পেরেছিলেন যে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম হবে অবিচ্ছিন্ন। তাই যে কোন মূল্যে জনগণের উৎসাহ ও উদ্দীপনাকে সমান

ভাবে বজায় রাখতে হবে এবং নানা উপায়ে তাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে শাসকের বিরুদ্ধে। নতুন কর্মসূচীর পিছনে উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীনতার সংগ্রামকে অব্যাহত রাখতে আইনসভার ভিতরে অবিচলভাবে, অবিচ্ছিন্নধারায় এবং একনাগাড়ে সরকারের বিরোধিতা করে শাসনযন্ত্রকে পঙ্গু করে ফেলা।

১৯২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যখন বন্যায় বিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ত্রাণকার্যের জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি সুভাষকে পাঠালেন, একজন সমাজসেবী হিসেবে তিনি তখন তাঁর অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন। একটি স্বেচ্ছাবাহিনী গঠন করেছিলেন তিনি এবং তাঁরা এমনভাবে তাঁদের কাজ সম্পন্ন করেছিলেন যে বাংলার তৎকালীন গভর্নর লর্ড লিটন পর্যন্ত তাঁদের কাজের সপ্রশংস উল্লেখ করেছিলেন।

স্বরাজপার্টিকে সংহত এবং শক্তিশালী করে তুলতে শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ ১৯২৩ সালের গ্রীষ্মকালে বিস্তৃতভাবে দক্ষিণভারত সফর করলেন এবং উৎসাহজনক ফল পেলেন। দক্ষিণভারত ছিল গান্ধীবাদের দুর্গ। নিজেদের সমর্থনে অটুট এবং শক্তিশালী জনমত সৃষ্টির জন্য স্বরাজপন্থীরা 'ফরওয়ার্ড' নামে এক নতুন দৈনিক প্রকাশ করলেন। তার পরিচালনায় রইলেন সুভাষ। তাঁর সার্থক তত্ত্বাবধানে পত্রিকাটি ভারতের জাতীয় পত্র-পত্রিকার মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল।

অধিকাংশ প্রদেশে, বিশেষত বাংলায়, কংগ্রেস এবং স্বরাজ পার্টির মধ্যেকার সম্পর্ক ছিল তিক্ত এবং তা জাতীয় স্বার্থের গুরুতর ক্ষতি করেছিল। বিবদমান দল দুটির মধ্যে একটা সমঝোতা স্থাপনের জন্য মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে সভাপতি করে দিল্লীতে ১৯২৩ সালে কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো। তিনি (মৌলনা আজাদ) তাঁর ভাষণে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং আইনসভার অভ্যন্তরে লড়াই চালিয়ে যাবার স্বরাজপন্থী নীতির পক্ষে দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করলেন। একটা সমঝোতায় উপনীত হওয়া গেল। নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং বিরোধী পক্ষের ভূমিকা পালনের অনুমতি দেওয়া হলো কংগ্রেসীদের। কিন্তু সংগঠন হিসেবে কংগ্রেসের এ ব্যাপারে কোন দায়িত্ব রইল না।

নির্বাচনগুলিতে স্বরাজপন্থীরা কেন্দ্রীয় আইনসভায় এক শক্তিশালী

সংখ্যালঘু দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল এবং প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জন করল বাংলা এবং সেন্ট্রাল প্রভিন্সের বিধান-পরিষদে। শ্রীমতিলাল নেহরুর যোগ্য নেতৃত্বে দলটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করল যুক্ত প্রদেশের স্থানীয় পরিচালকসভার (Local bodies) নির্বাচনগুলিতে।

১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদক নির্বাচিত হলেন সুভাষ। শ্রীদাশের মতো বুদ্ধিমত্তা ও বাস্তববাদী রাজনৈতিক চিন্তাসম্পন্ন এক নেতার সংস্পর্শে এসে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি-সহ সর্ববিষয়ে সুভাষের দৃষ্টি প্রসারিত হয়ে উঠেছিল। অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার পর এই সম্প্রদায়িক সম্প্রাতিই ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। শ্রীদাশের অধীনে এই শিক্ষানবিশী আই. এন. এ (ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি) গঠনের দিনগুলিতে হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের সামর্থ্য যুগিয়েছিল তাঁকে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে একজন স্বাধীনতা-সংগ্রামী এবং সংগঠক হিসেবে সুভাষ এমন এক লক্ষণীয় স্থান অধিকার করেছিলেন যে ১৯২২ সালে মস্কোয় অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের চতুর্থ কংগ্রেসে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। পথিমধ্যে পুলিশ আমন্ত্রণপত্র আটক করে এবং বাজেয়াপ্ত করে নেয়।[১]

১৯২৪ সালের শুরুতে স্বরাজপন্থীরা কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিরাট সাফল্য অর্জন করে। যদিও পৃথক নির্বাচক-মণ্ডলীর ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তবু এক বিরাটসংখ্যক মুসলমান প্রার্থী স্বরাজপন্থীদের টিকিটে নির্বাচিত হন। শ্রীদাশ এবং মিস্টার শহীদ সুরাবর্দী যথাক্রমে মেয়র এবং ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হন। চীফ্ এক্সি-কিউটিভ অফিসারের পদে নিযুক্ত হন সুভাষ। ঘটনাটি সরকারের পক্ষে অত্যন্ত বিরক্তিকর হয়ে উঠেছিল এবং অনেক টালবাহানার পর তাঁরা তাঁদের সম্মতি জানালেন। কারণ বিধিবদ্ধ আইন অনুসারে তাঁরা এ কাজে বাধ্য ছিলেন।

নতুন শাসন-ব্যবস্থার অধীনে নাগরিকগণের উপকারার্থে নতুন নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো। হিতকর ব্যবস্থাগুলি ছাড়াও মহাত্মা গান্ধী,

মতিলাল নেহরু, ভি. জে. প্যাটেল প্রমুখ জাতীয় নেতৃবৃন্দ শহরে এলে তাঁদের নাগরিক সংবর্ধনা জ্ঞাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন পুরসভা। ভাইসরয়, গর্ভনর এবং আমলাদের সংবর্ধনা জানানোর মতো অতীত প্রথা চিরদিনের জন্য বাতিল করা হলো। এই বিশেষ পদক্ষেপটি এবং কেবলমাত্র ইউরোপীয় অধ্যুষিত এলাকাগুলির প্রতি বিশেষ নজরদানের প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তে সমগ্র নগর পৌরব্যবস্থাপনার প্রতি দৃষ্টিদান সরকার এবং শহরের ইংরেজ সমাজকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল।

আইনসভাকে পঙ্গু করা এবং পুরসভাকে দেশপ্রেমের স্থান করে তোলার ক্ষেত্রে স্বরাজপন্থীদের সাফল্য বৃটিশ ভারতীয় আমলাতন্ত্রকে শংকিত করে তুলল। ঠিক এই সময় সন্ত্রাসবাদীরা তাঁদের কার্যকলাপ জোরদার করে তোলেন।

স্বাভাবিক ভাবেই সরকার নিস্পৃহ দর্শক হয়ে থাকতে পারেন না। সচল হয়ে উঠল স্বরাজপন্থীদের প্রতি আঘাত হানার প্রস্তুতি।

ভারতবর্ষের বৃহত্তম পুরসভার শাসনযন্ত্রের প্রধান হিসেবে সুভাষ অবশ্য নিজেকে সম্পূর্ণ ব্যস্ত রেখেছিলেন তাঁর দায়িত্বসমূহের মধ্যে। রাজনীতিতে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ার সময় ছিল না তাঁর। কারণ নাগরিকগণের অভাব-অভিযোগের প্রতি দৃষ্টিদান, উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর রূপায়ণ এবং সরকার ও আমলাগোষ্ঠীর নালিশের মুখোমুখি হবার জন্য তাঁকে সর্বদা তৎপর থাকতে হ'ত। "কর্মনিযুক্তির ক্ষেত্রে", সুভাষ মন্তব্য করেছিলেন, "সংখ্যালঘুদের প্রতি ন্যায়বিচারের স্বরাজপন্থী নীতির বিরোধী ছিলেন তাঁরা।"[১২] জাতীয় সংহতিকে শক্তিশালী করে তুলতে সংখ্যালঘুদের সমর্থন-লাভের স্বরাজপন্থী নীতি স্বাভাবিক ভাবেই সরকারকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। কারণ তাঁদের নীতিই ছিল হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ জীইয়ে রাখা।

স্বরাজপন্থীরা যখন তাঁদের প্রথম জয়ের আনন্দ উপভোগে ব্যস্ত, তখন ভারতের জন্য নির্বাচিত লেবর সেক্রেটারী অব্ স্টেট লর্ড অলিভিয়ার ভারতে স্বরাজবাদের জন্মের কারণ বিশ্লেষণ করে এক স্মরণীয় বক্তৃতা দেন লর্ডসভায় (হাউস অব্ লর্ডস)। যেসব কারণের কথা তিনি উল্লেখ করেছিলেন সেগুলি হল—প্রথম, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের নায়ক জেনারেল

ডায়ারকে সমর্থন করে হাউস অব্ লর্ডসে প্রস্তাবগ্রহণ; দ্বিতীয়ত, ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের প্রশংসায় ১৯২২ সালে প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জের "ইস্পাত-কঠিন ভাষণ;" তৃতীয়ত, ১৯২৩ সালে ভারত সরকার কর্তৃক লবণ করের দ্বিগুণ বৃদ্ধি; এবং চতুর্থত, আফ্রিকার কেনিয়ার ক্রাউন কলোনীতে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে অবিচার।[১৩]

সর্বোচ্চ মহল থেকে যখন এমন সহানুভূতি প্রদর্শন করা হচ্ছিল তখন কিন্তু ক্ষোভ উপশমের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যাবলী লক্ষণীয়ভাবে অনুপস্থিত ছিল।

শীঘ্রই সেই অস্বস্তিকর শান্তি ভঙ্গ হলো। ১৯২৪ সালের মে মাসে সিরাজগঞ্জে বাংলার কংগ্রেসীদের যে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো সেখানে গোপীনাথ সাহার আত্মত্যাগের সাহস ও মানসিকতার প্রশংসা করে এক সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করা হলো। শ্রীসাহা ছিলেন একজন তরুণ সন্ত্রাসবাদী। তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। তিনি কলকাতা পুলিশের কমিশনার স্যার চার্লস টেগার্টকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিলেন। সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে নির্মম আচরণের জন্য তখন তাঁদের কাছে কুখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন টেগার্ট। কিন্তু সঠিক ভাবে চিনতে না পারায় ভুলক্রমে শ্রীসাহা অপর এক ইংরেজকে হত্যা করেন। এর জন্য তিনি আন্তরিক ভাবে দুঃখপ্রকাশও করেছিলেন। অবশ্য নিজের জীবন উৎসর্গ করার জন্য আনন্দপ্রকাশ করেছিলেন। শ্রীসাহা এই আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, তাঁর রক্তবিন্দু প্রতিটি ভারতীয়ের গৃহে স্বাধীনতার বীজ বপন করবে। তাঁর এই কাজকে অবশ্য নিন্দা করা হয়েছিল। কারণ আধুনিক পরিবেশে স্বাধীনতালাভের জন্য ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ যুক্তিপূর্ণ রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে গ্রহণীয় নয়।

বিপ্লবী অভ্যুত্থানের আশংকায় সরকার স্বরাজপন্থীদের মধ্য থেকে শীর্ষস্থানীয় নেতাদের গ্রেফতার করলেন। সাহসী মনোভাব এবং আত্মত্যাগের মানসিকতার জন্য যদিও সুভাষের সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি সহানুভূতি ছিল, তবু কাজে কিংবা কথায় তিনি কখনও তাঁদের আচরণের প্রশংসা করেন নি। দুর্ভাগ্যক্রমে সরকার এবং আইনশৃঙ্খলার অভিভাবকদের চোখে

সুভাষ ছিলেন একজন ভয়ঙ্কর যুবক। শ্রীদাশ যখন সিমলায়, তখন ১৯২৪ সালের ২৫শে অক্টোবর শ্রীঅনিলবরণ রায় ও শ্রী এস. সি. মিত্রের সঙ্গে সুভাষকে ১৯১৮ সালের রেগুলেশন তিন ধারায় গ্রেফতার করা হলো।

তাঁর গ্রেফতারকে সমর্থন করার জন্য দুটি প্রধান ইঙ্গ-ভারতীয় পত্রিকা, 'দি স্টেটস্‌ম্যান' ও 'ইংলিশম্যান' সুভাষের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন করল যে ইংরেজ শাসন উৎখাতের জন্য বিপ্লবী পরিকল্পনার মন্ত্রণাদাতা তিনি। সুভাষের কৌসঁলী তৎক্ষণাৎ সেই দুই পত্রিকার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। যদিও ইণ্ডিয়া অফিস ইঙ্গ-ভারতীয় পত্রিকা দুটিকে তাঁদের মামলায় সাহায্য করেছিলেন, কিন্তু কোন বিপ্লবী ষড়যন্ত্রে তাঁরা সুভাষের সহযোগিতার তথ্য-প্রমাণ খুঁজে পেলেন না। মামলাটি শেষ পর্যন্ত তুলে নেওয়া হয়েছিল।

বসুর গ্রেফতার প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করল দেশে। কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়রের পদ থেকে এক চমৎকার ভাষণ দিয়ে শ্রীদাশ বললেন, "আমি যা বলতে চাই, তা' হলো সুভাষ আমার চেয়ে বেশী বিপ্লবী নয়। তবে কেন তাঁরা আমাকে গ্রেফতার করলেন না? আমি জানতে চাই কেন? স্বদেশের প্রতি ভালবাসা যদি অপরাধ হয় তবে আমি একজন অপরাধী। কেবলমাত্র কর্পোরেশনের চীফ এক্‌জিকিউটিভ অফিসার নয়, মেয়রও সমভাবে দোষী...

"...কোন অভিযোগ আনা হয়নি তাঁর বিরুদ্ধে। কোন জবাবদিহি চাওয়া হয়নি তাঁর কাছ থেকে। কোন কারণ দেখানো হয়নি...এটা কি আইন? এটা কি বিচার?"

গ্রেফতারের নিন্দা করে গান্ধীজী 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় একটি সম্পাদকীয় লিখলেন। বেআইনী গ্রেফতারের প্রতিবাদে ৩১শে অক্টোবর এক বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হলো কলকাতায়।

আলিপুর নিউ সেণ্ট্রাল জেলে প্রায় দু'মাস বন্দী করে রাখা হলো সুভাষকে। তখন তিনি জেল থেকেই তাঁর পৌর কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারতেন। তাঁর সেক্রেটারী দলিল ও ফাইল নিয়ে দেখা করতেন তাঁর সঙ্গে। এইসব সাক্ষাৎকারের সময় জেল অফিসারের পাশে উপস্থিত

থাকতেন একজন পুলিশ অফিসার। পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে প্রায়শই ঝামেলা লেগে থাকত তাঁর। তাই শাস্তি হিসাবে তাঁকে প্রথমে বহরমপুর জেলে এবং সেখান থেকে ১৯২৫ সালের শুরুতে পুনরায় উত্তর বর্মার মান্দালয় জেলে স্থানান্তরিত করা হলো।

মান্দালয় জেলে অবস্থানকালে তিনি বর্মী ভাষা শিক্ষা করেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে বর্মী মানুষেরা অত্যন্ত আন্তরিক, উদার এবং আমুদে চরিত্রের। জেলের অধ্যক্ষ মেজর স্মিথ সুভাষ ও অন্যান্যদের প্রতি ভাল ব্যবহার করতেন। ইংল্যাণ্ড থেকে আগত একজন প্রিজন কমিশনার মিস্টার প্যাটারসন সুভাষ ও অন্যান্যদের অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন 'ভারতের সবচেয়ে ভয়ংকর মানুষদের আটজন' বলে। মান্দালয়ের ডেপুটি কমিশনার মিস্টার ব্রাউন ছিলেন একজন সংস্কৃতিবান মানুষ। সুভাষ তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন। ব্রাউন পত্র-পত্রিকা সরবরাহের কাজে সাহায্য করতেন এবং জেল-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বন্দীদের বিরোধ উপস্থিত হলে মধ্যস্থের ভূমিকা গ্রহণ করতেন। মিস্টার ফিনডলে মিস্টার ব্রাউনের স্থলাভিষিক্ত হলে শুরুতে বিরোধ শুরু হয়েছিল সুভাষের সঙ্গে। কিন্তু শীঘ্রই সে ভুল-বোঝাবুঝি দূর হয়ে যায়।

১৯২৫ সালের অক্টোবর মাসে বন্দীরা বাঙালী হিন্দুর শ্রেষ্ঠ জাতীয় উৎসব দুর্গাপূজা করবেন বলে স্থির করেন এবং অধীক্ষক মেজর ফিনড্লের কাছে অর্থের জন্য আবেদন জানান। তিনি রাজী হলেন, কারণ ভারতীয় বন্দীশালায় ক্রীষ্টান বন্দীদের অনুরূপ সুবিধা দেওয়া হ'ত। সরকার কিন্তু প্রয়োজনীয় অনুমতি দানে অস্বীকৃত হলেন এবং ভৎর্সনা করলেন মিস্টার ফিনডলেকে। এর প্রতিবাদ হিসেবে ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অনশন ধর্মঘট সংগঠিত হলো। অবশেষে সরকার সম্মত হলেন যে ভবিষ্যতে তাঁরা ধর্মীয় প্রয়োজনে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ও অর্থদানের ব্যবস্থা করবেন। ইতিমধ্যে বন্দীদের খরচ-করা অর্থও সরকার ফিরিয়ে দিতে সম্মত হলেন।

বর্মা জেলে বন্দী থাকাকালে সুভাষ ১৯২৫ সালের ১৬ই জুন চিত্তরঞ্জন দাশের আকস্মিক প্রয়াণের সংবাদ পেলেন। ভারতের রাজনৈতিক জীবন থেকে শ্রীদাশের তিরোধান জাতীয় আন্দোলনকে পঙ্গু করে ফেলল। দলের

মধ্যে বিরোধ মাথা তুলে দাঁড়াল। জাতীয় ঐক্যকে দুর্বল করে ফেলল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং দলীয় সংঘাত। শ্রীবসু হারালেন তাঁর বন্ধু, উপদেষ্টা এবং পথপ্রদর্শককে। "১৯২৫ সালের ১৬ই জুন তারিখে দেশবন্ধুর প্রয়াণ," বহু বছর পরে শ্রীদাশের ভূমিকার মূল্যায়ন করতে গিয়ে সুভাষ মন্তব্য করেছিলেন, "ভারতবর্ষের পক্ষে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এক জাতীয় বিপর্যয়।"[১৪]

প্রতিকূল আবহাওয়া এবং অনশন ধর্মঘটের ফলে শ্রীবসুর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়তে শুরু করল। অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠল যখন ১৯২৫ সালের শীতকালে তিনি ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হলেন। ফলে ক্রমাগত জ্বর হতে লাগল এবং তাঁর ওজন হ্রাস পেতে শুরু করল। সুতরাং লেফ্‌-টানান্ট কর্নেল কেলআন আর শ্রীবসুর ভাই ডাক্তার সুনীল বসুকে নিয়ে গঠিত একটি মেডিকেল বোর্ডকে দিয়ে পরীক্ষা করানোর জন্য তাঁকে রেঙ্গুন জেলে বদলী করা হল। তাঁকে জেলে আর বন্দী না রাখার সুপারিশ করলেন ডাক্তার বসু। রেঙ্গুন জেলে সরকারী আদেশের অপেক্ষায় থাকা-কালে তাঁর সঙ্গে অধীক্ষক মেজর ফ্লাওয়ার ডিউ-এর এক বিবাদ ঘটল। পরিণতিতে তিনি ইনসেইন (Insien) জেলে বদলী হলেন। সেখানে তাঁর সাক্ষাৎ হলো মেজর ফিনডলের সঙ্গে। তাঁর সমবেদনা জন্মাল সুভাষের প্রতি। তিন সপ্তাহ ধরে সুভাষের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার পর তিনি এক জবরদস্ত নোট পাঠালেন সরকারের কাছে। সরকার তাঁর মুক্তিদানের বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও এই নোট পেয়ে সে কাজ করতে বাধ্য হলেন। ইতিমধ্যে বেঙ্গল লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলে এক প্রস্তাব মারফত তাঁরা জানালেন যে সুভাষ যদি নিজ ব্যয়ে সুইজারল্যাণ্ড যেতে চান তবে তাঁরা তাঁর মুক্তি এবং রেঙ্গুন থেকে ইওরোপগামী জাহাজে তুলে দেবার ব্যবস্থা করবেন। সুভাষ এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। কারণ তাঁর আত্ম-সম্মানের পক্ষে তা অমর্যাদাকর বলে মনে হলো। ১৯২৭ সালের ৮ই মে শরৎ বসুকে লেখা তাঁর চিঠিতে তিনি আবেগপূর্ণ ভাষায় লিখলেন, "আদর্শসমূহ তাদের আপন ভাগ্য নির্ধারণ করবে। আর আমরা যারা কাদার তাল ঘিরে আছি স্বর্গীয় অগ্নি স্ফুলিঙ্গকে, তারা কেবল এইসব আদর্শের কাছে নিজেদের উৎসর্গ করতে পারি।" কতকগুলি স্বাভাবিক

কারণে তিনি বর্মা থেকে সোজা ইওরোপে যেতে চাইছিলেন না। সেগুলি তিনি পরিষ্কারভাবে জানিয়েছিলেন সরকারকে। বোঝাপড়ায় আসতে অস্বীকার করে তিনি বলেছিলেন: "আমি দোকানদার নই, আমি দর কষাকষি করি না।"

উত্তরপ্রদেশের আলমোড়া জেলে স্থানান্তরিত করার অভিপ্রায়ে ১৯২৭ সালের মে মাসে তাঁকে ইনসেইন জেল থেকে সরিয়ে রেঙ্গুন পরিত্যাগরত এক জাহাজে তুলে দেওয়া হলো। হুগলী নদীর মোহনায় ডায়মণ্ডহারবারে পৌঁছে তিনি পুলিশ গুপ্তচর বিভাগের প্রধান মিস্টার লোম্যানকে দেখতে পেলেন। লোম্যান তাঁকে সেখানেই অবতরণ করতে বললেন। কিন্তু সুভাষ তাতে অস্বীকৃত হলেন এই ভেবে যে তাঁকে গোপনে কলকাতার বাইরে পাচার করা হবে। যাই হোক তাঁকে জানান হলো যে একটি মেডিকেল বোর্ডের সামনে উপস্থিত হতে হবে তাঁকে। সেই বোর্ডে থাকবেন স্যার নীলরতন সরকার, ডাক্তার বি. সি. রায়, লেফ্‌টনাণ্ট কর্নেল স্যানডস্‌ এবং রাজ্যপালের ব্যক্তিগত চিকিৎসক মেজর হিংস্টন। তাঁরা পরীক্ষা করে দেখলেন এবং তার মারফত তাঁদের রিপোর্ট পাঠিয়ে দিলেন দার্জিলিংয়ে রাজ্যপালের কাছে। পরের দিন সকালে মিস্টার লোম্যান তারবার্তা নিয়ে এসে জানালেন যে রাজ্যপাল শ্রীবসুর মুক্তির আদেশ দিয়েছেন। সেদিনটি ছিল ১৬ই মে ১৯২৭ সাল। কিন্তু নির্দেশটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ১৯২৭ সালের ১১ই মে তারিখে। পরবর্তী কালে তিনি জানতে পারেন যে পুলিশ অফিসারেরা তাঁর মুক্তির পথ বন্ধ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সফল হন নি। শ্রীবসুর কথায়, "আমার সৌভাগ্য যে নতুন রাজ্যপাল স্যার স্ট্যানলি জ্যাকসন খোলা মন নিয়ে এসেছিলেন এবং তিনি একজন দৃঢ়চেতা ব্যক্তি ছিলেন। একজন দক্ষ রাজনীতিবিদের নির্ভুল ও স্ব-অভিজ্ঞতা লব্ধ ক্ষমতাবলে তিনি জনগণের ক্ষোভ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। পৌঁছবার কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে জনগণ মূলত চান অত্যাচারী পুলিশবিভাগের হাত থেকে কিছুটা সুরক্ষার ব্যবস্থা। লর্ড লিটনের শাসনকালে পুলিশবিভাগই শাসনকার্য পরিচালনা করে এসেছে এবং তখন বাংলার প্রকৃত গভর্নর হয়ে উঠেছিলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার।

পরে পট পরিবর্তন ঘটেছিল। কার্যভার গ্রহণের অল্প কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই স্যার স্ট্যানলি জ্যাকসন সকলকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে এখন থেকে তিনিই বাংলাদেশ শাসন করবেন, পুলিশ কমিশনার নন। যখনই জনসাধারণের সঙ্গে পুলিশের বিরোধ উপস্থিত হ'ত, তিনি পুলিশকে ক্ষুব্ধ করার ঝুঁকি নিয়েও ন্যায়বিচারের চেষ্টা করতেন।"[১৫]

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৯২৬ সালের শেষের দিকে সুভাষ যখন বর্মার জেলে ক্রমশ ক্ষীণকায় হয়ে পড়ছিলেন তখন বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন বেঙ্গল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে।

১৯২৭ সালের মাঝামাঝি জনগণের অন্তরাত্মা আবার বিক্ষুব্ধ হতে শুরু করল। খড়্গপুরে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে ওয়ার্কশপে এক ধর্মঘট শুরু হলো এবং শ্রমিকদের দাবি মেনে নিতে হলো কোম্পানিকে। নভেম্বর মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত মৈত্রী-সম্মেলন হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হলো।

১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে ভাইস্রয় লর্ড আরউইন কর্তৃক জন সাইমনের নেতৃত্বে ষ্ট্যাটিউটরি কমিশন নিযুক্তির ঘোষণা কংগ্রেস এবং জনগণের অধিকাংশের নিন্দার বিষয় হয়ে উঠল। কমিশনকে অনুসন্ধান করতে বলা হলো "সরকারী গঠনতন্ত্রের কার্যকারিতা সম্পর্কে, শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং বৃটিশ ভারতে প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির বিস্তার ও এসবের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলি সম্পর্কে; দায়িত্বশীল সরকার প্রবর্তনের নীতির প্রতিষ্ঠা কতোখানি কাম্য অথবা প্রচলিত দায়িত্বশীল সরকারের সম্প্রসারণের পরিমাণ, পরিবর্তন অথবা সীমানির্ধারণ সম্পর্কে; সেই সঙ্গে স্থানীয় আইনসভাগুলিতে দ্বিতীয় কক্ষ (Second Chamber) স্থাপন কাম্য কি কাম্য নয়, সেই প্রশ্নটি।" জনসাধারণ ভারতের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ভাবনায় এতো বেশী অভ্যস্থ হয়ে উঠেছিল যে তারা ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বৃটিশ পার্লামেন্টকে বিচারক বলে মেনে নিতে অস্বীকার করল। কমিশনে কোন ভারতীয়কে অন্তর্ভুক্ত না-করার ঘটনাকে এক ইচ্ছাকৃত অপমান বলেও মনে করল তারা।

জনসাধারণের মনোভাব উপলব্ধি করে, মাদ্রাজ কংগ্রেস, (ডিসেম্বর, ১৯২৭) সর্বস্তরে এবং সর্ববিষয়ে সাইমন কমিশন বয়কটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

সুভাষ এবং নেহেরুর নেতৃত্বে তারুণ্য-শক্তির প্রভাবে মাদ্রাজ কংগ্রেস ভারতীয় জনগণের পূর্ণ স্বাধীনতাকে লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করল। সম্মেলন সমাপ্ত হলে মহাত্মা গান্ধী অবশ্য মন্তব্য করেছিলেন যে এটা "তাড়াহুড়ো করে ভাবা হয়েছে এবং অবিবেচকের মতো অনুমোদন করা হয়েছে।"

ইতিমধ্যে জওহরলালের মতোই সুভাষকে একজন যুবনেতা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। ফলে বর্মা থেকে প্রত্যাবর্তনের কিছুদিন পর তাঁকে বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে গ্রহণ করা হলো এবং জওহরলাল ও কুরেশীর সঙ্গে নিযুক্ত করা হলো সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের পদে। দেশের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম এমন এক নতুন সংবিধানের নীতিসমূহের উপর রিপোর্ট তৈরির জন্য মতিলাল নেহেরুকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করে ১৯২৮ সালে একটি ক্ষুদ্র কমিটি গঠিত হ'ল। কমিটির একজন সদস্য নির্বাচিত করা হলো শ্রীবসুকে। জওহরলালের সঙ্গে তিনি "ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ" গঠনে ব্রতী হলেন।

বোম্বাইয়ের সুতাকল, কলকাতার চটকল এবং টিস্কোর শ্রমিকদের বিরাট ধর্মঘটের ফলে জাতীয় আন্দোলন বিপুল প্রেরণা লাভ করল। টিস্কোতে সুভাষ প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করলেন। ওদিকে সাইমন কমিশনের নিন্দা করে লাহোরে মিছিল পরিচালনা করার সময় লাঠিচার্জের ফলে আঘাত পেয়ে পাঞ্জাবের মহান্ নেতা লালা লাজপত রায়ের মৃত্যু হ'লে সমস্ত দেশজুড়ে গভীর শোক ও ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধের সৃষ্টি হলো।

১৯২৮ সালে ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত কলকাতা-সম্মেলন ছিল সুভাষের জীবনে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তিনি কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর জেনারেল অফিসার কমাণ্ডিং-এর জমকালো ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সুভাষের ভূমিকা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন: "সভাপতির সঙ্গী শোভাযাত্রার পুরোভাগে একটি গাড়ীর উপর তিনি যখন দৃপ্তভঙ্গিতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তখন তাঁকে ব্যঙ্গ

করার মতো কণ্ঠস্বরের অভাব হয় নি। একটি পত্রিকা লিখেছিল, 'যেন একজন নায়কের মতো, যিনি জয় করেছেন জনসাধারণের অনীহা আর ভীতিকে।' এই চমৎকার শোভাযাত্রাটিকে একটি নাটুকে প্রদর্শনী এবং কষ্টার্জিত অর্থের অপচয় ভেবেছিলেন অনেক সমালোচক। কিন্তু অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করলে যে-কেউ ভাবতে পারবেন যে এই কল্পনাপ্রবণ যুবক, দেশের স্বাধীনতা ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা যাঁর ছিল না, তাঁর মানসনেত্রে সেই অভিনয়েই অংশ গ্রহণ করে চলেছিলেন, যা ছিল পরবর্তী কালে তাঁর নিজস্ব হাতের কাজ, 'দি ইণ্ডিয়ান গ্যাশনাল আর্মি।'[১৭]

সুভাষের কাছে, "মাদ্রাজের পর কলকাতা সম্মেলন এসেছিল এক বিপরীত চরিত্র নিয়ে। নির্বাচিত সভাপতিকে তাঁর আগমনের দিন যে সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল তা রাজা এবং একনায়কগণের মনে হিংসার উদ্রেক করবে। কিন্তু যেদিন তিনি চলে গেলেন, সেদিন প্রত্যেকের মুখের উপর স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল হতাশার চিহ্ন। সারা দেশ জুড়ে প্রচণ্ড উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছিল সে সময়ে এবং প্রত্যেকেরই আশা ছিল যে কংগ্রেস সাহসের সঙ্গে কাজ করবে। কিন্তু দেশ যখন প্রস্তুত ছিল, নেতারা ছিলেন না। মহাত্মাজী, স্বদেশবাসীর দুর্ভাগ্য, আলোর সন্ধান পেলেন না। ফলে কলকাতা-সম্মেলনের গড়িমসি সিদ্ধান্ত কেবল মূল্যবান সময়ের অপচয় ঘটাল। পাগলামি কিংবা বিভ্রান্তির বশেই কেবল কেউ আশা করতে পারে যে কোন সংগ্রাম ছাড়াই প্রবল প্রতাপান্বিত বৃটিশ সরকার এমন কি স্বায়ত্তশাসিত উপনিবেশের দাবি পর্যন্ত স্বীকার করতে পারে। কংগ্রেসের বৈঠকগুলিতে দশ হাজার শ্রমিকের এক মিছিল কংগ্রেসের মণ্ডপে উপস্থিত হয়েছিল জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সংঙ্গে সংহতি প্রদর্শনের জন্য আর উপবাসী শ্রমিকদের পক্ষ সমর্থন করতে। কিন্তু এইসব বৈপ্লবিক আন্দোলন নেতাদের উপর কোন প্রভাবই ফেলতে পারল না।"[১৮] বসুর আপত্তি সত্ত্বেও কলকাতা-সম্মেলন "ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস" দেশের লক্ষ্য বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে গান্ধীজী এ-কথা বলে জয়ী হলেন যে দলীয় সংহতি অতি মূল্যবান এবং বছর খানেকের মধ্যে যদি স্বায়ত্তশাসনাধিকার মেনে না নেওয়া হয়, তবে দেশ

তার নিজস্ব পথ অনুসরণ করবে। গান্ধীজীর সমর্থকেরা এমন এক ধারণার সৃষ্টি করলেন যে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ না করা হলে তিনি রাজনীতি থেকে বিদায় নেবেন। প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে শ্রীবসু এক আবেগময় আবেদন জানিয়ে বললেন, "মূল সিদ্ধান্তে, আপনারা বারো মাস সময় দিয়েছেন বৃটিশ সরকারকে। আপনারা নিজেদের বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন কি যে এই সময়ের মধ্যে স্বায়ত্তশাসনাধিকার পাবার কোন যুক্তিপূর্ণ সম্ভাবনা আছে? পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু তাঁর ভাষণে স্পষ্ট করে বলেছেন যে, তিনি তা বিশ্বাস করেন না। তা হলে কেন আমরা এই বারোটা মাসের জন্য আত্মসমর্পণ করব? কেন বলব না যে আমরা বৃটিশ সরকারের প্রতি সবটুকু বিশ্বাস হারিয়েছি এবং নিজেরাই দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চলেছি?"[১৯] সুভাষ এবং তাঁর অনুগামীদের তিরস্কার করলেন গান্ধীজী—"স্বাধীনতা কঠিন বস্তু দিয়ে তৈরী, এটা কথার ভোজবাজিতে তৈরী নয়।"

এটা বিস্ময় নয় যে স্বাধীনতার প্রশ্নে বসুর অসহযোগিতার আহ্বান এবং সক্রিয় আন্দোলনের পক্ষে তাঁর ওকালতি, যা তিনি কলকাতা-সম্মেলনে উপস্থিত করেছিলেন, তা ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসন চালিয়ে যাবার পথে প্রধান অন্তরায় বলে প্রতিপন্ন হয়েছিল। এটা ছিল নিষ্ক্রিয়তার বিরোধী, যা তাঁর মতে গান্ধীজী এবং শ্রীঅরবিন্দ প্রচার করেছিলেন!

কলকাতা-সম্মেলন ঘড়ির কাঁটাকে পিছিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু গান্ধীজীর মতো একজন বিচক্ষণ রাজনীতিক সময়ের সংকেত বুঝতে ভুল করেন নি। কলকাতা-সম্মেলনের অব্যবহিত পরেই তিনি চরমপন্থীদের পালের হাওয়া কেড়ে নিলেন এটা প্রচার করে যে ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে যদি সরকার স্বায়ত্তশাসনাধিকারের দাবি মেনে না নেন, তবে তিনি একজন 'স্বাধীনতাওয়ালা' হয়ে উঠবেন। এইভাবে কিছু বামপন্থী নেতাকে নিজের পক্ষে টেনে বিরোধী কর্মীদের মধ্যে বিভেদসৃষ্টিতে সক্ষম হলেন।

১৯২৯ সালের সম্পূর্ণ সময়ের মধ্যে যদিও কংগ্রেস দেশকে কোন সাহসী এবং বিচক্ষণ নেতৃত্বদানে সক্ষম হয়নি, তবু দেশে বৈপ্লবিক কার্যকলাপের আন্তঃপ্রবাহ, শ্রমজগতে অস্থিরতা এবং মধ্যবিত্ত যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে এক জাগরণ অব্যাহত ছিল। ১৯২৯ সালে যতীন দাশের মৃত্যুবরণ সমগ্র

দেশজুড়ে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করল। দেশের প্রতিটি অংশে সংবাদপত্রে তীব্র ক্ষোভ, সভা-সমিতি এবং বিক্ষোভ প্রদর্শনের মাধ্যমে রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি মানবিক আচরণের দাবি জানানো হতে লাগল। সক্রিয় হয়ে ওঠার সিদ্ধান্ত নিলেন সরকার। ১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় এ ধরনের এক বিক্ষোভ-সমাবেশকে উপলক্ষ করে গ্রেফতার করা হ'ল সুভাষসহ অনেক বিশিষ্ট কংগ্রেস-কর্মীকে এবং রাজদ্রোহিতার অভিযোগে বিচারের জন্য প্রেরণ করা হ'ল।

একটা আকর্ষণীয় ব্যাপার হ'ল সুভাষ যদিও কখনও সন্ত্রাসবাদকে স্বদেশ-মুক্তির কার্যকরী অস্ত্র হিসেবে মেনে নেন নি, তবু সন্ত্রাসবাদীদের প্রদর্শিত সাহস এবং আত্মত্যাগের মানসিকতাকে প্রশংসা করতে কুণ্ঠিত হন নি কখনও। তাঁদের উদ্দেশ্যের সমর্থনে তাঁর খোলাখুলি কাজকর্ম নিশ্চিত ভাবেই আইন-শৃঙ্খলার অভিভাবকদের চোখে তাঁকে সন্দেহভাজন করে তুলেছিল। শ্রমিক আন্দোলন আরো বেশী জঙ্গী ও শ্রেণীসচেতন হয়ে উঠলে ১৯২৯ সালের ২৯শে মার্চ সরকার বোম্বাই এবং বাংলার শ্রমিক নেতাদের গ্রেফতার করলেন। মীরাটে তাঁদের বিচার করা হ'ল এবং প্রতিরোধ কমিটির সদস্য হিসেবে বিচারাধীন থাকাকালেই বন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য বসু মীরাটে গেলেন। যতীন দাশের মরদেহ যখন দাহ করবার জন্য লাহোর থেকে কলকাতায় নিয়ে আসা হ'ল, বিশাল মিছিলের পুরোভাগে দেখা গেল বসুকে।

১৯২৯ সাল নাগাদ সুভাষ সর্বভারতীয় নেতা হিসেবে নিজের স্থান করে নিয়েছিলেন। গতিময় ব্যক্তিত্ব এবং দুঃসাহসিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তিনি তরুণদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন এবং দেশের তরুণ-নেতাদের মধ্যে তাঁর স্থান ছিল জওহরলালের পরেই। যদিও মহাত্মা প্রচারিত নীতির অনুগামী ছিলেন জওহরলাল তবু ১৯২৭ সালের ডিসেম্বরে ইওরোপ থেকে ফিরে আসার পর তিনি সাহসের সঙ্গে সমাজবাদের চিন্তাধারা প্রচার করতে লাগলেন। ঐ ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই দুঃশ্চিন্তার কারণ হ'ল মহাত্মাজীর। জওহরলালের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বসু লিখেছিলেন: "তাঁর কষ্টসাধ্য প্রচার ভিন্ন ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের পক্ষে তেমন গুরুত্ব লাভ করা কখনই সম্ভব হতো না।"[২২]

বামপন্থী বিরোধীদের দুর্বল করতে এবং কংগ্রেসে আপন প্রাধান্য পুনরুদ্ধার করার জন্য মহাত্মাজী জওহরলালকে নিজের দিকে টেনে আনার প্রয়োজন বোধ করলেন। তাই তিনি লাহোরে (ডিসেম্বর, ১৯২৯) পরবর্তী কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে পণ্ডিত জওহরলালের প্রার্থী-পদ সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নিলেন। হতাশ হলেন সুভাষ এবং বামপন্থীরা। কারণ তাঁরা সঠিকভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে এরপর থেকে বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রচারক হিসেবে জওহরলাল তাঁর সত্বা হারাবেন এবং গান্ধীজীর একনিষ্ঠ সমর্থক হয়ে উঠবেন।

ইতিমধ্যে ১৯২৯ সালের মাঝামাঝি মিস্টার রামজে ম্যাকডোনাল্ডের নেতৃত্বে একটি শ্রমিক সরকার এলেন ইংল্যাণ্ডের ক্ষমতায়। ভাইস্‌রয় লর্ড আরউইন স্যার জন সাইমন এবং প্রধানমন্ত্রী মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের সঙ্গে আলোচনার পর ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ঘোষণা করলেন যে তাঁকে সুস্পষ্টভাবে ঐ কথা বলার অধিকার দেওয়া হয়েছে যে মহিমাময় সরকারের বিচার অনুসারে ১৯১৭ সালের ঘোষণায় এটাই ইঙ্গিত করা হয়েছিল যে ভারতীয় সংবিধানের অগ্রগতির স্বাভাবিক পরিণতি হ'ল, স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার লাভ করা। সেই কারণে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের পর লণ্ডনে একটি গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। ভাইস্‌রয়ের প্রস্তাব গ্রহণ করে একটি যুগ্ম-ঘোষণা প্রচার করা হ'ল। স্বাক্ষর করলেন গান্ধীজী, দুই নেহেরু (পিতা ও পুত্র), পণ্ডিত মালব্য, ডাক্তার আনসারি, ডাক্তার মুনজি, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, ভি. এস. শাস্ত্রী, স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রু, মিসেস ব্যাসান্ত, শ্রীমতি সরোজিনী নাইডু এবং অন্যেরা। জওহরলাল স্পষ্টত এর বিরোধী ছিলেন এবং বসুর সঙ্গে এক বিপরীত ঘোষণা প্রকাশে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী তাঁকে রাজী করালেন এই ভিত্তিতে যে লাহোর কংগ্রেসের তিনি নির্বাচিত সভাপতি, আর তিনি স্বাক্ষর না করলে কোন গুরুত্ব থাকবে না ঘোষণাপত্রটির। ডাক্তার এস. কিসল্যু, মিস্টার আবদুল বারি এবং সুভাষ স্বায়ত্তশাসনাধিকার গ্রহণের এবং তথাকথিত গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণ করার বিরোধিতা করে একটি পৃথক ঘোষণা-পত্র প্রকাশ করলেন। এতে দেখানো হ'ল যে বছর কয়েক আগে

আয়ারল্যাণ্ডের একটি সংবিধান তৈরির জন্য মিস্টার লয়েড জর্জ যা করেছিলেন ভাইস্‌রয় তেমনই এক ফাঁদ পাতবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু সিনফিন দল তখন প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পেরে সম্মেলন বয়কট করে। যাই হোক, নেতৃবৃন্দের ঘোষণাপত্রটি বিপুল জনসমর্থন লাভ করল। বিপরীত ঘোষণাপত্রটি সমর্থিত হ'ল কেবল বামপন্থী কংগ্রেসী ও সাধারণভাবে যুব-শক্তির দ্বারা।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে কংগ্রেস মিলিত হ'ল লাহোরে এবং পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। বিপুল বিক্ষোভের সৃষ্টি হ'ল গান্ধীজী কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবের একটি ধারাকে কেন্দ্র করে। উক্ত ধারায় বোমায় আক্রান্ত ট্রেনে সৌভাগ্যক্রমে ভাইস্‌রয়ের প্রাণরক্ষা পাওয়ায় তাঁকে অভিনন্দন জানানো হয়েছিল। বামপন্থীদের পক্ষ থেকে সুভাষ একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে জানালেন যে এখন কংগ্রেসের উচিত দেশের মধ্যে একটি সমান্তরাল সরকার গঠন করা। আর উচিত সেই উদ্দেশ্যে শ্রমিক, কৃষক এবং যুবকদের সংগঠিত করার দায়িত্ব হাতে তুলে নেওয়া। প্রত্যাখ্যাত হ'ল এই প্রস্তাব। দলে পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্য স্থির হলেও সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হ'ল না। কোন কর্মসূচীও প্রণয়ন করা হল না আগামী বছরের জন্য। বিষণ্ণ বসু মন্তব্য করেছিলেন, "এর চেয়ে বেশী হাস্যকর কোন পরিস্থিতির কথা কল্পনা করা যায় না, কিন্তু জনসাধারণের ব্যাপারে আমরা যে মাঝেমাঝে কেবল বাস্তববুদ্ধি হারানোর দিকেই ঝুঁকি তাই নয়, সেই সঙ্গে সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানও হারিয়ে বসি।"[২৩] এটা পরিষ্কার যে বামপন্থীদের সমর্থনে সুভাষ তখুনি এক শক্তিশালী আন্দোলন শুরু করতে চাইছিলেন। তাঁর এক ক্ষীণ আশা ছিল যে সমাজবাদে বিশ্বাসী হওয়ায়, শ্রমিক এবং বিশেষত যুবকদের তৎকালীন মানসিকতার কথা মনে রেখে জওহরলাল এক শক্তিশালী প্রচার অভিযান গড়ে তোলার জন্য মহাত্মাজীর উপর চাপ সৃষ্টি করবেন। কিন্তু সভাপতি পদে জুনিয়র নেহেরুর প্রার্থী-পদ সমর্থন করে মহাত্মাজী যে তাঁকে নিজের দিকে টেনে আনবার চেষ্টা করবেন তাঁর এই প্রাথমিক আশঙ্কাই সত্য বলে প্রমাণিত হ'ল। তাঁর মোহমুক্তি সম্পূর্ণ হ'ল যখন মহাত্মাজী ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হিসেবে পনের জনের নাম

উত্থাপন করলেন। তা থেকে বাদ দেওয়া হ'ল শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, সুভাষ এবং অন্যান্য বামপন্থীদের নাম। গান্ধীজী প্রকাশ্যেই ঘোষণা করলেন যে, তিনি একটি অভিন্নমতাবলম্বী কমিটি চান। বিক্ষোভ থাকলেও প্রস্তাবটি সমর্থিত হ'ল। কারণ এটি গান্ধীজীর নেতৃত্বের প্রতি আস্থাজ্ঞাপনের প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছিল। রাজনীতি থেকে বিদায় গ্রহণ এবং আমৃত্যু অনশনের হুমকি সব সমালোচনা বন্ধ করে দিল। এটি ছিল গান্ধীজীর এক বিরাট ব্যক্তিগত জয়। কারণ এর ফলে তাঁর পক্ষে ১৯৩১ সালে লর্ড আরউইনের সঙ্গে চুক্তি-সম্পাদন সম্ভব হ'ল। গোলটেবিল বৈঠকে নিজেকে একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করতে পারলেন তিনি এবং পুণা চুক্তি-সম্পন্ন করলেন ১৯৩২ সালে। এই পদক্ষেপগুলি সর্বনাশা বলে প্রতিপন্ন হ'ল শেষ পর্যন্ত।

রাজনীতির জটিলতার সঙ্গে পরিচিত নন এমন জনসাধারণের পক্ষে লাহোর কংগ্রেস অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক হয়ে উঠল। মতানৈক্য সত্ত্বেও লাহোরে অনুষ্ঠিত মহৎ সম্মেলনটি শেষ হ'ল নতুন আশা আর উৎসাহের বাণী নিয়ে।

বিদ্রোহী নেতা

নতুন বছর শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে আশা আর আত্মবিশ্বাস জেগে উঠল প্রত্যেকের হৃদয়ে। স্বাধীনতার লক্ষ্য অর্জনের জন্য করণীয় বিষয়ে নেতাদের নির্দেশের অপেক্ষা করতে লাগল জনসাধারণ। পরিস্থিতি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন গান্ধীজী। তিনি ঘোষণা করলেন যে, অসহযোগই কেবল বিশৃঙ্খলা আর হিংসা থেকে দেশকে রক্ষা করতে পারে। কারণ একটি হিংসাশ্রয়ী দল আছে যারা কেবল প্রত্যক্ষ সংগ্রামে বিশ্বাস করে। তিনি তাই অহিংসার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য স্বাধীনতা-সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে মনস্থ করলেন। ২৬শে জানুয়ারিকে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালনের জন্য জানুয়ারি মাসের শুরুতেই নির্দেশ পাঠান হ'ল। নির্দেশ দেওয়া হ'ল যে ভারতের সর্বত্র প্রতিটি মঞ্চ থেকে যেন মহাত্মা রচিত এবং ওয়ার্কিং কমিটি সমর্থিত একটি ঘোষণা পাঠ করা হয়। স্বাধীনতা-দিবস (১৯৩০) পালনের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকাকালে সুভাষের বিরুদ্ধে ১৯২৯ সালের আগস্ট মাস থেকে পড়ে-থাকা একটি মামলার রায় দেওয়া হ'ল। এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে ২২শে জানুয়ারি তাঁকে নিয়ে যাওয়া হ'ল জেলে। যাই হোক, প্রবল উৎসাহের সঙ্গে সারা দেশে স্বাধীনতা-দিবস পালিত হ'ল। মহাত্মা নিশ্চিত হলেন যে তিনি তাঁর কর্মসূচী নিয়ে অগ্রসর হতে পারেন। ৩০শে জানুয়ারি তিনি তাঁর পত্রিকা 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'তে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে জানালেন যে তিনি 'স্বাধীনতার সারাংশ' পেলেই সন্তুষ্ট থাকবেন এবং উক্ত ভাষাটির সাহায্যে তিনি কি বোঝাতে চাইছেন তা বিশ্লেষণ করার জন্য নিম্নলিখিত পনেরোটি বিষয়ের উল্লেখ করলেন (১) সম্পূর্ণ মাদক বর্জন; (২) টাকার সঙ্গে পাউণ্ড স্টার্লিং-এর অনুপাত ১ শিলিং ৬ পেন্স থেকে ১ শিলিং ৪ পেন্সে কমিয়ে আনা; (৩) ভূমিরাজস্ব অন্তত পঞ্চাশ ভাগ হ্রাস করা এবং এটিকে আইনসভার নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা; (৪) লবণ কর রদ; (৫) সামরিক খাতে খরচ শুরুতেই অন্তত পঞ্চাশ ভাগ হ্রাস করা; (৬) হ্রাসপ্রাপ্ত

রাজস্বের সঙ্গে মানানসই ভাবে উচ্চপদে চাকুরির মাইনে কমিয়ে দেওয়া; (৭) বিদেশী বস্ত্রের উপর সংরক্ষণমূলক শুল্ক স্থাপন; (৮) কোস্টাল ট্রাফিক রিজার্ভেশন বিল পাস; (৯) খুনী কিংবা ভয় দেখানোর জন্য শাস্তি পাওয়া বন্দী ভিন্ন অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের সাধারণ বিচার-বিভাগীয় ট্রাইবুনালের মাধ্যমে মুক্তিদান; সমস্ত রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার করা; ভারতীয় পেনাল কোডের ১২৪এ ধারা, দি রেগুলেশন অব্ ১৮১৮ এবং অনুরূপ আইন বাতিল করা; এবং সমস্ত নির্বাসিত ভারতীয়কে স্বদেশে ফেরার অনুমতি দান; (১০) গোয়েন্দা বিভাগ এবং জনগণের উপর এর প্রচলিত নিয়ন্ত্রণের অবসান ঘটানো; (১১) জন-নিয়ন্ত্রণের সাপেক্ষে আত্মরক্ষার জন্য আগ্নেয় অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দান।

লাহোর কংগ্রেসের নির্দেশ অনুসারে আইনসভার কংগ্রেসী সদস্যগণ ইতিমধ্যে তাঁদের পদত্যাগপত্র দাখিল করেছিলেন। ১৯৩০ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় লিখতে গিয়ে গান্ধীজী বললেন, "এবার আমি গ্রেফতার হলে কোন নীরব নিষ্ক্রিয় অহিংস আন্দোলন নয়, অত্যন্ত সক্রিয় ধরনের অহিংস আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে যাতে অহিংসায় বিশ্বাসী একজন মানুষও ভারতের লক্ষ্য অর্জনের জন্য অবশ্য পালনীয় ধর্ম-বিধির মতো এ প্রচেষ্টার পরিণতিতে নিজেকে মুক্ত কিংবা জীবিত না দেখতে পান······আমার কথা বলতে গেলে, আমার উদ্দেশ্য আশ্রমের আবাসিকদের দিয়েই এই আন্দোলন প্রথম শুরু করা······

"যদিও হিংসার শক্তিকে সংযত করার জন্য সব কল্পিত এবং সম্ভবপর চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, তবু এইবার আইন-অমান্য আন্দোলন একবার শুরু হলে তা আর বন্ধ করা যাবে না এবং যতক্ষণ পর্যন্ত একজন আইন-অমান্য-কারীও মুক্ত কিংবা জীবিত থাকবে ততক্ষণ তা বন্ধ করা উচিত হবে না।"[১]

মহাত্মার কর্মসূচী সম্পর্কে নিম্নলিখিত মন্তব্য করলেন বসু: "আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার সময় তিনি সমঝোতার দরজা খোলা রাখতে চেয়েছেন এবং তিনি বুঝতে পেরেছেন যে কংগ্রেসের স্বাধীনতার প্রস্তাব একটি প্রতিবন্ধক বলে প্রমাণিত হতে পারে। তিনি এটাও অনুভব করতে

পেরেছিলেন যে তাঁর ধনবান সমর্থকদের কেউ কেউ—ভারতীয় পুঁজিপতিরা লাহোর কংগ্রেসের প্রস্তাবে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। তাই এক ধরনের কৈফিয়ত দিয়ে এড়িয়ে যাবার প্রয়োজন ছিল। বিশেষত একথা বিবেচনা করে যে 'স্বাধীনতা' শব্দটির অর্থ বৃটিশের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ।"[২] মহাত্মা নির্দেশিত পরবর্তী পদক্ষেপগুলির প্রশংসা করে সুভাষ মন্তব্য করেছিলেন যে সেগুলি সর্বকালের জন্য তাঁর নেতৃত্বের সর্বোৎকৃষ্ট কীর্তির অন্যতম বলে পরিগণিত হবে এবং সংকটময় মুহূর্তে তাঁর কূটনীতিক দক্ষতা যে কোন্ পর্যায় উন্নীত হতে পারে তা প্রকাশ করবে।[৩]

জওহরলাল অবশ্য গান্ধীজীর 'এগার দফা'র সমালোচনা করেন। তাঁর প্রশ্ন ছিল: "আমরা যখন স্বাধীনতার কথাই বলছি, তখন ভাল হলেও, কিছু রাজনৈতিক এবং সামাজিক সংস্কারের তালিকা প্রস্তুত করার অর্থ কি? এই শব্দটি ব্যবহার করার সময় গান্ধীজী কি আমাদের মতোই তার অর্থ করেছেন, নাকি আমাদের ভাবার মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে?"[৪]

মহাত্মা সবরমতী আশ্রমের আবাসিকদের নিয়ে লবণ আইন ভঙ্গের* ইচ্ছার কথা ঘোষণা করলেন। আর সমস্ত দেশের পক্ষে তাই হবে আন্দোলন শুরু করার ইঙ্গিত। মার্চ মাসের ২ তারিখে তিনি তাঁর ভাবনা এবং সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে চিঠি পাঠালেন ভাইসরয়ের কাছে। ভাইসরয় একটি ছোট্ট উত্তর পাঠিয়ে গান্ধী আইন লঙ্ঘন করতে চাইছেন বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন।

নিজ নির্ধারিত কর্মসূচীর প্রতি নিষ্ঠায় মহাত্মা লবণ আইন ভঙ্গের জন্য সমুদ্রতীরবর্তী গ্রাম ডাণ্ডির উদ্দেশ্যে তাঁর তিন সপ্তাহের পদযাত্রা শুরু করলেন। সারা রাস্তায় অভূতপূর্ব সম্বর্ধনা পেলেন মহাত্মা এবং তা সরকারকে বুঝিয়ে দিল যে আসন্ন আন্দোলন হবে এক অতি গুরুতর ব্যাপার।

বসু তখন জেলে থাকলেও আকর্ষণ জীইয়ে রেখেছিলেন ব্যাপারটি সম্পর্কে। প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে তিনি মন্তব্য করেছিলেন,

* এই আইন প্রকৃতিদত্ত লবণ ব্যবহার করতে দিত না জনসাধারণকে। তাদের বাধ্য করা হতো বিদেশ থেকে লবণ আমদানি করতে।

"......ডাণ্ডি অভিযান এক ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যাকে এলবা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর নেপোলিয়নের প্যারী অভিযান কিংবা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য মুসোলিনির রোম যাত্রার সঙ্গে এক পংক্তিতে স্থান দেওয়া চলে।"[৫]

সমুদ্রতটে পড়ে থাকা লবণের অংশবিশেষ দখল করে ৬ই এপ্রিল মহাত্মাজী আইন অমান্য শুরু করলেন। তিন কিংবা চার দিন বাদে সমস্ত কংগ্রেসী সংগঠনকে একইভাবে কাজ করার এবং আইন-অমান্য শুরু করার অনুমতি দেওয়া হল।

দেখে মনে হল এ যেন কোন সহসা নির্গত নির্ঝর; আর লবণ প্রস্তুতই হ'ল সমগ্র দেশের আলোচনার বিষয়। জনগণের বিপুল উৎসাহ জওহরলালকে বলতে বাধ্য করল, "গান্ধীজী যখন প্রথম প্রস্তাব করেন তখন এর কার্যকারিতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিলাম বলে আমরা কিছুটা কুণ্ঠিত এবং লজ্জিত। আমরা বিস্মিত বোধ করছি মানুষটির বিশাল জনগণকে প্রভাবিত করার বিস্ময়কর কৌশল আর সংগঠিত উপায়ে তাকে কার্যকর করার ক্ষমতা লক্ষ্য করে।"[৬]

এই অহিংস আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য মহাত্মা এক বিশেষ আবেদন জানালেন ভারতের মহিলা-সমাজের কাছে। আবেদনে সাড়া দিয়ে এমন কি অত্যন্ত রক্ষণশীল ও অভিজাত পরিবারের মহিলারাও বাইরে বেরিয়ে এলেন। ভারতীয় মহিলাগণের নবজাগরণ লক্ষ্য করে বিস্মিত হলেন মিস্ মেরী ক্যাম্পবেল, যিনি চল্লিশ বছর ধরে মদ্যপান বর্জনের একজন কর্মী হিসেবে কাজ করেছেন ভারতে, এবং মিস্টার স্লোকোম্বির মতো বিদেশী পরিদর্শক।

মহিলাসমাজের শক্তি এবং উৎসাহ পুরুষদের আরো বড় আত্মত্যাগে উৎসাহিত করল। শুরু হবার তিন সপ্তাহের মধ্যে আন্দোলনকে আঘাত করার সিদ্ধান্ত নিলেন সরকার। জওহরলাল গ্রেফতার হলেন ১৪ই এপ্রিল। প্রেস অর্ডিনান্স জারী করে সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনা হল পত্রিকাগুলিকে। প্রতিবাদস্বরূপ অধিকাংশ জাতীয়তাবাদী পত্রিকা তাদের প্রকাশ বন্ধ রাখল দীর্ঘদিনের জন্য। কংগ্রেসী সংগঠনগুলিকে সারা দেশে বেআইনী ঘোষণা করা হ'ল।

আন্দোলনে আরো বেশী গতি সঞ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তা দমন করার প্রচেষ্টায় সরকার ক্রমশই নির্দয় আর হিংস্র হয়ে উঠতে লাগলেন।

আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য সরকার যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে ছিল নির্বিচার এবং হিংস্র শক্তি প্রয়োগ, মহিলাদের উপর আক্রমণ এবং সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি। আর এইসব ব্যবস্থা বৈপ্লবিক কাজ-কর্মকে আবার জাগিয়ে তুলল। দুঃসাহসিক কার্যকলাপে কলঙ্কিত হ'ল ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাস। ইণ্ডিপেণ্ডেন্স্ পার্টির নেতা পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এবং ভি. জে. প্যাটেল আইনসভা থেকে পদত্যাগ করলেন। বাংলাদেশে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করলেন কিছু তরুণ যুবক সূর্য সেনের নেতৃত্বে এবং বেশ কয়েকদিনের জন্য তাঁরা দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন বৃটিশ শাসনযন্ত্রকে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আফ্রিদি উপজাতিরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল এবং অসুবিধায় ফেলতে লাগল সরকারকে। নিরস্ত্র জনসমাবেশের উপর গুলি চালাতে অস্বীকার করল গাড়োয়ালী সেনারা।

৫ই মে গান্ধীজী গ্রেফতার হলেন। ফলে গণবিক্ষোভের সৃষ্টি হ'ল সমস্ত জায়গায়। মিছিল এবং ঘনঘন হরতালের ফলে যেমন লাঠি-চার্জ ও গুলি চলতে লাগল তেমনি হিংসাত্মক ঘটনাও ঘটতে লাগল বিভিন্ন স্থানে। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অধীনে সোলাপুরে জনসাধারণ বিদ্রোহ ঘটিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করল। বেশ কিছুদিনের জন্য ব্রিটিশ শাসনের আয়ত্তের বাইরে রইল বাংলার একটি জেলা—মেদিনীপুর।

কার্যরত সভাপতি মতিলাল নেহেরু এবং ওয়ার্কিং কমিটির সম্পাদক সৈয়দ মহম্মদ গ্রেফতার হলেন জুনে।

২৯শে আগস্ট বিনয় বোসের হাতে নিহত হলেন বাংলার ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ মিস্টার লোম্যান। ফলে দমন-পীড়ন চলতে লাগল বাংলার তরুণ যুবক এবং ছাত্রদের উপর। এই নির্দয় কাজের প্রতিশোধ নিতে বিনয় বোস, বাদল গুপ্ত এবং দীনেশ গুপ্ত কলকাতায় রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণ করলেন ৮ই ডিসেম্বর এবং হত্যা করলেন ইন্সপেক্টর জেনারেল অব প্রিজন কর্নেল সিম্পসনকে।

কয়েদখানার গরাদের পিছনে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে ছিলেন না সুভাষ।

১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতার আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দীদের অভিযোগ জানাবার জন্য সুভাষ, কলকাতার তৎকালীন মেয়র মিস্টার জে. এম. সেনগুপ্ত এবং অন্যান্যদের উপর এক আক্রমণ চালানো হল।

সুভাষের মতে ১৯৩০ সালের শেষে এবং ১৯৩১ সালের শুরুতে পরিবেশ ছিল সরকার এবং কংগ্রেসের মধ্যে চুক্তিসাধনের উপযুক্ত। কারণ তখন ক্ষমতায় ছিলেন লেবর পার্টি এবং ইণ্ডিয়া অফিসের দায়িত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন ওয়েজউড বেন। তাছাড়াও লর্ড আরউইন ছিলেন ভাইস্‌রয় এবং ভারতের গভর্নর জেনারেল। "তিনি" সুভাষের মতে, "এ কথা অনুধাবন করার পক্ষে যথেষ্ট দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন যে, সরকার এবং কংগ্রেসের মধ্যে যদি কোন সমঝোতায় পৌঁছতে হয় তবে মহাত্মা নেতৃত্বে থাকাকালেই তা করা কাম্য……"[৭] তার মধ্যে লর্ড আরউইনের দৃষ্টি ছিল সাধারণ বৃটিশ রাজনীতিবিদ্‌দের তুলনায় অনেক উদার, এক সহজাত ন্যায় ও বিচারবোধ ছিল তাঁর মধ্যে। বোম্বাই, গুজরাট, যুক্ত প্রদেশ, বাংলা এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের (পর্যায়ক্রমে সর্বশেষ হলেও গুরুত্বে নয়) অবস্থা ছিল সত্যিই গুরুতর, যা সরকারকে একটা সমাধানের পথ খুঁজতে বাধ্য করেছিল।

বন্ধুত্বের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ২৫শে জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাদের মুক্তি দেওয়া হ'ল। মজার ব্যাপার হ'ল, সুভাষ, যিনি সবেমাত্র জেল থেকে ছাড়া পেয়েছিলেন, কলকাতার মেয়র হিসেবে ২৬শে জানুয়ারি নিষেধ অমান্য করে একটি মিছিলের নেতৃত্ব দেবার সময় লাঠি-চার্জের ফলে গুরুতর আহত হয়ে পুনরায় গ্রেফতার হলেন। পরের দিন তাঁর পট্টি বাঁধা হাত ঝোলান অবস্থায় এবং রক্তমাখা জামাকাপড়ে তাঁকে কোর্টে হাজির করা হ'ল। পুনরায় ছ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হ'ল তাঁকে। এর আগে সাতদিনের আরো একটি শাস্তি দেওয়া হ'ল জানুয়ারিতে মালদহ জেলায় প্রবেশ না করার আদেশ অগ্রাহ্য করার জন্য। যাই হোক, ৮ই মার্চ সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শনের ফলে সুভাষ মুক্তি পেলেন।

বসু জেলে থাকা কালেই গান্ধী-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হ'ল। মহাত্মাকে ঘিরে থাকা ধনবান অভিজাতশ্রেণী এবং একটা সমাধানের জন্য আকুল

প্রার্থনারত কিছু রাজনীতিবিদ্‌দের চাপ ছিল এর পিছনে। আশা করা গিয়েছিল যে, কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে জওহরলাল এর বিরোধিতা করবেন। কারণ তিনি বামপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এবং ওকালতিও করেছিলেন এর পক্ষে। দুর্ভাগ্যক্রমে নেতার ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করলেন তিনি, যদিও চুক্তির কোন কোন বিষয় তিনি সমর্থন করেন না বলে বিবৃতি দিয়েছিলেন। বেদনার সঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছিলেন: "এরই জন্য কি আমাদের জনগণ একটি বছর ধরে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছেন? আমাদের সব নির্ভিক কথাবার্তা এবং কাজকর্মের পরিণতি কি এই? কংগ্রেসের স্বাধীনতার ঘোষণা, ২৬শে জানুয়ারির অঙ্গীকার কি বারবার উচ্চারিত হবে? তাই আমি সেই মার্চের রাত্রে শুয়ে শুয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করেছি। কোন মূল্যবান জিনিস হারাবার দুঃখে আমার হৃদয় যেন শূন্য হয়ে গিয়েছিল, প্রায় ফিরে পাবার কোন আশা না রেখেই।"[৮]

ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল, যখন মহাত্মা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সম্মত হলেন যে (১) আইন-অমান্য আন্দোলন মুলতুবি রাখা হবে, (২) লণ্ডনে আসন্ন গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনায় যোগদান করবেন এবং (৩) চাপ সৃষ্টি করবেন ভারতের বিভিন্ন অংশে পুলিশী অত্যাচারের অভিযোগ সম্পর্কে তদন্তের দাবিতে। সরকারের পক্ষ থেকে ভাইসরয় সম্মত হলেন যে, (১) অহিংস আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত সব রাজনৈতিক বন্দীদের একত্রে মুক্তি দেবেন, (২) ইতিমধ্যেই সরকার বিক্রয় কিংবা নীলাম না করে থাকলে সব সম্পত্তি এবং জমি মালিককে প্রত্যার্পণ করা হবে, (৩) প্রত্যাহার করা হবে জরুরীকালীন ঘোষণা, (৪) সমুদ্রতট থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে বসবাসকারী সকলকে শুল্ক ছাড়াই লবণ সংগ্রহ এবং প্রস্তুত করার অনুমতি দেওয়া হবে, (৫) অনুমতি দেওয়া হবে মদ, আফিং এবং বিদেশী বস্ত্রের দোকানে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং-এর। তবে তা বৃটিশ দ্রব্যের বিরুদ্ধে অসাম্য সৃষ্টির জন্য নয়, স্বদেশী আন্দোলনকে উৎসাহ দেবার জন্য।

মুক্তি পেয়ে সুভাষ বুঝলেন যে চুক্তিটি একটি স্থিরীকৃত ঘটনা, করাচি কংগ্রেসে এর অনুমোদন বন্ধ করা সম্ভব নয়। তবু বম্বু বোম্বাইতে মহাত্মাজীর

সঙ্গে দেখা করলেন। চুক্তিটির সমালোচনা করার পরে তাঁকে জানালেন যে যতদিন তিনি স্বাধীনতার পক্ষে থাকবেন ততদিন তিনি তাঁকে প্রয়োজনীয় সাহায্য দিয়ে যাবেন। মহাত্মা তাঁর পক্ষ থেকে আশ্বাস দিলেন যে করাচি কংগ্রেসের কাছে তিনি অনুরোধ জানাবেন যে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানকারী কংগ্রেস প্রতিনিধিদলের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করে কংগ্রেস যেন নির্দেশ জারী করে এবং সে নির্দেশ যেন লাহোর কংগ্রেসের ঘোষণা করা স্বাধীনতার মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। আর চুক্তির বাইরে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরাও যাতে সাধারণ ক্ষমা লাভ করেন তাঁর জন্য তিনি তাঁর সব প্রভাব এবং শক্তি ব্যয় করবেন।

বোম্বাই থেকে মহাত্মা দিল্লীর উদ্দেশ্যে রওনা হলেন এবং একই ট্রেনে তাঁকে সঙ্গ দিলেন বসু। দিল্লীতে পৌঁছে তাঁরা জানতে পারলেন যে সরকার লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় সরদার ভগৎ সিং এবং তাঁর দুই সঙ্গীকে ফাঁসি দিতে মনস্থ করেছেন। কাজটি যেহেতু দিল্লী-চুক্তি অর্থাৎ গান্ধী-আরউইন চুক্তির মূলনীতির বিরোধী, তাই বসু পরামর্শ দিলেন যে প্রয়োজনবোধে মহাত্মা এই প্রশ্নে ভাইসরয়ের সঙ্গে চুক্তি-ভঙ্গ করতে পারেন। কিন্তু এমন এক কাজ করে নিজেকে বিপ্লবী বন্দীদের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলতে চাইলেন না মহাত্মা। লর্ড আরউইনের সঙ্গে গান্ধীর দেখা হ'লে আরউইন মহাত্মাকে জানালেন যে তিনি তাঁদের শাস্তি আপাতত রদ করবেন এবং গুরুত্বের সঙ্গে বিষয়টি বিবেচনা করে দেখবেন। সে যাই হোক, ২৩শে মার্চ সরদার ভগৎ সিং এবং তাঁর দুই সঙ্গীকে ফাঁসিকাঠে ঝোলান হ'ল। এ কাজের ফলে চুক্তির সমর্থকেরা ঘাবড়িয়ে গেলেন। তাঁদের আশঙ্কা হ'ল যে ২৬শে মার্চ অনুষ্ঠিত করাচি কংগ্রেসে প্রকাশ্যে ভাঙন দেখা দেবে। কিন্তু ঘটল না যা অবশ্যম্ভাবী ছিল। কারণ বসু এবং চুক্তিবিরোধী অন্যান্যরা অনুভব করলেন যে, দলে ভাঙন ধরিয়ে বাস্তব কিছু অর্জন করা যাবে না। যতক্ষণ না পর্যন্ত একটি নতুন আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হয়, জনসমর্থন এবং আর্থিক অসঙ্গতির ফলে যার ভবিষ্যৎ অত্যন্ত হতাশজনক, একটি ভাঙন সাধারণভাবে কেবল সরকারের হাতকেই শক্তিশালী করবে।

কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করতে বসে সরদার বল্লভভাই প্যাটেল তাঁর

প্রারম্ভিক ভাষণে বিদায় জানালেন লাহোর প্রস্তাবকে এবং ভারতের জন্য স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে ওকালতি করলেন। যেসব প্রস্তাব পাস করা হ'ল তার একটিতে সরদার ভগৎ সিং এবং তাঁর সঙ্গীদের সাহস ও আত্মত্যাগের প্রশংসা করা হ'ল। অনুমোদিত হ'ল গান্ধী-আরউইন চুক্তি। অনুমোদিত অন্য প্রস্তাবগুলিকে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানকারী কংগ্রেস প্রতিনিধি-দলের উপর নির্দেশ জারী করা হ'ল এবং ভারতীয় জনগণের যে মৌলিক অধিকারের জন্য লড়াই করবে কংগ্রেস, তার কথাও বলা হ'ল। শেষেরটির উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেসের সমাজবাদী অংশগুলিকে খুশি করা।

কংগ্রেসের সঙ্গেই অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় যুব-কংগ্রেসের সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে আহ্বান জানানো হল সুভাষকে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস থেকে বের হয়ে আসতে চাইছিলেন পাঞ্জাব এবং সিন্ধের যুবকেরা। বসু তাঁদের বোঝালেন যে বেরিয়ে না এসে কংগ্রেসের সরকারীযন্ত্রকে অধিকার করুন তাঁরা। চুক্তির তীব্র সমালোচনা করলেন সুভাষ এবং সাধারণভাবে তা সমর্থিত হ'ল যুব-কংগ্রেসে।

বসু অনুভব করেছিলেন যে কূটনৈতিক যোগ্যতার অভাবই চুক্তিটির অসম্পূর্ণতার কারণ। আরো ভাল দরকষাকষি করে, এমনকি ১৯৩৩ সালের মার্চেও সরকারের কাছ থেকে আরো বেশী কিছু আদায় করা যেতো। কারণ একটা সমঝোতার জন্য তখন সত্যই অত্যন্ত ব্যগ্র ছিলেন তাঁরা। বিষণ্ণচিত্তে বসু মন্তব্য করেছিলেন, "...অনড় মানসিকতার মানুষেরা রাজনৈতিক দর কষাকষির পক্ষে মোটেই উপযুক্ত নন। মহাত্মার কথা বলতে গেলে, তিনি একগুঁয়েমি ও উদারতার মধ্যে অনবরত দিক পরিবর্তন করেন। তা ছাড়া তিনি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েন ব্যক্তিগত আবেদনের কাছে—এমন সব মানসিক অভ্যাস নিয়ে কোন মানুষের পক্ষে প্রতিপক্ষের সঙ্গে রাজনৈতিক দরকষাকষিতে টেক্কা দেওয়া খুবই মুশকিল। দিল্লীর শান্তি-চুক্তি সরকারের পক্ষে অত্যন্ত সুবিধাজনক হ'ল। কংগ্রেসের কৌশল আরো গভীরভাবে খতিয়ে দেখার সময় পেলেন তাঁরা এবং তারপর সেই সংগঠনটির সঙ্গে ভবিষ্যৎ আচরণের জন্য নিখুঁতভাবে গড়ে তুললেন তাঁদের শাসনযন্ত্র!"[১]

চুক্তি অনুসারে সাধারণ ক্ষমাপ্রদর্শনের প্রতিশ্রুতির সীমাবদ্ধ সুযোগ

করল যে সম্পূর্ণ হতাশ হয়েছেন তিনি। সম্মেলনের শেষে তিনি মত প্রকাশ করলেন যে সম্ভাবনার দিক থেকে এখন পথ বাছাইয়ের প্রশ্ন এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর সামনে। কিন্তু তাঁর আশা যে সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব না হলেও প্রতিটি পক্ষ বিদ্বেষশূন্য ভাবে সে সংগ্রাম পরিচালনা করবে। লণ্ডন পরিত্যাগের পূর্বে সংবাদপত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি জানালেন যে এই মুহূর্তে সমগ্র দেশজুড়ে আইন-অমান্য আন্দোলন পুনরায় শুরু করার কোন প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু এটা তিনি আগেই বুঝতে পারছেন যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অন্যায় এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ স্থানীয় ভিত্তিতে আইন-অমান্য আন্দোলন ঘটবার সম্ভাবনা রয়েছে।

ফেরার পথে তিনি কিছু সময়ের জন্য প্যারীতে অবস্থান করলেন, কিন্তু কোন রাজনীতিবিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন না। এমন কি কোন চেষ্টাও করলেন না ভারতের প্রশ্নটিকে আন্তর্জাতিক গুরুত্বের বিষয়ে পরিণত করার। জেনিভা পরিদর্শন করলেন তিনি, কিন্তু লীগ অব্ নেশনস সংস্থার কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাতের কোন আন্তরিক প্রচেষ্টা দেখালেন না। তিনি অবশ্য মহান ভারতবন্ধু রেঁমা রোঁলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। সুইজারল্যাণ্ড থেকে তিনি গেলেন ইতালিতে এবং সেখানে দেখা করলেন সিগ্‌নর মুসোলিনীর সঙ্গে। তাঁর প্রচেষ্টার সাফল্যের জন্য শুভেচ্ছা জানালেন মুসোলিনী। ফ্যাসিবাদী কর্তৃপক্ষের প্রতি তাঁর আচরণ এবং ফ্যাসিবাদী অনুগামীদের সমাবেশে তাঁর উপস্থিতি ফ্যাসিবাদ বিরোধী-গোষ্ঠীগুলির তীব্র নিন্দার কারণ হ'ল!

২৮শে ডিসেম্বর তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করলে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি মিলিত হ'ল এবং ভাইস্‌রয়ের সঙ্গে আলোচনার আহ্বান করার অধিকার দেওয়া হলো তাঁকে। গান্ধীজী একটি তারবার্তা পাঠিয়ে জানালেন যে সীমান্ত প্রদেশ, বাংলাদেশ এবং যুক্ত প্রদেশ অর্ডিনান্স, সীমান্তে গুলিচালনা এবং পণ্ডিত জওহরলাল, মিস্টার শেরওয়ানী, রেড্‌শার্ট ভলান্টিয়ারদের নেতা আবদুল গফর খান এবং তাঁর ভাই-এর গ্রেফতারের খবর পেয়ে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ভাইস্‌রয় অস্বীকার করলেন। মহাত্মা ভাইস্‌রয়ের কাছে আবার একটি

তারবার্তা পাঠিয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি দান করতে অনুরোধ জানালেন। ১৯৩২ সালের ২রা জানুয়ারি ভাইসরয় গান্ধীকে জানালেন যে আইন অমান্যের হুমকির মুখে কোন সাক্ষাৎকার সম্ভব নয়।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে সুভাষ সাক্ষাৎকারের অনুরোধ না জানানোর উপদেশ দিয়েছিলেন মহাত্মাজীকে। কিন্তু অন্যেরা তাঁর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন। ৪ঠা জানুয়ারি ভারত সরকার সারা ভারতে সব স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে এই মর্মে নির্দেশ পাঠালেন যে এখুনি যেন সমস্ত কংগ্রেসী সংগঠনের উপর আঘাত হানা হয়। ১৯৩১ সালে সরকার কর্তৃক প্রস্তুত অর্ডিনান্সটি এবার কার্যকরি করা হলো। কংগ্রেসী নেতাদের কোন রকম আইন-অমান্য আন্দোলন গড়ে তোলার আগেই ব্যাপকভাবে গ্রেফতার করা হ'ল। বেআইনী ঘোষণা করা হ'ল কংগ্রেস সংগঠনকে। অফিসগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া হ'ল। বাজেয়াপ্ত করা হ'ল তার অর্থভাণ্ডার। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হ'ল; নিষিদ্ধ করা হ'ল জাতীয় সাহিত্য।

২রা জানুআরি সুভাষ গ্রেফতার হলেন। সমস্ত ধরনের গ্রেফতার ও অত্যাচার সত্ত্বেও আইন-অমান্য আন্দোলন চলতে লাগল পুরোদমে। ১৯৩০ এবং ১৯৩২ সালের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য ছিল যে ১৯৩২ সালে আক্রমণাত্মক ভূমিকায় ছিল কংগ্রেস, কিন্তু ১৯৩০ সালে চিত্রটি হ'ল সম্পূর্ণ বিপরীত। ১৯৩২-এ কংগ্রেসের আন্দোলন শুরু করার কোন পূর্ব-প্রস্তুতি না থাকলেও আন্দোলন শক্তি সঞ্চয় করতে লাগল। অবশ্যই কিছু দুর্বলতা প্রকাশ পেতে থাকল এখানে ওখানে।

১১ই মার্চ স্যার স্যামুয়েল হোয়ারকে মহাত্মা লিখে জানালেন যে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যবস্থা করে যদি অনুন্নত সম্প্রদায়কে হিন্দুদের মূল জীবন থেকে পৃথক করার চেষ্টা হয়, তবে জীবন দিয়েও তিনি তা রোধ করবেন। গান্ধীজীর হুমকিকে উপেক্ষা করে মিস্টার র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড ১৭ই আগস্ট 'সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা (Communal Award) ঘোষণা করলেন। পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর ভিত্তিতে আইনসভার কিছু আসন পূর্ণ করার ব্যবস্থা হ'ল। পরের দিনই মহাত্মা বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে জানালেন

যে ২০শে সেপ্টেম্বর দুপুর থেকে তিনি তাঁর আমৃত্যু অনশন শুরু করবেন।

বন্দী অবস্থায় মহাত্মার এই সিদ্ধান্তের সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন বোধ করলেন জওহরলাল। "শুধুমাত্র একটি নির্বাচকমণ্ডলীর প্রশ্ন—এমন এক গৌণ বিষয়কে তাঁর চরম আত্মত্যাগের কারণ" করে তোলায় মহাত্মার প্রতি বিরক্ত হলেন তিনি। কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের উপর? অন্তত এই মুহূর্তের জন্যও কি বৃহত্তর বিষয়গুলি সরে যাবে না পিছনে? এবং যদি তাঁর তাৎক্ষণিক লক্ষ্য অর্জিতও হয় এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য পাওয়া যায় এক সম্মিলিত নির্বাচকমণ্ডলী, তবে তা কি এই অনুভূতির সৃষ্টি করবে না যে কিছু অর্জন করা গেছে, এবং এখনকার মতো আর বেশী কিছু করার প্রয়োজন নেই? সেই সঙ্গে তাঁর আচরণ কি সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা কিছু অংশে মেনে নেওয়া নয়······ এটি কি অসহযোগ এবং আইন-অমান্য আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ? এতখানি আত্মত্যাগ আর সাহসী প্রচেষ্টার পর আমাদের আন্দোলন কি এক অর্থহীন কিছুতে পর্যবসিত হবে?"[১০] এ কথা উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে একই ভাবে গোলটেবিল বৈঠকেরও সমালোচনা করেছিলেন জওহরলাল যখন তিনি বলেছিলেন,"····· এটি ভারতের প্রধান বিষয়গুলি থেকে বিশ্বের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে এবং ভারতের মধ্যে এটি সৃষ্টি করেছে মোহভঙ্গ, হতাশা এবং এক অপমান বোধ। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে পুনরায় মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি দান করল এটি।"[১১]

ঘোষণা অনুসারে মহাত্মাজী তাঁর আমৃত্যু অনশন শুরু করলেন ২০শে সেপ্টেম্বর এবং তাঁর অনশনের পঞ্চম দিনে একটি চুক্তির মাধ্যমে সমাধান খুঁজে পাওয়া গেল যা পরবর্তী কালে পুণা-চুক্তি নামে পরিচিত।[১২] চুক্তিটি প্রকৃতপক্ষে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর বিলুপ্তি ঘটাল। হিন্দু-সমাজের বিবেক জাগ্রত করে শেষ হল গান্ধীজীর অনশন। এর ফলাফলের মূল্যায়ন করে বসু মন্তব্য করেছিলেন, "মহাত্মার অনশন দেশবাসীর উপর বিস্ময়কর প্রভাব বিস্তার করলেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এটি একটি অবিমিশ্র আশীর্বাদ বলে

প্রমাণিত হ'ল না। এটি সামঞ্জস্যহীন ভাবে অনুন্নতশ্রেণীর প্রচারে সাহায্য করল। এতদিন পর্যন্ত বিশ্ব ভারত সম্পর্কে একটি বিষয় অবগত ছিল, রাজনৈতিক বিষয়—ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ভারতের ক্ষোভ। এখন জাতীয় আন্দোলনের নেতা স্বয়ং পৃথিবীর কাছে ঘোষণা করলেন যে আরো একটি বিষয় রয়েছে—আভ্যন্তরীণ বিষয়—ভারতের কাছে এমনই তার গুরুত্ব যে তিনি তাঁর জন্য আত্মোৎসর্গেও প্রস্তুত ছিলেন। সেই সঙ্গে বৃটিশ প্রচারকেরাও পিছিয়ে রইলেন না এ সুযোগ গ্রহণে……

"এই অনশনের আরো একটি দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি ঘটেছিল, যার গুরুত্ব ছিল আরো বেশী। এটি এমন এক সময় রাজনৈতিক আন্দোলনকে এড়িয়ে যেতে সাহায্য করল যখন এর প্রতি সম্ভবপর সবরকমের দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন ছিল।"[১৩]

পদস্থ সরকারী মহল কোন্ দৃষ্টিতে এই অনশনকে দেখেছিলেন তা জানা সম্ভবত আকর্ষণীয় হবে। ভারত সরকারের হোম ডিপার্টমেণ্টের এ্যাডিশন্যাল সেক্রেটারী স্যার রিচার্ড টোটেনহেম লেখেন, "আইন অমান্য আন্দোলন যখন ব্যর্থ হতে চলেছে এবং নিম্নগামী হয়েছে মিস্টার গান্ধীর জনপ্রিয়তা, তখন, তেমন এক পরিস্থিতিতে, সেপ্টেম্বরের ১৩ তারিখে, অনুন্নতশ্রেণীর জন্য প্রস্তুত প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতির পরিবর্তন না ঘটলে তিনি আমৃত্যু অনশনের সিদ্ধান্ত নিলেন। ডাক্তার আম্বেদকর এই অনশনকে বর্ণনা করলেন একটি 'পুরোদস্তুর রাজনৈতিক' চাল। অপরদিকে অন্যান্য মহলে এটিকে হৃত সম্মান পুনরুদ্ধারের এক চেষ্টা বলে মনে করা হ'ল···অনশন শুরু হয়েছিল ২০শে সেপ্টেম্বর আর কয়েকটি দিনের উত্তেজিত আলোচনার পর একটি চুক্তিতে উপনীত হওয়া গেল। যা 'পুণা-চুক্তি' নামে পরিচিত····· মিস্টার গান্ধী এখনও যে উপায়ে কেবল জনসাধারণের কাছে নয়, যুক্তির বদলে নেতাদের আবেগের কাছে আবেদন জানাতে পারেন তা এই অনশন দেখিয়ে দিল।"[১৪]

স্যার টোটেনহোমের সর্বশেষ বক্তব্য বসুর মতেরই প্রতিধ্বনি করে। কারণ, বসুও বলেছিলেন, "মহাত্মা যতদিন অনশন করবেন ততদিন সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে যুক্তিবাদী চিন্তা এবং তাঁর স্বদেশবাসীর একমাত্র ভাবনা হবে কিভাবে তাঁর জীবন রক্ষা করা যায়।"[১৫]

"কংগ্রেসী কার্যকলাপ সম্পর্কে বলতে গেলে," স্যার টোটেনহেম মন্তব্য করেছিলেন, "আইন-অমান্য আন্দোলন দুর্বল হতে লাগল এবং তখনকার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল মিস্টার গান্ধীর ১৯৩৩ সালের মে এবং আগস্ট মাসে দুটি অনশন আর তারই অনুসরণে রাজনৈতিক কার্যকলাপ উপেক্ষা ক'রে অস্পৃশ্যতা আন্দোলনে অধিকতর মনোনিয়োগ।"[১৬]

জেলের ভিতরে বসে বসু যখন দেশের আভ্যন্তরীণ ঘটনাপ্রবাহের মূল্যায়নে ব্যস্ত, তখন তাঁর শারীরিক অবস্থা, যা বর্মা জেলে বন্দী থাকা-কালীন সময় থেকেই কখনও আর ভাল হয় নি, গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠতে লাগল। বন্দীজীবনের চৌদ্দ মাস অতিক্রম হবার পর তাঁর শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক অবস্থায় পৌঁছলে লক্ষ্ণৌয়ের লেফ্‌টেনাণ্ট কর্নেল বাক্‌লে, আই. এম. এস., (যিনি তাঁর চিকিৎসা করছিলেন) চিকিৎসার জন্য তাঁকে ইওরোপ প্রেরণের পরামর্শ দিলেন। বহু চিন্তা-ভাবনার পর তীব্র অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁকে ইওরোপে যাবার অনুমতি দিলেন ভারত সরকার। বোম্বাইতে উপকূল ত্যাগ করার মুহূর্তে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হ'ল এবং ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে তিনি ভিয়েনাতে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

সরকারের কাছে বসু যে সর্বাপেক্ষা প্রহেলিকাময় এবং ভীতিপ্রদ ব্যক্তিত্ব উঠেছিলেন তা এই আলোচনার শেষে সংযুক্ত বিভিন্ন প্রামাণিক তথ্যসমূহ এবং পত্র-পত্রিকার রিপোর্ট থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

যদিও তাঁর ইওরোপ ভ্রমণের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল দ্রুত আরোগ্যলাভ করা তবু এটা বিস্ময়কর নয় যে ইওরোপে ফিরে তিনি সুযোগের সদ্ব্যবহার করবেন তাঁর মাতৃভূমির বিষয়গুলি তুলে ধরবার জন্য। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মহাদেশের সমস্ত স্বাধীনতা-প্রেমী জনগণের নৈতিক এবং কার্যকরী সমর্থন আদায় করা। বসুর উপর কোন আস্থা ছিল না ব্রিটিশ সরকারের, তাই এমব্যাসী এবং কনস্যুলেটগুলিকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল এবং পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল তাঁর কার্যকলাপের উপর নজর রাখার। নির্দেশগুলি প্রতি-পালন করার প্রয়াসে ব্রিটিশ এজেন্টগণ তাঁর কার্যকলাপের উপর নজর রাখে এবং কর্তৃপক্ষের কাছে যে রিপোর্ট পাঠায়, গ্রন্থের সঙ্গে যুক্ত দলিলপত্রগুলি থেকে তা জানতে পারা যাবে।

বসু যখন ভিয়েনায়, মহাত্মা জেলের ভিতরে আরো একটি তিন সপ্তাহের অনশন শুরু করেন ৮ই মে তারিখে। এর কারণ ছিল, জেলের বাইরে তাঁর অনুগামীগণ অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ আন্দোলনে যথেষ্ট অগ্রসর হতে পারেন নি।

এই অনশনকে বিপুলভাবে প্রচার করা হ'ল ইওরোপে। কারণ এটি ভারতীয় জনগণের আভ্যন্তরীণ বিরোধ সম্পর্কিত প্রচারে সাহায্য করেছিল। আইন-অমান্য আন্দোলন ব্যর্থ হতে চলেছে বুঝে সরকার তাঁকে মুক্তি দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন। গান্ধীজীর মুক্তিলাভের পর তাঁর সুপারিশে কংগ্রেসের কার্যরত সভাপতি মিস্টার এ্যানে আইন-অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখার নির্দেশ জারী করলেন। আন্দোলন স্থগিত রাখার পর অর্ডিনান্স তুলে নেওয়া এবং আইন-অমান্যকারী বন্দীদের মুক্তিদানের জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানালেন মহাত্মা গান্ধী। কিন্তু সরকার অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করলেন।

সুভাষ এবং ভি. জে. প্যাটেল, যিনিও সেই সময় চিকিৎসার জন্য ভিয়েনাতে ছিলেন, এক লিখিত ঘোষণা প্রচার করে মহাত্মার সিদ্ধান্তের সমালোচনা করলেন। তাঁরা অনুভব করেছিলেন যে আরো বৈপ্লবিক নীতি এবং নেতৃত্বের সন্ধান করার এটাই উপযুক্ত সময়। যেহেতু মহাত্মার অনশন চলছিল তখন, তাই বিশেষ প্রভাব বিস্তারে অসমর্থ হ'ল ঘোষণাটি।

জুলাই মাসে জেলের বাইরে-থাকা বিশিষ্ট কংগ্রেসীদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো পুণাতে। পুণা-সম্মেলনের অব্যবহিত পরে মহাত্মা ভাইসরয়ের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলেন, কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হলেন তিনি। তিনি তখন ব্যক্তিগতভাবে আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। ১৯৩৩ সালের অগাস্ট মাস নাগাদ মহাত্মা এবং তাঁর কিছু অনুগামী পুনরায় জেলে বন্দী হলেন। জেলে গিয়ে গান্ধীজী বুঝতে পারলেন যে পূর্বে অস্পৃশ্যতাবিরোধী আন্দোলন পরিচালনার সময় সেখানে তাঁকে যে সমস্ত সুবিধা দেওয়া হয়েছিল এবার তা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে তাঁকে। তিনি সরকারকে জানালেন যে তিনি তাঁর অভিযোগ প্রতিকারের জন্য অনশনের পথ গ্রহণ করবেন। ব্যক্তিগত আইন-অমান্যও ব্যর্থ হতে চলেছে বুঝে এবং মহাত্মাকে মুক্তিদানের মধ্যে কোন ঝুঁকি নেই জেনে সরকার গান্ধীজীকে মুক্তি দিলেন।

মুক্তি পেয়ে মহাত্মাজী কংগ্রেসের কার্যরত সভাপতি এ্যনেকে সারা দেশের সব কংগ্রেসী সংগঠন ভেঙে দেবার পরামর্শ দিলেন। কারণ তাঁর মতে কংগ্রেসী সংগঠনগুলি দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠেছিল। এইভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টি সর্বাধিক হতবুদ্ধিকর হয়ে উঠল।

আইন-অমান্য যে ব্যর্থ হয়েছে তা স্পষ্ট হয়ে উঠল ১৯৩৪ সালের শুরুতে। জওহরলালের মোহভঙ্গ সম্পূর্ণ হ'ল। তিনি মন্তব্য করেন, "......আলিপুর জেলের সেই সেলটিতে আমি অত্যন্ত নিঃসঙ্গ বোধ করছিলাম। জীবন যেন এক নিরানন্দ ব্যাপার, নিঃসঙ্গতার এক অতি ঊষর প্রান্তর। যেসব কঠিন শিক্ষা আমি পেয়েছি তার মধ্যে সর্বাধিক কঠোর এবং অত্যন্ত বেদনাদায়কটি এখন আমার মুখোমুখি হয়েছে: তা হ'ল কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে কারো উপর আর নির্ভর করা চলে না। প্রত্যেকের উচিত জীবনের পথে একাই চলা; অপরের উপর নির্ভর করার অর্থ হতাশা।"[১৭] আন্দোলন প্রত্যাহার করার জন্য মহাত্মাজী যে কারণ দেখিয়েছিলেন তা তাঁর কাছে বুদ্ধির প্রতি অপমান এবং একজন জাতীয় আন্দোলনের নেতার পক্ষে বিস্ময়জনক কাজ বলে প্রতিভাত হয়েছিল।[১৮] তবু জওহরলাল মহাত্মার সঙ্গত্যাগে সক্ষম হলেন না।

জওহরলালের দুর্বলতার উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বসু লেখেন "এমন এক জনপ্রিয়তা নিয়ে, যা ছিল কেবলমাত্র মহাত্মার পরেই, স্বদেশবাসীর কাছে এমন সীমাহীন সম্মান অর্জন করে, শ্রেষ্ঠ ভাবনাসমূহে সমৃদ্ধ একটি উজ্জ্বল মস্তিস্কের অধিকারী হয়ে, আধুনিক বিশ্বের আন্দোলনগুলি সম্পর্কে সর্বশেষ জ্ঞানের অধিকারী হবার পরও, যে তাঁর মধ্যে নেতৃত্বের একান্ত প্রয়োজনীয় গুণগুলির অভাব ঘটবে, যেমন সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা এবং প্রয়োজনে অপ্রিয়ের মুখোমুখি হওয়া, তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।"[১৯]

বসু প্রায় তিন বছর (১৯৩৩-৩৬) ইউরোপে ছিলেন, কেবলমাত্র অল্প সময়ের ব্যতিক্রম ছাড়া, যখন ১৯৩৪ সালের ডিসেম্বর মাসে পিতার গুরুতর অসুস্থতার তারবার্তা পেয়ে তিনি ভারতে এসেছিলেন। পিতাকে অবশ্য জীবিত দেখতে পান নি তিনি। কারণ তাঁর পৌঁছবার আগের দিনই পিতার মৃত্যু হয়। ১৮১৮ সালের রেগুলেশন থ্রি অনুসারে কলকাতায় তাঁর উপর

এক নির্দেশ জারী করে স্বগৃহে অন্তরীণ রাখা হ'ল তাঁকে। তিনি প্রায় মাস-খানেক তাঁর পরিবারের সঙ্গে বাস করে ১৯৩৫ সালের জানুয়ারি মাসে পুনরায় ইউরোপের উদ্দেশে যাত্রা করেন।

রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পুনরুত্থানের ব্যাপারে গান্ধীবাদের কৌশলে এবং আদর্শে বিশ্বাস হারিয়ে বসুর মন তখন ভিন্নপথে কাজ করতে শুরু করেছিল। ভগ্নস্বাস্থ্য সত্ত্বেও তিনি ইওরোপের বিশেষত সেইসব দেশ-পরিভ্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেন যারা পুরনো ব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারিয়েছিল এবং তার মোকাবিলা করতে চেয়েছিল।

সরকার যেহেতু তাঁকে একজন চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী, বিপজ্জনক বিপ্লবী এবং বলশেভিক এজেন্ট বলে মনে করতেন, তাই শুরুতে তাঁকে কেবল চিকিৎসার কারণে অস্ট্রিয়া, ইতালি, ফ্রান্স ও সুইজারল্যাণ্ড সফরের অনুমতি দেন। ১৯৩৩ সালের ২৫শে মার্চ ভিয়েনায় বৃটিশ কনসাল তাঁর পাসপোর্টে হাঙ্গেরী ও চেকোশ্লাভেকিয়া যাবার এবং ১৯৩৩-এর ২৪শে এপ্রিল যুগোশ্লোভিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, গ্রীস, তুরস্ক, স্পেন, পর্তুগাল, সুইডেন, নরওয়ে ও ডেনমার্ক ভ্রমণ করার অনুমতি দিলেন। তাঁর মূল পাসপোর্টটিতে লালকালিতে উল্লেখ করা ছিল—"জার্মানী অথবা বৃটিশ সাম্রাজ্যে প্রবেশের পক্ষে বৈধ নয়।" তাঁর একান্ত প্রচেষ্টা এবং কিছু বৃটিশ এম. পি. র চাপ-সৃষ্টির ফলে সরকার চিকিৎসাসংক্রান্ত পরামর্শ গ্রহণের জন্য জার্মানী যাবার অনুমতি দিতে রাজী হলেন। একজন বৃটিশ প্রজা হলেও ইংল্যাণ্ডে যাবার অনুমতি ছিল না তাঁর। কিন্তু সর্তকিতের তালিকায় তাঁর নাম না থাকায় ভিয়েনায় কনসাল তাঁকে বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড এবং পোলাণ্ড ভ্রমণের অনুমতি দিলেন। তিনি অবশ্য বসুর পাসপোর্টে মিশরের জন্য অনুমোদন দান অস্বীকার করলেন। লক্ষণীয় মজার ব্যাপারটি হ'ল ভিয়েনায় কনসাল এবং প্রাগে ভাইস্-কনসালের এই উদার আচরণ ভাল চোখে দেখলেন না ইণ্ডিয়া অফিসের কর্তৃপক্ষ। যাই হোক, ভারতের সেক্রেটারী অব স্টেটের নির্দেশে একটি গোপন নোটের দশটি কপি পাঠানো হয়েছিল বিদেশ মন্ত্রণালয়ের দপ্তরে। স্যার জন সাইমনের বিবেচনার্থে পরামর্শ দেওয়া হ'ল যে ঐ নোটের একটি করে কপি ভিয়েনা,

বার্লিন, রোম, প্রাগ, ওয়ারশ, ব্রুসেলস এবং প্যারী, যেসব স্থানে বসুর ভ্রমণ করার কথা আছে, সেখানে প্রতিনিধিদের কাছে পাঠানো হোক, তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে সতর্কিত করার জন্য। বসু যেহেতু এককালে কলকাতার মেয়র ছিলেন, তাই কর্তৃপক্ষের আশঙ্কা ছিল যে যাঁরা তাঁর সম্পর্কে জানেন না স্বাভাবিক ভাবেই তিনি তাঁদের কাছ থেকে সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন।

বৃটিশ সরকার অনুমান করতে পেরেছিলেন যে বসুর ইংল্যাণ্ড ভ্রমণ তাঁদের পক্ষে অত্যন্ত অস্বস্তিকর এবং বিপজ্জনক ব্যাপার হয়ে উঠবে। কারণ তরুণ ভারতীয় ছাত্রগণ বসুর বৈপ্লবিক চিন্তার দ্বারা সংক্রামিত হবেন।

বসুর পরিকল্পিত ভ্রমণসূচীর মধ্য থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বাদ পড়ার বিষয়ে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীঅশোকনাথ বসু, যিনি সে সময় ইওরোপে ছিলেন এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে চলেছিলেন কাকার সঙ্গে, লিখেছিলেন যে, বসুর মূল উদ্দেশ্য ছিল পোল্যাণ্ড থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে যাওয়া। কিন্তু সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ তাঁকে প্রয়োজনীয় ভিসা মঞ্জুর করেন নি।[১০] নাৎসি জার্মানী এবং বৃটেনের সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি মনোভাবের কথা যদি কেউ মনে রাখেন, তবে কাজটিকে অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না। বিশ্ব-পরিস্থিতির বাস্তব অবস্থা সোভিয়েত নেতাদের সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অধীনস্থ জাতিগুলির লড়াইয়ে সাহায্য করা এবং বিপ্লবে প্ররোচিত করার প্রাথমিক উৎসাহ ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল। বিপ্লবের সাফল্যসমূহ সংহত করতে ব্যস্ত সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ সম্ভবত আশঙ্কা করেছিলেন যে বসুর সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণ গ্রেট বৃটেন এবং জার্মানীকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে একত্রিত হতে প্ররোচিত করবে।

ইণ্ডিয়া অফিসের নথিপত্র থেকে অবশ্য এটা জানা যায় যে সঙ্গত কারণেই বসু সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণের আশায় পাসপোর্টের সুযোগ গ্রহণ করার জন্য পীড়াপীড়ি করেন নি। স্মরণ করা যেতে পারে যে চিকিৎসার কারণেই তাঁকে ইওরোপ যাবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং এই যুক্তিতেই তিনি জার্মানী ও ইংল্যাণ্ডে যেতে চেয়েছিলেন। প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও যখন বিভিন্ন মহল থেকে আসা চাপের ফলে কর্তৃপক্ষ বসুকে জার্মানী যাবার

অনুমতি দেন, তখনও তাঁর ইংল্যাণ্ড সফরের অনুমতি দানে স্বীকৃত হন নি তাঁরা। সুভাষ জানতেন যে সরকারের দৃষ্টিতে তিনি সর্বদাই একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তি। সুতরাং তাঁর সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণ উন্নততর চিকিৎসাসংক্রান্ত পরামর্শগ্রহণে সাহায্য করবে এ যুক্তি কেউ মেনে নেবেন না। বরং সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণের জন্য পীড়াপীড়ি করলে তা সন্দেহ আরো বাড়িয়ে তুলবে এবং তাঁর গতিবিধির উপর আরো বেশী বাধা সৃষ্টি করা হবে। কোন কোন মহলের ধারণা বসু রাশিয়ার সাহায্যগ্রহণে ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু এ ধারণা ভুল বলেই মনে হয়, কারণ রোঁমা রোঁলা লিখেছিলেন: "নিজের দিক থেকে বসু প্রায় কমিউনিজমের দ্বার-প্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, কিন্তু এ ব্যাপারে কর্ণপাত করতে চাইতেন না তিনি। সম্ভবত তাঁর বিরোধিতার ভিত্তি ছিল ভারতে ঐ দলের তৎকালীন প্রতিনিধি সম্পর্কিত কিছু ব্যক্তিগত কারণ; কারণ তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে নিজেকে মুক্ত করার জন্য ভারতের সোভিয়েত সাহায্য গ্রহণের পিছনে তিনি অবশ্যই খারাপ কিছু দেখেন না। সোভিয়েতের বিরুদ্ধে তাঁর প্রধান অভিযোগই ছিল যে নিজস্ব জাতীয় রাজনীতিতে মনো-নিবেশ করার জন্য আজ তাঁরা যেন বিশ্ববিপ্লবে আগ্রহ হারিয়েছেন।"[২১]

রাশিয়াকে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত দেখেছিলেন বসু এবং যদিও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকতা তার বাহ্যিক চেহারা বজায় রাখার চেষ্টা করেছিল, তবু বিশ্ব-বিপ্লবে উৎসাহ যোগানর খুব কমই আগ্রহ ছিল রাশিয়ার। রাশিয়া এবং অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের মধ্যকার চুক্তি এবং সেইসব চুক্তির লিখিত ও অলিখিত বাধ্যবাধকতা, সেই সঙ্গে তার লীগ অব্ নেশন্সের সদস্যপদ একটি বৈপ্লবিক শক্তি হিসেবে রাশিয়ার অবস্থাকে অনেক সংযত করে ফেলেছিল। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে রাশিয়া তার আভ্যন্তরীণ শিল্প পুনর্গঠনের কাজে এবং তার পূর্বাংশে জাপানী ভীতির মোকাবিলার প্রস্তুতিতে খুব বেশী ব্যস্ত। তাই সে ভারতের মতো দেশের প্রতি আগ্রহ দেখানোর তুলনায় বৃহৎ শক্তিগুলির সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে বেশী আগ্রহী।[২২]

যদিও বসুর প্রাথমিক চিন্তা ছিল স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করা, কিন্তু তাঁর মতো

প্রকৃতির মানুষের পক্ষে নিজ মাতৃভূমির প্রয়োজনের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন অবশ্যই সম্ভব ছিল না। তিনি তাই তাঁর ইওরোপে স্বল্পস্থায়ী অবস্থানের মধ্যে নিম্নলিখিত কাজগুলি সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন : (১) ভারতের বিরুদ্ধে বৃটিশ সরকারের কুৎসামূলক প্রচারের বিরোধিতায় ভারতের ভাবমূর্তি ঊর্ধ্বে তুলে ধরা ; (২) ভারতের স্বাধীনতার জন্য নৈতিক এবং বাস্তব সাহায্য সংগ্রহ করা ও (৩) আন্তর্জাতিক রাজনীতির আভ্যন্তরীণ ধারাটিকে উপলব্ধি করা এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে ভারতের সাহায্যে কাজে লাগানো ; (৪) বিশেষ করে ইওরোপের সেইসব দেশের রাজনৈতিক পদ্ধতির শিক্ষা গ্রহণ করা যেসব দেশ ফ্রান্স এবং ইংলাণ্ডের মতো সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে ভয় দেখাচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বিতার।

ভিয়েনায় অবস্থানকালে বসু অস্ট্রিয়ার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলেন। তিনি সেখানকার কমিউনিস্ট দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। সমাজবাদীদের নিয়ন্ত্রণাধীন ভিয়েনার মেয়র পুরসভা পরিদর্শনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন বসুকে। এমনকি তিনি পুরসভার কাজকর্ম পরীক্ষা করেও দেখেছিলেন।

চেকোশ্লোভাকিয়ায় তিনি বিদেশমন্ত্রী ডাক্তার বেনসের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন বিখ্যাত চেক যুব-আন্দোলনকে এবং পরিচিত হয়েছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংল্যাণ্ড এবং রাশিয়ার সাহায্যে গঠিত চেক-লিজিয়নের ইতিহাসের সঙ্গে। অস্ট্রিয়ার প্রভুত্বের বিরুদ্ধে মুক্তি-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল এই বাহিনী। বিশিষ্ট চেক ভারততত্ত্ববিদ্ প্রফেসর লেসনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন তিনি।

প্রাগে পোল্যাণ্ডের কুটনীতিবিদের সাহায্যে তিনি পোল্যাণ্ড সফরের সুযোগ পান এবং প্রথম মহাযুদ্ধের সময় রাশিয়ার অধিকার থেকে স্বাধীনতা লাভের জন্য জাপানে পোল্যাণ্ড সেনাবাহিনীর শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি।

বসু পরিচিত হয়েছিলেন মাদাম ই. হোরূপের সঙ্গে। 'ইণ্টারন্যাশনাল কমিটি ফর ইণ্ডিয়া' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন তিনি। প্রতিষ্ঠানটির অফিস ছিল জেনিভাতে।

স্বাস্থ্যপরীক্ষার অজুহাতে সুভাষ জার্মানীতে গেলেও বৈদেশিক দফতরের কিছু নাৎসী নেতা এবং অফিসারের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন তিনি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ভারতের জন্য নৈতিক এবং বাস্তব সাহায্যের সন্ধান করা। কারণ তিনি অনুভব করেছিলেন যে আপন জাতীয় শক্তি এবং আত্মসম্মানের চেতনায় জেগে উঠেছে যে জার্মান জাতি, তারা সহজাত প্রেরণাতেই একই লক্ষ্যে সংগ্রামরত অন্যান্য জাতিদের সম্পর্কে গভীর সহানুভূতি পোষণ করবে। বিশেষত তাঁর জানার আগ্রহ ছিল যে কিভাবে জার্মানীতে হিটলার এবং ইতালিতে মুসোলিনী অতি অল্প সময়ের মধ্যে জাতীয় চেতনাকে এত উর্ধ্বে তুলে ধরতে পেরেছিলেন যে এই দুটি দেশ ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সের প্রাধান্যকে পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা জানাতে সক্ষম হয়েছিল।

কিন্তু ভারতে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে ১৯৩৬ সালে তিনি যখন পুনরায় জার্মানী ভ্রমণ করেন তখন তিনি দুঃখের সঙ্গে লিখেছিলেন: "আমি দুঃখিত যে আমাকে ভারতে ফিরে যেতে হচ্ছে এই বিশ্বাস নিয়ে যে জার্মানীর নবজাতীয়তাবাদ কেবল সংকীর্ণ আর স্বার্থপরই নয়, উদ্ধতও বটে।"[২৩]

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের পক্ষে ইতালি যেহেতু খোলাখুলি সমর্থন জানিয়েছিল এবং গোলটেবিল বৈঠক সেরে ফেরার পথে মহাত্মাকে জানিয়েছিল বিপুল সম্বর্ধনা, বসু তাই ইতালিতে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। ১৯৩৫ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি সাক্ষাৎ করলেন মুসোলিনীর সঙ্গে এবং ১৯৩৪ সালের ডিসেম্বরে লণ্ডনে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থ "দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল'-এর একটি কপি উপহার দিলেন তাঁকে। ইংরেজী পত্রিকা এবং সাময়িক পত্রে অত্যন্ত প্রশংসাসূচক সমালোচনা প্রকাশিত হলেও ভারত সরকার এই গ্রন্থটিকে নিষিদ্ধ করেন। পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ সম্পর্কে আলোচনার জন্য মুসোলিনীর আমন্ত্রণে তিনি বহুবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার এবং 'ওরিয়েন্টাল স্টুডেন্ট্স্ কংগ্রেসে' প্রদত্ত তাঁর ভাষণ ভারত সরকার এবং সমস্ত ইওরোপে তাঁদের এজেন্টদের দৃষ্টি এড়ায়নি। তাঁদের উপর নির্দেশ ছিল বসুর গতি-বিধির উপর বিশেষ নজর রাখা। ইওরোপে বসুর কার্যকলাপ যে ইংল্যাণ্ডের

রক্ষণশীলমহলে ভীতির কারণ হয়ে উঠেছিল তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে হাউস অব্ কমন্স-এ ১৯৩৩ সালের ১৩ই নভেম্বর তারিখে স্যার ওয়াল্টার স্মাইলসের এবং ১৯৩৫ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি মিস্টার থর্পের উত্থাপিত প্রশ্নগুলি থেকে।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রতি জওহরলালের দৃষ্টিভঙ্গির তুলনায় বসুর কার্যকলাপ ছিল সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। যদিও জওহরলাল সিগনর মুসোলিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিলেন—কারণ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে এমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন যে মানুষটি তাঁর সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে জানা, কিন্তু আবিসিনিয়ার উপর ধারাবাহিক আক্রমণ এবং মুসোলিনীর সঙ্গে একটি সম্ভাব্য সাক্ষাৎকার ফ্যাসিবাদী প্রচারে ব্যবহৃত হবার আশঙ্কা ১৯৩৬ সালে ইতালির উক্ত নেতার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল। অবাস্তব ছিল জওহরলালের আচরণ, বিশেষত আত্মজীবনীতে তিনি নিজেই যখন লিখেছিলেন: "বিশ্বযুদ্ধ মনুষ্যজাতিকে ভয়ংকর ভাবে পশুতে রূপান্তরিত করেছে এবং আমরা এর ভবিষ্যৎ ফল দেখেছি যুদ্ধবিরতির পরও জার্মানীতে প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ সৃষ্টিতে—'কোন জাতির দ্বারা সংগঠিত সর্বাধিক অর্থহীন বর্বর বিভৎস নিষ্ঠুরতার অন্যতম', যেমন একজন ইংরেজ লেখক বর্ণনা করেছেন এটিকে। ১৮৫৭ এবং '৫৮ সালগুলিকে ভুলে যায়নি ভারত।" (পৃষ্ঠা ৪০০) এই যুক্তিতে যে কেউ স্বাভাবিকভাবেই বলতে পারেন যে জওহরলালের ইংল্যাণ্ড ভ্রমণে যাওয়া উচিত ছিল না এবং সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রশংসা করা উচিত ছিল না তার সাফল্যের জন্য। কারণ বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশটি, অর্থাৎ সংযুক্ত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র, ইতালির সঙ্গে চুক্তি করেছিল এবং ইতালি সেই দেশ যে ফ্যাসিবাদ প্রচার করে এবং যাকে সুস্পষ্ট ভাষায় নিন্দা করেছেন নেহেরু।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রতি ভারতীয় নেতাদের এই ধরনের আচরণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে ১৯৩৪ সালের মার্চ মাসে জেনিভা থেকে একটি বিবৃতি মারফত বসু মন্তব্য করেন: "আমাদের বিদেশ-নীতির ক্ষেত্রে আমাদের নিজস্ব সামাজিক রাজনৈতিক চিন্তাধারা অথবা অনুরাগ যেন ভিন্ন-মতাবলম্বী জনগণ কিংবা জাতিসমূহের বিরুদ্ধে সংস্কারগ্রস্ত না করে তোলে।

তা সত্ত্বেও তাদের সহানুভূতিলাভে সমর্থ হতে পারি আমরা। বিদেশ-নীতির ক্ষেত্রে এটি এক বিশ্বজনীন অত্যাবশ্যক নিয়ম, এবং এই নিয়মের ফলেই আজ ইওরোপে সোভিয়েত রাশিয়া এবং ফ্যাসিবাদী ইতালির মধ্যে একটি চুক্তি কেবল সম্ভবপরই নয়, বাস্তব ঘটনা। সুতরাং আমাদের বিদেশ-নীতির ক্ষেত্রে পৃথিবীর যে-কোন প্রান্ত থেকে ভারতের জন্য আসা যেকোন রকম সহানুভূতি আমরা খোলামনে গ্রহণ করব।"[২৪]

ইতালি এবং অবিসিনিয়ার বিরোধের শুরু থেকেই বসু গ্রেট বৃটেন কর্তৃক ভারতীয় বাহিনীকে আবিসিনিয়াতে প্রেরণের সম্ভাবনা সম্পর্কে ভারতীয়দের সতর্ক করে দিয়েছিলেন। ১৯৩৫ সালের ১লা অক্টোবর ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর চিঠিতে তিনি তাঁর এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, যদিও ভারতীয় কমাণ্ডার-ইন-চীফ্ আশ্বাস দিয়েছিলেন যে ভারতীয় বাহিনীকে আবিসিনিয়ায় মোতায়েন করার পূর্বে মতামত গ্রহণ করা হবে ভারতীয় জনসাধারণের। বাস্তবে অবশ্য ভারতীয় জনমতের তোয়াক্কা না করেই ভারতীয় বাহিনীকে আবিসিনিয়াতে প্রেরণ করা হয়। এই ব্যবস্থার কূটনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করে বসু বলেছিলেন: "কারণটি পরিষ্কার। আবিসিনিয়ায় বৃটিশ নীতির প্রতি ভারতীয়দের সমর্থন আদায় করার চিন্তা থেকেই ভারতীয় বাহিনীকে প্রেরণ করা হয়েছিল। আর অপরদিকে উদ্দেশ্য ছিল ইতালিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে ভারতের বিপুল সম্পদ রয়েছে গ্রেট বৃটেনের পিছনে।"[২৫]

মুসোলিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর ক্রীড়নকে পরিণত হন নি বসু। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্যবাদের প্রশ্নে এক পক্ষকে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়াকে দ্বিধাবিভক্ত করা। তিনি বিশ্বাস করতেন: "দুটি পথ আছে, যে পথে সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটতে পারে—হয় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কার্যকলাপের সাহায্যে তাকে উৎখাত করা অথবা, সাম্রাজ্যবাদীদের পরস্পর বিধ্বংসী আভ্যন্তরীণ লড়াইয়ের মাধ্যমে শেষ হয়ে যাওয়া। যদি ইতালিতে সাম্রাজ্যবাদের উত্থান দ্বিতীয় পথের অগ্রগতি ঘটিয়ে থাকে তবে বৃথাই যন্ত্রণা ভোগ করে নি আবিসিনিয়া।"[২৬]

১৯৩৫ সালের ৩রা এপ্রিল জেনিভাতে বসু সাক্ষাৎ করেন পশ্চিমের

মহান্ পণ্ডিত এবং ভারতবন্ধু রেঁমা রোঁলার সঙ্গে। সাক্ষাৎকার চলাকালে তিনি অত্যন্ত খুশী হয়ে উঠেছিলেন, যখন রোঁমা রোঁলা মন্তব্য করেন যে, সত্যাগ্রহ ব্যর্থ হলে তিনি কামনা করবেন আন্দোলন ভিন্ন পথ অনুসরণ করুক। কারণ সুভাষের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে মহাত্মা আশ্চর্যজনক ভাবে এতদিন সেবা করেছেন তাঁর দেশকে এবং তেমনই করে চলবেন তিনি। তবু তাঁর নেতৃত্বে ভারতের মুক্তি অর্জন সম্ভব নয়।

ইওরোপে অবস্থানকালে বসু যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, ফ্রান্স, তুরস্ক এবং আয়ারল্যাণ্ডও ভ্রমণ করেন। তুরস্কের কামাল আতাতুর্ক এবং আয়ারল্যাণ্ডের ডি. ভ্যালেরার নেতৃত্বে সিন ফেইন আন্দোলনের সাফল্যে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন তিনি। উল্লেখ করা যেতে পারে যে তাঁদের সাফল্য কবি রবীন্দ্রনাথকেও অত্যন্ত প্রভাবিত করেছিল। আইরিশ বিপ্লবের রূপকথার চরিত্র মাদাম গোণে ম্যাকব্রাইভের সঙ্গে বসু সাক্ষাৎ করেছিলেন। সাক্ষাৎ করেছিলেন ডি ভ্যালেরার সঙ্গে। ভ্যালেরার সহানুভূতি ছিল ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রতি। সুভাষ লীগ অব্ নেশন্সের প্রধান দফতর পরিদর্শন করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ভারতের ন্যায্য কারণের প্রতি সমর্থন আদায়ের জন্য ঐ আন্তর্জাতিক মঞ্চটিকে ব্যবহার করা। কিন্তু তিনি দেখে সম্পূর্ণ হতাশ হলেন যে লীগ বৃহৎ শক্তিগুলিরই নিয়ন্ত্রণাধীন।

বসুর ইউরোপে উপস্থিতি তাঁকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির আভ্যন্তরীণ স্রোতটিকে বুঝতে সাহায্য করেছিল। তিনি বুঝেছিলেন যে সৎ নীরস বক্তব্য এবং শূন্যগর্ভ ভাবপ্রবণতার কোন স্থান নেই আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে। একটি দেশের বিদেশ-নীতি এক বাস্তব ব্যাপার, এবং তা নির্ধারিত হয় দেশের নিজস্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্থায়ী বন্ধুত্ব বলে কিছু নেই।

সুভাষ সমাজবাদের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। আর্থিক পুনর্গঠনের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক প্রচলিত পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চিন্তা-ধারাটির প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল তাঁর। অর্থনৈতিক চিন্তাধারার প্রশ্নে তিনি অবশ্য জওহরলালের থেকে ভিন্ন মত পোষণ করতেন। জওহরলালের

মতে : "ফ্যাসিবাদ এবং কমিউনিস্ট মতবাদের মধ্যে কোন মধ্যপথ নেই। দুয়ের মধ্যে একটিকে বেছে নিতেই হবে।" জওহরলাল কমিউনিস্ট মতাদর্শ পছন্দ করতেন যদিও গোঁড়া কমিউনিস্টদের সমস্ত কাজের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি তিনি। তাঁর মতে কমিউনিস্ট মতবাদের মৌল আদর্শ এবং তার ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ নির্ভরযোগ্য।[২৭]

অপরদিকে বসুর ধারণা ছিল : "আমরা সম্পূর্ণভাবে ক্রমবিকাশের প্রক্রিয়ার শেষ প্রান্তে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের পছন্দ দুটি বিকল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখার কোন কারণ নেই।"[২৮] তাঁর বিশ্বাস ছিল যে বিশ্ব-ইতিহাসের আগামী পর্যায়ে কমিউনিস্ট মতবাদ এবং ফ্যাসিবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন ঘটবে। "আমরা বিস্মিত হব না যদি সমগ্র বিশ্বের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এক পরীক্ষা," তিনি অনুভব করেছিলেন, "ভারতে হয়—বিশেষত আমরা নিজ চোখেই যখন দেখেছি যে ভারতে সংগঠিত অপর এক পরীক্ষা (মহাত্মা গান্ধীর) সমগ্র বিশ্বে গভীর আগ্রহের সৃষ্টি করেছে।"[২৯]

সুভাষ লক্ষ্য করেছিলেন যে কমিউনিস্ট মতবাদের অনেক অর্থনৈতিক ভাবনা ভারতীয়দের গভীর ভাবে আকৃষ্ট করলেও অন্যান্য অনেক ধারণা বিপরীত প্রভাবের সৃষ্টি করবে। রাশিয়ার ইতিহাসে গীর্জা এবং রাষ্ট্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্য এবং সংগঠিত গীর্জার উপস্থিতির ফলে রাশিয়ার কমিউনিস্ট মতবাদ ধর্মবিরোধী এবং নিরীশ্বরবাদী হয়ে উঠেছে। বিপরীত দিকে ভারতে ভারতীয়দের মধ্যে তেমন সংগঠিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান না থাকায় এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোন সম্পর্ক স্থাপিত না হওয়ায়, বসুর ধারণায়, ভারতে তেমন কোন ধর্মবিরোধী অনুভূতি নেই। আরো বলতে গেলে, ভারতে, সুভাষের মতে, "অধিকাংশ ক্ষেত্রে জাতীয় জাগরণ ঘটেছে ধর্মীয় সংস্কার এবং সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের ফলে।"[৩০] ইতিহাসের বস্তুবাদী বিশ্লেষণ সম্পর্কে বসু মত প্রকাশ করেছিলেন যে এটি ভারতে বিনা বাধায় গৃহীত হবে না, এমনকি তাঁদের মধ্যেও, যাঁরা কমিউনিস্ট মতবাদের অর্থনৈতিক বিষয়বস্তু গ্রহণে আগ্রহী।[৩১]

সুভাষ উপসংহার টানেন : "সুতরাং যেমন নির্বিঘ্নে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়

যে ভারত সোভিয়েত রাশিয়ার এক নব সংস্করণ হবে না, তেমন একই ভাবে যে কেউ বলতে পারেন যে ইউরোপ আমেরিকার সমস্ত আধুনিক সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা ভারতবর্ষের অগ্রগতির উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করবে।"[৩২]

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যে তত্ত্বের স্থান নেই তা বিশ্বের কাছে নগ্নভাবে প্রকাশ পেল যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্যাসিবাদী ইতালি এবং নাৎসী জার্মানীকে ধ্বংস করার জন্য আমেরিকা, গ্রেট বৃটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন একত্রিত হ'ল। কমিউনিস্ট চীন এবং রাশিয়ার বর্তমান বিরোধ স্পষ্টতই প্রমাণ করে তত্ত্বগত সৌভ্রাতৃত্বও দেশসমূহকে একত্রে বেঁধে রাখতে পারে না।

জাতীয় প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক সমর্থন কামনার প্রশ্নে মাও-ৎসে-তুঙ বলেছিলেন : "সাম্রাজ্যবাদী দানবের জন্মের পর থেকেই বিশ্বের ঘটনাসমূহ এমন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে তাদের আলাদা করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। আমরা চীনদেশীয়রা শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের শেষ রক্ত-বিন্দু দিয়ে লড়াই করার মনোবল রাখি, ক্ষমতা রাখি আপন চেষ্টায় আমাদের হারানো জমি পুনরুদ্ধারের এবং জাতিসমূহের পরিবারে নিজের পায়ে দাঁড়াবার। কিন্তু তার এই অর্থ এই নয় যে, আমর‍্য আন্তর্জাতিক সাহায্য ছাড়াই চলতে পারি ; না, আধুনিক যুগে যে কোন জাতি কিংবা দেশের পক্ষে বৈপ্লবিক সংগ্রামের জন্য আন্তর্জাতিক সাহায্যের প্রয়োজন। জাপানের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধে সমগ্র বিশ্বের জনগণের সাহায্যের প্রয়োজন······" ('জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কৌশল সম্পর্কে' ১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর মাসে সেন্ট্রাল কমিটির পলিটবুরোর ওয়েওপাও বৈঠকের পর উত্তর সোমশির ওয়েওপাওতে অনুষ্ঠিত সক্রিয় পার্টি কর্মীদের সম্মেলনে কমরেড মাও-ৎসে-তুঙ কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্ট'—মাও-ৎসে-তুঙের নির্বাচিত সংকলন, কলকাতা, ১৯৬৭, পৃঃ ১৬৫)।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় "জাপানী সম্প্রসারণবাদীদের পরাজিত করার উদ্দেশ্যে মিত্রশক্তিগুলির সঙ্গে কার্যকর সমন্বয়সাধনের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্ত জাপবিরোধী শক্তিগুলিকে সংগঠিত এবং একত্রিত করে লড়াই চালাবার জন্য" মাও দৃপ্ত প্রচারকার্য চালিয়েছিলেন। (চীনা

কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম জাতীয় কংগ্রেসে কমরেড মাও কর্তৃক প্রদত্ত রাজনৈতিক বিবৃতি—মা-ৎসে-তুঙের নির্বাচিত সংকলন, পৃঃ ২৪০)।

কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ এবং কার্যকর করা সম্পর্কে ১৯৩৮ সালের অক্টোবর মাসে পার্টির ষষ্ঠ সেন্ট্রাল কমিটির ষষ্ঠ প্লেনারী সেসনে তাঁর বিবৃতিতে মাও মন্তব্য করেছিলেন, "মার্কসবাদী হিসেবে কমিউনিস্টরা আন্তর্জাতিকতাবাদী। কিন্তু মার্কসবাদকে আমরা তখনই কার্যে পরিণত করতে পারি যখন তা আমাদের দেশের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে একীভূত হয় এবং একটি নির্দিষ্ট জাতীয় আকৃতি গ্রহণ করে।"

আমরা আরো স্মরণ করতে পারি যে আয়ারল্যাণ্ডের ডি. ভ্যলেরা আমেরিকা থেকে এবং সান ইয়াৎ সেন জাপান থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। জারকে উৎখাত করার জন্য লেনিন জার্মানীর প্রতিক্রিয়াশীল সম্রাটের সাহার্য্য প্রার্থনা করতে দ্বিধা করেন নি।

জার্মানী কিংবা জাপান সম্পর্কে কোন মোহ ছিল না বসুর। অস্বীকার করা যায় না যে জার্মানবাসীদের জীবনের কিছু কিছু বিষয় তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল, কিন্তু তাঁদের কাজকর্মকে তিনি অন্ধভাবে সমর্থন জানাননি। নাৎসী কৌশল সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন : "জার্মানী হয়তো ফ্যাসীবাদি কিংবা সাম্রাজ্যবাদী, নির্মম অথবা নিষ্ঠুর, কিন্তু তার এই গুণগুলির প্রশংসা না করে পাপা যারা যায় না—কি করে সে পূর্বেই পরিকল্পনা তৈরি করে, সেই ভাবেই তৈরী হয়, একটি নির্ধারত সময় সূচী অনুসারে কাজ করে এবং বিদ্যুৎগতিতে আঘাত হানে। একটি মহৎ কারণের উন্নতিবিধানের জন্য কি এই গুণগুলিকে কাজে লাগানো যায় না?"[৩৩]

দূরপ্রাচ্যে জাপানের ভূমিকা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বসু বলেছিলেন : "..দূর প্রাচ্যে জাপান ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে শ্বেতকায় মানুষের সম্মান, আর সমস্ত পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে ঠেলে দিয়েছে আত্মরক্ষায় —কেবল সামরিক নয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলিতেও। একটি এশীয় শক্তি হিসেবে তার আত্মসম্মানের ব্যাপারে সে অত্যন্ত স্পর্শকাতর—এবং সঠিক ভাবেই সে তাই। সে দূর প্রাচ্য থেকে পশ্চিমী শক্তিগুলিকে বিতাড়িত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

"কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ ব্যতিরেকে, অপরের গৌরব, সংস্কৃতি এবং প্রাচীন জাতিকে নষ্ট না করে কি এগুলি অর্জন করা যায় না? না, যেখানে তার শ্রদ্ধা প্রাপ্য সেখানে জাপানকে সবটুকু শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেও আমাদের হৃদয় রয়েছে চীনের পক্ষে, তার এই সংকটময় মুহূর্তে। নিজের জন্য এবং মনুষ্য-জাতির জন্য চীন অবশ্যই তখনও বেঁচে থাকবে। অতীতে প্রায়ই যেমন সে করেছে তেমনই পুনরুজ্জীবিত প্রাণীর মতো লড়াইয়ের ভস্মরাশির মধ্য থেকে সে আবার জেগে উঠবে।"[৩৪]

মাওয়ের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থ-নৈতিক মুক্তির পূর্বগামী হবে এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা, বসু মন্তব্য করে-ছিলেন, "মূলত এক অর্থনৈতিক প্রয়োজন। আমাদের লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন যোগানোর সমস্যা—তাদের বস্ত্রদান এবং শিক্ষাদানের সমস্যা জাতির শরীর ও স্বাস্থ্যের উন্নতির সমস্যা—এইসব সমস্যার সমাধান কখনই সম্ভব হবে না যতোদিন দাসত্বের বন্ধনে বন্ধী থাকবে ভারত। ভারতের রাজনৈতিক মুক্তি লাভের পূর্বে অর্থনৈতিক উন্নতি এবং শিল্পে প্রগতির চিন্তা করাটা হবে স্বাভাবিক অবস্থাকে উল্টে দেবার সামিল।"[৩৫]

স্বাধীনতালাভের পর ভারতীয় জনগণের সামনে কাজ হবে সমাজবাদের ভিত্তিতে জাতীয় জীবনকে পুনর্গঠিত করা। যেমন বসু অনুভব করেছিলেন, "আমরা এইসব জাতীয় সমস্যা, বিশেষত অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব ব্যক্তিগত উদ্যোগের হাতে ছেড়ে দিতে পারি না······অর্থনৈতিক প্রশ্নের সমাধানের দায়িত্ব নেবে রাষ্ট্র। দেশের শিল্পায়নের প্রশ্নই হোক কিংবা হোক কৃষির আধুনিকীকরণের প্রশ্ন, আমরা চাই রাষ্ট্র এগিয়ে আসুক এবং দায়িত্ব গ্রহণ করে স্বল্পসময়ের মধ্যে সংস্কারের ব্যবস্থা করুক।"[৩৬] যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে সে সম্পর্কে বসু আরো বলেছিলেন, "দেশের ঘটনা এবং অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করে সোভিয়েত রাশিয়ায় জাতীয় (অথবা রাজনৈতিক) অর্থনীতির এক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। একই জিনিস ঘটবে ভারতে······স্বাভাবিক ভাবেই অন্যান্য দেশের গবেষণাসমূহ বিচার করে দেখব আমরা—কিন্তু সর্বোপরি আমাদের সমস্যার সমাধান আমাদেরই করতে হবে এক ভারতীয় পথে এবং ভারতীয় পরিস্থিতির

অধীনে। সুতরাং শেষ পর্যন্ত আমরা যে প্রণালী স্থাপন করব তা হবে ভারতীয় জনগণের উপযুক্ত এক ভারতীয় পদ্ধতি।"[৩৭]

রাজনৈতিক পদ্ধতি বা সরকার সম্পর্কে বসু মন্তব্য করেছিলেন: যদি আমাদের সমাজবাদী চরিত্রের এক আর্থিক কাঠামো গড়ে তুলতে হয় তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই রাজনৈতিক পদ্ধতি হবে এমন যা সবচেয়ে কার্যকর উপায়ে আর্থিক কর্মসূচীকে রূপায়িত করবে। যদি সমাজবাদের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক সংস্কারগুলিকে কার্যকর করে তুলতে হয়, তবে কেবল এক সাধারণ প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই চলবে না। সুতরাং আমাদের প্রয়োজন এক রাজনৈতিক প্রণালী, এক স্বৈরতান্ত্রিক চরিত্রের রাষ্ট্র।'[৩৮] রাষ্ট্র অবশ্য একটি অঙ্গ, কিংবা জনগণের সেবক হিসেবে কাজ করবে, অল্প কিছু ধনী ব্যক্তির পক্ষে নয়।

বসুর রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনাগুলি ছিল সমসাময়িক প্রচলিত ধারাগুলির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। আর যতদিন না বিশ্বের জাতিসমূহ সুপ্রতিবেশী হিসেবে বসবাস করতে শিখবে এবং শোষণ হবে অতীতের বিষয়বস্তু, ততোদিন পর্যন্ত কার্যকর হবে এইসব চিন্তাধারা।

ইওরোপে অবস্থানকালে ১৯৩৬ সালের এপ্রিলে জওহরলালের কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হবার সংবাদ পেলেন সুভাষ। তিনি অনুভব করলেন যে ভারতবর্ষে তাঁর উপস্থিতি পরিবর্তনকামীদের (র‍্যাডিকেল) হাত শক্তিশালী করবে। কিন্তু তিনি গৃহে ফেরার ইচ্ছা প্রকাশ করায় ভিয়েনায় ব্রিটিশ কনসালের কাছ থেকে সতর্কতামূলক বার্তা পেলেন—ভারতের মাটিতে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করা হবে তাঁকে। এই সতর্কতা-মূলক নির্দেশকে উপেক্ষা করেই বসু ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন, এবং ১৯৩৬ সালের ৮ই এপ্রিল বোম্বাইয়ে এসে পৌঁছলেন। তৎক্ষণাৎ গ্রেফতার করে বোম্বাইয়ের আরথার রোড জেলে বন্দী রাখা হ'ল।

বসুকে ভারতে ফেরার অনুমতিকালে ভারত সরকার অস্বীকৃত হওয়ার প্রতিবাদে পক্ষকাল পূর্বে কেন্দ্রীয় আইনসভায় একটি মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপিত হয় এবং তা গৃহীত হয় ৬২—৫৯ ভোটে। এই বিষয়ে সরকারকে সমর্থন করে হোম সেক্রেটারী হ্যালেট মন্তব্য করেছিলেন: "১৯২৪ সালে

বসু গ্রেফতার হবার পর দু'জন বিচারক অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তাঁর নথিপত্র পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। তাঁদের মতে বসু যে বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের একজন সদস্য ছিলেন তা বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি রয়েছে। তাঁকে মুক্তি দেওয়া হলে তিনি রাষ্ট্রের পক্ষে ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারেন, আরও বিশেষ করে জনসাধারণের মধ্যে তাঁর স্থান এবং অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতার জন্য······বসু ব্যক্তিগতভাবে সন্ত্রাসবাদী দলের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং তাদের সরকারী কর্মচারী হত্যার পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। কমিউনিস্ট মতবাদের বাণী প্রচার করেছিলেন তিনি এবং একটি সমান্তরাল সরকার গঠনের জন্য প্ররোচনা যুগিয়েছিলেন লাহোর কংগ্রেসে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, পাহাড়তলী দৌরাত্ম্য এবং অন্যান্য অপরাধের জন্য দায়ী যুগান্তর দলের প্রধান ছিলেন বসু।"[৩৯] বসুর প্রতি সরকারী আচরণকে সমর্থন করতে গিয়ে ভারত সরকারের হোম মেম্বার আরো বলেন: "১৯৩২ সালে বসু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাম্যবাদী সংঘ আন্দোলন পরবর্তিকালে নাম পরিবর্তন করে 'হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মিতে রূপান্তরিত হয়। ভিয়েনাতে আটক-করা বসুর স্বহস্তে লিখিত এক প্রচারপত্রে দুঃখ করা হয়েছিল যে ভারতীয় সৈন্য এবং পুলিশকে স্বমতে আনার কোন চেষ্টা করা হয়নি। আর লেখা হয়েছিল যে জাতীয় সংগ্রাম সাফল্য লাভ করতে পারে যদি রাজস্ব আদায় বন্ধ করা যায় এবং অন্যান্য মহল থেকে দুঃসময়ে আসা আর্থিক অথবা সামরিক ধাঁচের সাহায্য সরকারের কাছে গিয়ে না পৌঁছয়।"[৪০]

"এই মানুষটির", স্যার হেনরী শেষ করেন, "নিশ্চিতভাবে এক সন্ত্রাসবাদী যোগাযোগ ছিল এবং আমাদের সঠিক বিশ্বাস অনুসারে স্পষ্টতই ছিল এক হিংসাত্মক বিপ্লবের চিন্তা। ভারত সরকারের পক্ষে মারাত্মক বোকামি হবে যদি বসুর মতো বিচক্ষণ এবং সাংগঠনিক ক্ষমতাসম্পন্ন একজন মানুষকে এইসব চিন্তা কাজে পরিণত করার জন্য স্বাধীনতা দেওয়া হয়।"[৪১]

১৯৩৬ সালের ১৩ই এপ্রিল বসুকে বোম্বাই থেকে পুণার সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হ'ল। অযৌক্তিক ভাবে তাঁকে বন্দী করে রাখার প্রতিবাদ জানাতে সারা দেশে হরতাল পালিত হ'ল ১০ই মে।

জনমতের চাপে এবং দুর্বল স্বাস্থ্যের কারণে ২০শে মে বসুকে জেলহাজত থেকে মুক্তি দিয়ে কার্শিয়াং-এর কাছে গিড্ডা পাহাড়ে তাঁর ভাইয়ের বাড়িতে নজরবন্দী করে রাখা হ'ল।

কার্শিয়াং-এ অবস্থানকালে তাঁর উপর জারী-করা নিয়ন্ত্রণবিধি মেনে চলার ব্যাপারে কোন বাহ্যিক প্রতিশ্রুতিদানে প্রস্তুত ছিলেন না বসু।

বসুর ব্যাপারে ন্যায়বিচার লাভের জন্য মিস্টার জন, মিস্টার থারটেল, মিস্টার উইলিয়ম্‌স, মিস্টার ম্যাক্সটন, মিস উইল্‌কিন্‌সন, মিস্টার জাগের, মিস্টার গ্রেন্‌ফেল, মিস্টার সোরেনসেন এবং আর্ল অব কিনাউল প্রমুখ ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যগণ যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তার কথা উল্লেখ না করলে সম্ভবত অন্যায় করা হবে।

১৯৩২ সাল থেকে ১৯৩৭ সালের মধ্যে তাঁরা হাউস অব্ কমন্‌স এবং হাউস অব লর্ডস-এ প্রতিধ্বনিত করেছিলেন ভারতীয় জনগণের মনোভাব। বসুর স্বাস্থ্য, বিনাবিচারে আটক, পাসপোর্টের সুযোগ এবং বসুকে ইংল্যাণ্ড ভ্রমণ করতে দেওয়া এবং ভারতে প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে সরকারী অস্বীকৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিলেন তাঁরা।

বসুকে ইংল্যাণ্ডসফরের অনুমতিদানে অস্বীকৃত হওয়ার এবং তাঁর ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করার বিরুদ্ধে সেক্রেটারী অব্ স্টেট ফর ইণ্ডিয়াকে লেখা ১৯২৬ সালের ২৮শে মার্চ তারিখের চিঠিতে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেবর পার্টির সেক্রেটারী মিস্টার জি. উইলিয়ম্‌স জোরাল প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন সরকারের কাছে।

বসু ভারতে প্রত্যাবর্তন করলে তাঁকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে না বলে জারী-করা একতরফা সরকারী সতর্কীকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ২৮শে মার্চ এসেক্স হলে আয়োজিত এক জনসভায় পার্লামেন্টের সদস্য মিস্টার উইলিয়ম্ টি. কেল্পীর সভাপতিত্বে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সরকারের কাছে অনুরোধ জানানো হয় বসুকে ইংল্যাণ্ডভ্রমণের পাসপোর্টের সুযোগ দেবার জন্য।

বসুর প্রতি সরকারী মনোভাব তেমনই অনড় থাকে। স্যার হেনরী যেমন ১৯৩৬ সালের ৩১শে আগস্ট আইনসভায় উত্থাপিত এক প্রশ্নের উত্তরে

বলেন সর্বসাধারণের স্বার্থে যতোদিন প্রয়োজন বসুকে বন্দী করে রাখা হবে এবং সরকারী মতে সাধারণের স্বার্থে এখনও তাঁর মুক্তির ন্যায্য কারণ ঘটেনি।"

২৪শে নভেম্বর মিস্টার আর. এস. পীল বসুকে আটক করা সম্পর্কে যে নোট প্রস্তুত করেন তাতে এই ভীতি ব্যক্ত করা হয় যে, তিনি মুক্তাবস্থায় ভারতের যেখানেই থাকুন না কেন অল্প সময়ের মধ্যেই বৈপ্লবিক কার্যকলাপের কেন্দ্র হয়ে উঠবেন—যা পারিস্থিতিকে নিশ্চিতভাবে খারাপ করে তুলবে।

বিনা বিচারে অনবরত বসুকে আটক করা এবং তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে হাউস অব্ লর্ডস-এর আর্ল অব কিন্নাউলের উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তরে ১৯৩৬ সালের ১লা ডিসেম্বর সেক্রেটারী অব্ স্টেট ফর ইণ্ডিয়া দি মারকুইস্ অব্ জেট্ল্যাণ্ড জানান: "...মিস্টার বসু একজন অতি ক্ষমতাসম্পন্ন, সম্ভাব্য প্রতিভাশালী মানুষ, যিনি, হয় তাঁর নিজদোষে অথবা দুর্ভাগ্যের জন্য, তাঁর সমস্ত ক্ষমতাকে গঠনমূলক উদ্দেশ্যের পরিবর্তে ধ্বংসাত্মক কাজে নিয়োজিত করেছেন।" বিদেশী শাসন ধ্বংসের চেষ্টায় নিয়োজিত একজন দেশপ্রেমিকের পক্ষে এই ধরনের মন্তব্য সত্যিই প্রকৃত সম্মানের।

বসুকে রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণের অনুমতি না দেবার ফলে তাঁর নেহরুর সঙ্গে একত্রে কাজ করার স্বপ্ন অপূর্ণই থেকে গেল। পণ্ডিত নেহরুর সভাপতিত্বে বসু মন্তব্য করেছিলেন, "উপরমহল কর্মচাঞ্চল্য এবং উদ্‌যোগের দ্বারা লক্ষণীয় হয়ে উঠেছিল এবং কংগ্রেসের মধ্যে বিপ্লবী শক্তিগুলিকে প্রেরণা যুগিয়েছিল।"

কিন্তু তাঁর ধারণা জওহরলাল "আরো কিছু কাজ করতে পারতেন। ১৯৩৬-৩৭ সালের বছরগুলিতে তাঁর জনপ্রিয়তায় জোয়ার এসেছিল এবং এক বিশেষ অর্থে তাঁর স্থান ছিল মহাত্মা গান্ধীর থেকেও শক্তিশালী। কারণ তিনি সম্পূর্ণ বামপন্থী অংশের সমর্থন পেয়েছিলেন, যা গান্ধী পাননি। কিন্তু সাংগঠনিক দিক থেকে মহাত্মার স্থান ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী, কারণ নিজের মতো করে তিনি গান্ধীপন্থী একটি গোষ্ঠী তৈরী করে নিয়েছিলেন কংগ্রেসের মধ্যে এবং প্রথমটির সাহায্যে তিনি দ্বিতীয়টির উপর প্রভুত্ব করতে

পারতেন। অপর দিকে, নিজের প্রবল জনপ্রিয়তা থাকলেও নেহরুর নিজস্ব কোন গোষ্ঠী ছিল না। ইতিহাসে টিকে থাকার জন্য তাঁর কাছে দুটি পথ খোলা ছিল—হয় গান্ধীবাদের চিন্তাধারা গ্রহণ করা এবং কংগ্রেস-দলের মধ্যে গান্ধীপন্থীদের পক্ষাবলম্বন করা, অথবা গান্ধীপন্থার বিরোধিতায় নিজস্ব গোষ্ঠী গড়ে তোলা। প্রথমটি করা সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে, কারণ তিনি ব্যক্তিগতভাবে মহাত্মার অনুগত হলেও গান্ধীবাদের সব চিন্তাভাবনা মেনে নিতে পারেন নি। অপরদিকে নিজস্ব গোষ্ঠীও গঠন করতে পারেন নি তিনি। কারণ তা গান্ধীপন্থীদের অসন্তোষের কারণ হতো। আর নিজের জীবনে কখনও মহাত্মার বিরোধিতায় কিছু করার সাহস ছিল না তাঁর।[৪২] বসু দুঃখ করেছিলেন যে কংগ্রেসের মধ্যে নেহরু এক নিঃসঙ্গ ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছিলেন, কারণ মহাত্মার সম্মোহনী জাদুর হাত থেকে তিনি নিজেকে মুক্ত করতে পারেন নি।

কলকাতার এক হাসপাতালে অন্তরীণ অবস্থা থেকে মুক্তি পেলেন বসু। ১৯৩৭ সালের মার্চে চিকিৎসার জন্য কার্শিয়াং থেকে তাঁকে সরিয়ে আনা হয়েছিল সেখানে। তা করা হ'ল ভারতের নতুন সংবিধানের অধীনে পার্লামেণ্টের নির্বাচন সমাপ্ত হবার পর। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ১৯৩৫ সালে বর্মাকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে সংবিধানটিকে অনুমোদন করেন এবং প্রদেশগুলিতে ভারতীয় জনগণকে কিছু পরিমাণে স্বায়ত্তশাসনাধিকার দেওয়া হয়।

এটা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সেই নির্বাচনে কংগ্রেসদল ব্রিটিশ ভারতের এগারোটি প্রদেশের মধ্যে সাতটিতে কার্যকর সংখ্যাধিক্য পেয়ে বিজয়ী হয়। ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বরে বসু পুনরায় অস্ট্রিয়া যান এবং তাঁর ইংল্যাণ্ডে প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবার ফলে সেখান থেকে যান ইংল্যাণ্ডে। ১৯৩৮ সালের জানুয়ারী মাসে ইংল্যাণ্ডে অবস্থানকালে তিনি জানতে পারেন যে সর্বসম্মতিক্রমে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। ইংল্যাণ্ডে তাঁর কার্যকলাপের বিবরণ ব্যাপক ভাবে প্রচার করে ব্রিটিশ সংবাদপত্র। ইংল্যাণ্ড পরিভ্রমণের সময় তিনি লর্ড হ্যালিফক্স এবং লর্ড জেটল্যাণ্ডের মতো ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

সেই সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন লেবর এবং লিবারল পার্টির বিশিষ্ট সদস্যদের সঙ্গে,—যাঁরা তখন স্পষ্টতই ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন—যেমন মিস্টার এ্যাটলি, মিস্টার গ্রিনউড, মিস্টার বেভিন, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস, মিস্টার হ্যারল্ড লাস্কি, লর্ড এ্যালেন প্রমুখ।

তিনি লণ্ডনে অবস্থান করার সময় শ্রী রজনীপাম দত্ত তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন এবং ১৯৩৮ সালের ২৪শে জানুয়ারী লণ্ডনে 'ডেইলী ওয়ার্কার' পত্রিকায় একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। বসুর গ্রন্থ 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল'-এ প্রকাশিত ফ্যাসিবাদ ও কমিউনস্ট মতবাদ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে মন্তব্য করতে বলা হলে সুভাষ বলেন: "আমি সত্যিকার যা বোঝাতে চেয়েছিলাম তা হ'ল ভারতে আমরা আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা চাই এবং তা জয় করে আমরা চাই সমাজবাদের পথে যাত্রা করতে। কমিউনিস্ট মতবাদ এবং ফ্যাসিবাদের মধ্যে এক সমন্বয়ের কথা উল্লেখ করার সময় আমি এটাই বোঝাতে চেয়েছিলাম। সম্ভবত আমার ব্যবহৃত অভিব্যক্তিটি সুখকর হয় নি। কিন্তু আমি এটা লক্ষ্য করতে বলি যে আমি যখন গ্রন্থটি রচনা করছিলাম ফ্যাসিবাদ তখন তার সাম্রাজ্যবাদী অভিযান শুরু করে নি এবং এটিকে আমার এক চরম জাতীয়তাবাদ বলে মনে হয়েছিল মাত্র।

"আমি এটাও লক্ষ্য করতে বলি যে ভারতে যাঁরা কমিউনিস্ট মতবাদের পক্ষে আছেন বলে ধারণা, তাঁদের অনেকেরই প্রদর্শিত কমিউনিস্ট মতবাদ আমার কাছে জাতীয়তাবিরোধী বলে প্রতিভাত হয়েছে। এ ধারণা আরো শক্তিশালী হয়েছে তাঁদের অনেকেরই জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি প্রদর্শিত শত্রুতাপূর্ণ মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে। যাই হোক, এটা স্পষ্ট যে আজ পরিস্থিতির মূলগত পরিবর্তন ঘটেছে।

"আমি আরো বলতে চাই যে আমি এটা সর্বদাই বুঝতে পেরেছি এবং অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি যে কমিউনিস্ট মতবাদ, মার্কস ও লেনিনের রচনায় যেমন ভাবে তা প্রকাশিত হয়েছে, এবং কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের নীতি, সরকারী বিবৃতি যা প্রকাশ পেয়েছে, জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে এবং এটিকে তার বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির অঙ্গীভূত বলে স্বীকার করে।

"আজ আমার ব্যক্তিগত ধারণা এই যে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসকে ব্যাপকতম জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট হিসেবে সংগঠিত করা উচিত এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন ও সমাজবাদী শাসন প্রতিষ্ঠার মিলিত লক্ষ্য গ্রহণ করা উচিত।

১৯৩৮ সালের জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহ নাগাদ বসু ভারতে ফিরে আসেন। গুজরাটের হরিপুরায় কংগ্রেসের ৫১তম অধিবেশন শুরু হয় ১৯শে ফেব্রুয়ারী। বসু তাঁর প্রাঞ্জল ভাষণে বৈদেশিক এবং আভ্যন্তরীণ উভয় সমস্যার উল্লেখ করেন এবং স্পষ্টভাষায় তিনি বলেন: "রাজনীতিতে ব্রিটীশ সাম্রাজ্য এক বর্ণসংকর ব্যাপার। স্বশাসিত দেশ, কিছু পরিমাণে স্বায়ত্তশাসনাধিকার-প্রাপ্ত নির্ভরশীল রাষ্ট্র এবং স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের অধীনস্থ উপনিবেশের এক অদ্ভুত সমন্বয় এটি। সাংবিধানিক কৌশল এবং মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি এই সংযুক্তিকে কিছুদিন খাড়া করে রাখতে পারে। কিন্তু চিরদিনের জন্য নয়। এই আভ্যন্তরীণ খাপছাড়া ব্যাপারটিকে যদি সময়মতো দূর না করা যায়, তাহলে কোন রকম বাইরের চাপ ব্যতিরেকেই নিজস্ব চাপে সাম্রাজ্যটি নিশ্চিতভাবে ভেঙে পড়বে। কিন্তু এক সাহসী প্রচেষ্টায় কি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নিজেকে স্বাধীন দেশসমূহের এক ফেডারেশনে পরিণত করতে পারবে?······এই পরিবর্তন সম্ভব হবে যদি ব্রিটিশ জনসাধারণ আপন গৃহে মুক্তি পায়—কেবল মাত্র যদি গ্রেট ব্রিটেন এক সমাজবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। গ্রেট ব্রিটেনের পুঁজিবাদী শাসকশ্রেণী এবং বিদেশী উপনিবেশগুলির মধ্যে রয়েছে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। লেনিন যেমন বহুপূর্বেই দেখিয়েছিলেন 'অনেকগুলি জাতির দাসত্বের ফলেই গ্রেট ব্রিটেনে প্রতিক্রিয়াশীলতা শক্তিশালী এবং পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে'······সুতরাং এটা পরিষ্কার হওয়া উচিত যে উপনিবেশ-বাদের অবলুপ্তি ভিন্ন গ্রেটব্রিটেনে সমাজবাদী ব্যবস্থা কায়েম করা সম্ভব নয়। আর আমরা যারা ভারতের এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য ক্রীতদাসে পরিণত দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছি, তারা ঘটনাচক্রে ব্রিটিশ জনসাধারণের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্যও লড়াই চালাচ্ছি।"

ভারতের জনসাধারণের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বসু বলেন:

"এটি অতি পরিচিত এক স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার যে প্রতিটি সাম্রাজ্য বিভেদের শাসন-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আমার সন্দেহ এই নীতি গ্রেট-ব্রিটেনের মতো বিশ্বের আর কোন সাম্রাজ্য এতো দক্ষতা, সুসংবদ্ধতা আর নির্মমতার সঙ্গে ব্যবহার করতে পেরেছে কিনা······আমার কোন সন্দেহ নেই যে ব্রিটিশ দক্ষতা ভারতভাগের জন্য আরো অন্য সাংবিধানিক কৌশলের সন্ধান করবে এবং সেই ভাবেই ভারতীয় জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরকরণের ব্যাপারটিকে ব্যর্থ করে দেবে।" ভারতভাগ প্রমাণ করে যে কতো সঠিকভাবে বসু শাসকবৃন্দের মনোভাব অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।

বিভেদের শাসন-নীতির মধ্যে যে দুর্বলতা লুকিয়ে আছে তার উল্লেখ করে তিনি বলেন: "এই বিভেদ এবং শাসন-নীতিটির সুস্পষ্ট সুবিধা-গুলি থাকা সত্ত্বেও কখনই শাসক-শক্তির পক্ষে তা অবিমিশ্র আশীর্ব্বাদ নয়। সত্যি কথা বলতে কি এটি নতুন সমস্যা এবং নতুন বিপদের সৃষ্টি করে। অনুসৃত বিভেদ ও শাসন-নীতি সৃষ্ট নিজস্ব রাজনৈতিক দ্বৈতবাদের জালে গ্রেট ব্রিটেন বন্দী হয়েছে বলে মনে হয়।"

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যেসব সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে সে সম্পর্কে বসু আরো বলেন: "এই মুহূর্তে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য অনেকগুলি ক্ষেত্রে চাপের ফলে কষ্ট ভোগ করছে। সাম্রাজ্যের ভিতরে পশ্চিম প্রান্তে রয়েছে আয়ারল্যাণ্ড এবং পূর্বপ্রান্তে ভারত। মধ্যে রয়েছে সংলগ্ন দেশ মিশর এবং ইরাক সহ প্যালেস্টাইন। সাম্রাজ্যের বাইরে চাপ আসছে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ইতালি এবং দূরপ্রাচ্যে জাপানের কাছ থেকে। এই দুটি দেশই জঙ্গী, আগ্রাসনকামী এবং সাম্রাজ্যবাদী। এই বিশৃঙ্খলার পটভূমিকায় রয়েছে সোভিয়েত রাশিয়া, যার উপস্থিতিমাত্রই প্রতিটি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের শাসক-শ্রেণীর মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। এই চাপ এবং পীড়নের পুঞ্জীভূত প্রভাব কতোদিন সহ্য করতে পারবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য?"

সংখ্যালঘু সমস্যা সম্পর্কে তিনি ঘোষণা করেন যে, বাঁচা এবং বাঁচতে দেবার নীতিই হবে আমাদের লক্ষ্য। তিনি সঠিকভাবেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে স্বাধীনতা অর্জিত হবার পরেও অবলুপ্ত হবে না কংগ্রেস

পার্টি। বরং দল ক্ষমতা নেবে, শাসনব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং কার্যকর করে তুলবে পুনর্গঠনের কর্মসূচী। তাঁর মনে কোন সন্দেহ ছিলনা দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা আর রোগদূরীকরণ এবং বৈজ্ঞানিক উৎপাদন ও বণ্টন সম্পর্কিত আমাদের প্রধান সমস্যাগুলির সার্থকভাবে মুখোমুখি হওয়া সম্ভব হবে কেবলমাত্র সমাজবাদের পথেই। এই উদ্দেশ্যে তিনি চেয়েছিলেন যে আমাদের জাতীয় সরকার একটি কমিশন গঠন করবেন, যার কাজ হবে পুনর্গঠনের একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। বাস্তবে কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে তিনি জওহরলালকে চেয়ারম্যান করে একটি জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করেন।

ভারতবর্ষের সংহতি সম্পর্কে বলতে গেলে, তাঁর কামনা ছিল একটি শক্তিশালী কেন্দ্র এবং সেই সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও শাসন তান্ত্রিক ব্যাপারে যথেষ্ট স্বশাসনের অধিকারসহ প্রদেশসমূহ। আমাদের ভাষা সম্পর্কে তাঁর পরামর্শ ছিল রোমান হরফে লেখা হিন্দি ও উর্দু'র সংমিশ্রণ।

দারিদ্র্য, বুভুক্ষা এবং রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রতিরোধ করতে চেয়েছিলেন বসু।

বিদেশ-নীতি সম্পর্কে সুভাষ বলেন : "আমি এ কাজের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব দিই, কারণ আমার বিশ্বাস যে আসন্ন বছরগুলিতে আন্তর্জাতিক ঘটনা-প্রবাহ ভারতে আমাদের সংগ্রামকে সাহায্য করবে। কিন্তু প্রতিটি স্তরে আমাদের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন করার প্রয়োজন এবং জানা দরকার কিভাবে এর সুযোগ গ্রহণ করতে হয়।

"আমাদের বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে আমি শুরুতেই যে পরামর্শ দিতে চাই—তা হ'ল আমরা কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং তার শাসন নীতির দ্বারা প্রভাবিত হতে চাই না······এ ব্যাপারে আমরা সোভিয়েত কূটনীতির উদাহরণের সাহায্যে লাভবান হতে পারি। যদিও সোভিয়েত রাশিয়া একটি কমিউনিস্ট রাষ্ট্র, তবু অসমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে মৈত্রীস্থাপনে ইতস্তত করেন নি তার কূটনীতিবিদ্গণ। যে কোন মহল থেকে আসা সহানুভূতি কিংবা সাহায্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন নি তাঁরা।"

বসু পরামর্শ দিয়েছিলেন যে আমাদের উচিত বিদেশী সংবাদ সরবরাহ

প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এবং ভারতে নির্মিত চলচ্চিত্র ও শিল্প প্রদর্শনের সাহায্যে ভারত এবং তার সংস্কৃতিকে বিশ্বের গোচরে আনা। তাঁর একথা বলার কারণ এই যে, তিনি জানতেন যে "এই প্রচেষ্টা ইওরোপ এবং আমেরিকার প্রতিটি দেশে সাদর অভ্যর্থনা লাভ করবে। আমরা যদি এ কাজে অগ্রসর হই তবে তা হবে বিভিন্ন দেশে আমাদের ভবিষ্যৎ দূতাবাস ও প্রতিনিধিত্বের ভিত্তি-প্রস্তুতির কাজ। গ্রেট ব্রিটেনকেও উপেক্ষা করব না আমরা। ক্ষুদ্র হলেও এমনকি সেই দেশেও আমাদের জন্য রয়েছে পুরুষ এবং মহিলাদের একটি প্রভাবশালী দল যাঁরা সত্যসত্যই ভারতীয় আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানু-ভূতিশীল। উঠতি প্রজন্ম এবং ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ করে ভারত সম্পর্কে আগ্রহ ও ভারতের প্রতি সহানুভূতি ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। গ্রেট-ব্রিটেনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করলেই যে কেউ তা উপলব্ধি করতে পারবেন।"

বসু কখনও ইংরেজ জনসাধারণকে আমাদের শত্রু রূপে দেখেন নি। তিনি চেয়েছিলেন ইংল্যাণ্ড নিজেকে পরস্পর বিরোধী এবং বেমানান বিষয়-গুলি থেকে মুক্ত করে সাম্রাজ্যকে স্বাধীন জাতিসমূহের এক ফেডারেশনে পরিণত করুক। "যদি সে তা করতে পারে," বসু অনুভব করেছিলেন, "তবে ইতিহাসে সে এক বিস্ময় সৃষ্টি করবে।" তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন: "ব্রিটিশ জনগণের প্রতি আমাদের কোন শত্রুতা নেই। আমরা লড়াই করছি গ্রেট ব্রিটেনের শাসক শ্রেণীর সঙ্গে এবং আমরা চাই তার সঙ্গে ভবিষ্যৎ সম্পর্ক নিরূপণের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা। কিন্তু একবার আমরা প্রকৃত আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার লাভ করলে ব্রিটিশ জনসাধারণের সঙ্গে অত্যন্ত আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন না করার কোন কারণ থাকবে না।"

"আমাদের এই সংগ্রাম", বসু শেষ করেন, "কেবল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নয়, বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও, প্রথমটি যার মধ্যমণি। সুতরাং আমরা কেবল ভারতের জন্যই লড়াই চালাচ্ছি না, লড়াই করছি মানবতার জন্যও। ভারতের স্বাধীনতালাভের অর্থ মানবিকতা রক্ষা পাওয়া।"

হরিপুরা ভাষণের প্রশংসা করে অধ্যাপক হীরেন মুখোপাধ্যায় বলেন, "সব দিক বিচার করলে, এই হরিপুরা ভাষণ নিশ্চিতভাবে সুভাষচন্দ্র বসুর

ভারতে কর্মজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ মুহূর্তকে চিহ্নিত করে—একটা শিখর, যা অবশ্য তিনি পেরিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর শেষ বিস্ময়কর মহাযাত্রায়, যেখান থেকে তিনি আর কখনও ফিরে আসেন নি।"[৪৩]

কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে তাঁর আচরণ এবং কাজে বসু ছিলেন সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক। তৎকালীন ওয়ার্কিং কমিটির একজন সদস্য এবং কংগ্রেসের সরকারী ঐতিহাসিক শ্রীপট্টাভি সিতারামাইয়া লেখেন যে বসু তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারা "সাড়ম্বরে জাহির করতে চাইতেন না" এবং "তাঁর মধ্যে একক-ভাবে পক্ষাবলম্বনের ইচ্ছা ছিল না বলে মনে হয়।"

১৯৩৮ সালের অক্টোবর মাসে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করা ছাড়াও ১৯৩৮-এর জুলাইয়ে চীনে একটি মেডিকেল মিশন পাঠানোর ব্যাপারে তিনি উদ্‌যোগ গ্রহণ করেন। জাপানী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত চীনা জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা জানাতে 'চায়না ডে' পালিত হয় তাঁর অনুরোধে। ১৯৩৮ সালের অক্টোবর মাসে কংগ্রেস সোসালিস্টে তাঁর রচনায় তিনি মিউনিখ-চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য এবং ইউরোপীয় রাজনীতি থেকে সোভিয়েত রাশিয়াকে উৎখাত করার পরিকল্পনায় ফ্যাসিবাদী রাজনীতি-বিদ্‌দের স্বেচ্ছায় সমর্থন দানের" জন্য ফ্রান্স ও ব্রিটেনের নিন্দা করেন।

এটা অনেকেরই বিশ্বাস যে বসুকে মহাত্মা কংগ্রেস সভাপতি মনোনীত করেছিলেন তাঁকে শান্ত করতে এবং বামপন্থীদের দুর্বল করার জন্য। কিন্তু কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ব্রিটেনের সঙ্গে সমঝোতা স্থাপনের যে-কোন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে, গান্ধীকে বিস্মিত করে, নিজস্ব জমি শক্ত করে ধরে রেখে-ছিলেন সুভাষ। কারণ বসুর ধারণা ছিল যে আন্তর্জাতিক সংকট আমাদের উদ্দেশ্যকে সাহায্য করবে। শিল্পায়নের এক ব্যাপক পরিকল্পনা তৈরির জন্য জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন এবং ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, মিউনিখ-চুক্তির পর, জাতীয় সংগ্রামের জন্য ভারতীয় জনগণকে প্রস্তুত হতে বসুর খোলাখুলি প্রচার মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁর অনুগামীদের ক্ষুব্ধ করে তোলে। আইন অমান্য আন্দোলনের তিক্ত স্মৃতি, মন্ত্রিপদ ধরে রাখার আনন্দ, আইন-সভাসংক্রান্ত কাজকর্মের রোমাঞ্চকর স্বাদ কোন রকম জাতীয় আন্দোলন শুরু করার প্রতি বীতস্পৃহ করে তুলেছিল তাঁদের।

সুভাষ অনুভব করেছিলেন যে সভাপতি পদে সামান্য একটি বছর সর্বাধিক কাজের পরিকল্পনা কার্যকর করার পক্ষে নিতান্তই অপ্রতুল। তাই তিনি উক্ত পদে পুনর্নির্বাচন প্রার্থনা করলেন। মোহমুক্ত গান্ধীজী এবং তাঁর অনুগামীগণ সিদ্ধান্ত নিলেন যে তাঁরা সর্বোপায়ে বসুর উক্ত পদে পুনর্নির্বাচনের বিরোধিতা করবেন। ঘটনাটি অভূতপূর্ব নয়, তাই চাপের কাছে নতি স্বীকার করতে অস্বীকার করলেন সুভাষ। গান্ধীপন্থীদের পক্ষ থেকে কোন আন্দোলন শুরু না করার এবং ফেডারেশনের প্রশ্নে সমঝোতা স্থাপনের এক প্রচেষ্টার কথা তিনি পূর্বাহ্ণেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।

লক্ষ করার মতো আকর্ষণীয় ব্যাপার হ'ল যে কবি রবীন্দ্রনাথ সুভাষকে দ্বিতীয়বার সভাপতি পদে নির্বাচনের জন্য অনুমতি দিতে মহাত্মাকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু মহাত্মা তা অস্বীকার করলেন। ডাক্তার পট্টভি সিতারামাইয়াকে সুভাষের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছিলেন গান্ধীজী এবং তার অনুগামীরা। তাঁকে পরাজিত করে নির্বাচনে বিজয়ী হলেন বসু। ১৯৩৯ সালের ৩১শে জানুয়ারী বরদৌলি থেকে এক বিবৃতি মারফত গান্ধীজী প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন: "মৌলানাসাহেব যখন নাম প্রত্যাহার করেন তখন নাম প্রত্যাহার না-করার জন্য ডাক্তার পট্টভিকে রাজী করানোর কাজে যেহেতু আমি সহযোগী ছিলাম, তাই এই পরাজয় তাঁর তুলনায় আমারই বেশী……। এটা আমার কাছে পরিষ্কার যে প্রতিনিধিরা আমার গৃহীত আদর্শ এবং নীতিকে অনুমোদন করেন নি। এই পরাজয়ে আমি আনন্দিত।" বসুর বিজয় সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি আরো বলেন, "সুভাষবাবু যাঁদের দক্ষিণপন্থী বলেন তাঁদের অনুমোদনে সভাপতি হবার পরিবর্তে এখন প্রতিদ্বন্দ্বিতাময় নির্বাচনে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। এটা তাঁকে সমপ্রকৃতির ক্যাবিনেট গঠনে এবং নিজ কর্মসূচী কার্যকরী করতে সাহায্য করবে……

"যাই হোক, সুভাষবাবু তাঁর দেশের শত্রু নন। তিনি দেশের জন্য কষ্ট স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে তাঁর নীতি এবং কর্মসূচী সর্বাপেক্ষা প্রগতিমূলক ও সাহসী। সংখ্যালঘুরা কেবল তাঁর সর্বময় সাফল্য কামনা

করতে পারেন। যদি তাঁরা এর সঙ্গে মানিয়ে চলতে না পারেন তবে তাঁরা অবশ্যই বেরিয়ে আসবেন কংগ্রেস থেকে। আর যদি তাঁরা তা পারেন তবে সংখ্যাগুরুদের শক্তিবৃদ্ধি করবেন তাঁরা। কোন অবস্থাতেই সংখ্যালঘুরা বাধা সৃষ্টি করবেন না। সহযোগিতা করতে না পারলে তাঁরা অবশ্যই বিরত থাকবেন। আমি সমস্ত কংগ্রেসীদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে কংগ্রেসী মনোভাবাপন্ন হয়েও যাঁরা স্বেচ্ছায় এর বাইরে আছেন তাঁরা এর প্রতিনিধিত্ব করেন সবচেয়ে বেশী। সুতরাং, যাঁরা কংগ্রেসের ভেতরে থাকতে অস্বস্তি বোধ করবেন তাঁরা বাইরে আসতে পারেন। কোন বিদ্বেষের মনোভাব সঙ্গে নিয়ে নয়, বরং কার্যকর ভাবে সেবা করার স্বেচ্ছা-অভিপ্রায় নিয়ে।"[৪৪]

এটি ছিল বসুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রকাশ্য আহ্বান, যা কেবল ঐক্যের প্রয়োজনকেই দুর্বল করতে সাহায্য করেছিল। আর সেটা এমন এক সময়, যখন আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিবেশে প্রতিকূল পরিস্থিতির ফলে ব্যতিব্যস্ত ব্রিটেনের উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রয়োজন ছিল। বসুর প্রতি গান্ধীজীর মনোভাব বিদেশী শাসকদের সুযোগ করে দিল।

মহাত্মা এটিকে ব্যক্তিগত পরাজয় বলে গ্রহণ করায় দুঃখ পেলেন বসু। তিনি একান্তভাবে আশা করেছিলেন যে "এখন কিংবা অদূর ভবিষ্যতে তথাকথিত সংখ্যালঘুদলের সংখ্যাধিক্যের সঙ্গে অসহযোগিতা করার মতো" কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে না। গান্ধীজীকে আশ্বস্ত করে তিনি বললেন: "আমার পক্ষে বলা অপ্রয়োজনীয় যে একটা ভাঙন, যখনই তেমন কিছু আমাদের সামনে উপস্থিত হবে, এড়াবার জন্য আমি শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করব ......পার্লামেন্ট অথবা পার্লামেন্ট-অতিরিক্ত কোন ক্ষেত্রে অতীতের সঙ্গে কোন বিরাট বিচ্ছিন্নতা ঘটবে না। আইনসভা সংক্রান্ত কর্মসূচী সম্পর্কে বলতে গেলে, আমরা চেষ্টা করব আমাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি এবং আইন-সভাসংক্রান্ত কর্মসূচীকে অতীতের তুলনায় দ্রুতগতিতে কার্যকর করে তুলতে। পার্লামেন্ট-অতিরিক্ত ক্ষেত্রে আমাদের চেষ্টা হবে ফেডারেশনের বিরুদ্ধে লড়াই এবং পূর্ণ স্বরাজের পথে অগ্রসর হবার জন্য আমাদের সব শক্তি এবং সঙ্গতিকে একত্রিত করা। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শ

এবং নীতি অনুযায়ী অবশ্যই আমরা কাজ করব।” মহাত্মার সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্যের কথা উল্লেখ করে সুভাষ বলেছিলেন :”……জনগণের প্রশ্নে কোন কোন ক্ষেত্রে আমি মহাত্মার সঙ্গে ভিন্ন মতপোষণে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি আমার সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আমি অন্য কিছু মানতে রাজী নই। আমি যদি তাঁকে সঠিকভাবে বুঝে থাকি, তবে বলতে পারি যে তিনিও দেখতে চান যে জনগণ নিজেদের মতো করে চিন্তা করুক, এমন কি তারা সব সময় তাঁর সঙ্গে একমত না হলেও। আমি জানি না আমার সম্পর্কে মহাত্মাজী কি জাতীয় ধারণা পোষণ করেন। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি যাই হোক না কেন, সর্বদাই আমার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হবে তাঁর আস্থা অর্জন করা…অন্যান্য মানুষের আস্থা অর্জন করেও আমি যদি ভারতের শ্রেষ্ঠ মানুষটির আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হই, তবে তা হবে আমার পক্ষে অত্যন্ত বেদনাদায়ক ব্যাপার।” এই বিবৃতিটি গান্ধী-বাদীদের অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত। কারণ ১৯৩৮ সালে সমস্তটা সময় বসু ওয়ার্কিং কমিটিতে তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে অত্যন্ত সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলেছিলেন।

তিনি নিজেকে অনেক পিছনে সরিয়ে রেখেছিলেন, এমন কি চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর অনেক পরেও। রাজনৈতিক কর্মসূচী পরিচালনা করার ভার দিয়েছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠদের উপর। সহকর্মীদের প্রতি বসুর সর্বদা মার্জিত ব্যবহার এবং আত্মবিলোপী চরিত্র এবং তাঁর দেশসেবায় আন্তরিকতা সম্পর্কে অন্তত মহাত্মাজীর কোন সন্দেহ থাকা উচিত ছিল না।

গান্ধীজীর বিবৃতির উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বসুর জীবনীকার যোগ লেখেন: “পরাজয়টি যে প্রকৃতই তাঁর, এই স্বীকৃতিদান গান্ধীর পক্ষে খেলোয়াড়ীসুলভ মনোভাবের পরিচায়ক, কিন্তু একথা উল্লেখ না করে পারা যায় না যে, তাঁর অনুগামীদের তিনি যে উপদেশ দেন তা না ছিল খেলোয়াড়-সুলভ, না গণতান্ত্রিক……স্পষ্টতই তিনি বসুকে তাঁর বিজয়ের ফল থেকে বঞ্চিত করতে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন এবং চেষ্টা করেছিলেন সবকিছু তাঁর বিরুদ্ধে ঘুরিয়ে দিতে।”[১৫]

পরবর্তী ঘটনাগুলি থেকে প্রমাণিত হয় যে বসুর বিবৃতিতে গান্ধীজী

সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। ত্রিপুরী অধিবেশনের বিষয়সূচী আলোচনার জন্য ১৯৩৯ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী ওয়ার্ধায় ওয়ার্কিং কমিটির এক সভা ডাকার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। নিজে অসুস্থ হয়ে পড়ায় বসু তা মুলতুবি রাখার অনুরোধ জানিয়ে তারবার্তা পাঠান। কিন্তু ঘটনাটিকে তাঁর সহকর্মীগণ সভাপতির গান্ধীজীর প্রতি আস্থার অভাবের পরিচায়ক বলে ব্যাখ্যা করেন এবং এটিকে ব্যবহার করেন বসুর সঙ্গে সহযোগিতা না করার সুযোগ হিসেবে। গান্ধীজীর জ্ঞাতসারে এবং মত অনুযায়ী তাঁদের বারো জন তৎক্ষণাৎ কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন। জওহরলাল পদত্যাগ করলেন না, কিন্তু মহাত্মার অনুগামীদের পক্ষ অবলম্বন করলেন।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই গান্ধীজী রাজকোট রওনা হয়ে গেলেন এবং ত্রিপুরী কংগ্রেসের আগে কিংবা সেই সময় কোন প্রকার সমঝোতার সুযোগ বন্ধ করে দিলেন এইভাবে। গান্ধীজীর সমালোচকদের ধারণা যে তাঁর রাজকোট যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল জাতিকে বোঝান যে তিনি সুভাষের সঙ্গে নন। এইভাবে তাঁর এবং তাঁর অনুগামীদের দ্বারা সৃষ্ট অচলাবস্থা থেকে বের হয়ে আসার জন্য বসুর প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিলেন তিনি।

ত্রিপুরীতে সভাপতির ভাষণে ১৯৩৯ সালের ১০ই মার্চ বসু মন্তব্য করেন: "......স্বরাজের প্রশ্ন তুলে ধরার সময় এসেছে আমাদের এবং ব্রিটিশ সরকারের কাছে চরমপত্র হিসেবে জাতীয় দাবি উপস্থিত করার...... সন্দেহ নেই যে ইওরোপে একবার স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে গ্রেট ব্রিটেন এক কঠোর সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করবে। তা সে চতুঃশক্তির চুক্তির মাধ্যমেই হোক কিংবা অন্য কোন উপায়ে। এখন প্যালেস্টাইনে ইহুদিগের বিরুদ্ধে আরব জনসাধারণের মন পাবার চেষ্টার লক্ষণ দেখাচ্ছে সে। কারণ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিরাপত্তার অভাব ঘটেছে তার। সুতরাং আমার মতে এখন আমাদের উচিত চরমপত্রের আকারে ব্রিটিশ সরকারকে আমাদের জাতীয় দাবি জানানো এবং একটি সময়সীমা বেঁধে দেওয়া; যদি এই সময়ের মধ্যে কোন উত্তর না মেলে, অথবা উত্তরটি মনের মতো না হয় তবে আমরা আমাদের জাতীয় দাবিকে কার্যে পরিণত করার জন্য আমাদের অধিকারভুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করব।" একজন কঠোর বাস্তববাদীর ন্যায়

তিনি মন্তব্য করেন : "……বর্তমান পরিস্থিতির সমস্ত ঘটনা এতো বেশী আমাদের পক্ষে যে আমরা সর্বাধিক পরিমাণে আশাবাদী হয়ে উঠতে পারি। যদি কেবল আমাদের বিরোধগুলি দূর করি, সংহত করি আমাদের সঙ্গতি এবং জাতীয় সংগ্রামে সর্বশক্তি ব্যয় করি, তা হলে বর্তমান অনুকূল পরিবেশের সর্বাধিক সুযোগ গ্রহণ করতে পারি আমরা। নতুবা আমরা এ সুযোগ হারাব, যে সুযোগ একটি জাতির জীবনে এক বিরল ঘটনা।"

কিন্তু গান্ধীপন্থীগণ এবং নেহরু বসুর প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন এবং তা বাতিল করা হ'ল। বসুর পক্ষে এটা হল প্রথম বাধা। সবচেয়ে নির্দয় আঘাত হানলেন পণ্ডিত পন্থ। তিনি একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে গান্ধীজী ও পুরানো ওয়ার্কিং কমিটির প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করলেন। নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন প্রসঙ্গে প্রস্তাবটি নিম্নলিখিত নির্দেশ গ্রহণ করল : "… …আগামী বছরগুলিতে যে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হবে তার পরিপ্রেক্ষিতে এবং সংকটের সময় মহাত্মা গান্ধী একাই কেবল কংগ্রেস ও দেশকে জয়ের পথে নেতৃত্বদানে সক্ষম হবেন। তাই কংগ্রেস এটা একান্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করে যে কংগ্রেস কার্যনির্বাহী সমিতির উচিত তাঁর সুস্পষ্ট আস্থা অর্জন করা এবং সভাপতির প্রতি অনুরোধ জানায় যে মহাত্মা গান্ধীর ইচ্ছা অনুসারে যেন ওয়ার্কিং কমিটি মনোনীত করা হয়।"

প্রস্তাবটি অনুমোদিত হ'ল এবং সেই সঙ্গে শেষ হয়ে গেল সংগ্রামের জন্য কংগ্রেসকে উজ্জীবিত করার বসুর পরিকল্পনা।

মহাত্মা গান্ধী এবং বসুর আলোচনার মধ্য থেকে এটাই স্পষ্ট হ'ল যে একদিকে গান্ধী-অনুগামীরা যেমন বসুর নেতৃত্ব মেনে নেবেন না, তেমনি অপরদিকে একজন পুতুল সভাপতি হয়ে থাকতে কখনই রাজী হবেন না সুভাষ। ফলে ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে বসু পদত্যাগ করলেন। সমস্ত বামপন্থীদের এক পতাকাতলে সমবেত করার উদ্দেশ্য নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে একটি বিপ্লবী ও প্রগতিশীল দল গঠন করার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। এই দলের নামকরণ করা হ'ল ফরওয়ার্ড ব্লক।

গান্ধীজী এবং তাঁর অনুগামীদের ভূমিকা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় বলেন : "এটা ছিল এক বিরল ঘটনা যখন আপন

মর্যাদার এমন শান্ত আর সংযত মহান্ মানুষটিকে মনে হল ক্ষুদ্র এবং স্বেচ্ছাচারী। সন্দেহ নেই যে ত্রিপুরী কংগ্রেসে, যেখানে অত্যন্ত জ্বর থাকা সত্ত্বেও বসু সভাপতিত্ব করেছিলেন, ঘটনাগুলি ঘটেছিল অহিংসার একনিষ্ঠ সেবক মানুষটির নির্দেশেই। মঙ্গল হবে প্রসঙ্গটির পরিসমাপ্তি ঘটানো।"[৪৬]

মহাত্মার ভূমিকা সম্পর্কে ব্রিটিশ গ্রন্থকার মাইকেল এডওয়ার্ডেস মন্তব্য করেন: "গান্ধী তাঁর অসহযোগের কৌশল ঘুরিয়ে দিয়েছেন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে নয়, কংগ্রেসের সভাপতির বিরুদ্ধে। বসু বাধ্য হয়েছিলেন পদত্যাগ করতে......

"গান্ধী, যাঁকে ভারতে এবং বিদেশে এতো মানুষ কেবল নম্রতা আর জ্ঞানালোকের সমন্বয় বলে জানে, তিনি তাঁর আচ্ছন্ন-করা সম্মান এবং প্রায় ষড়যন্ত্রের সাহায্যে তাঁর নেতৃত্বের একমাত্র প্রকৃত বিরোধীকে হটিয়ে দিতে সক্ষম হলেন, যা কেউ আশা করতে পারে তাম্মানি হলের কাছ থেকে।"[৪৭]

ত্রিপুরীতে সুভাষের মহান্ ভূমিকায় অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর পদত্যাগের পর নিম্নলিখিত বার্তা পাঠিয়েছিলেন সুভাষের কাছে: "অত্যন্ত উত্তেজনাময় পরিবেশের মধ্যে তুমি যে মর্যাদা এবং ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছ, তা তোমার নেতৃত্বের প্রতি আমার শ্রদ্ধা এবং আস্থা অর্জন করেছে।"

বসুর পূর্বধারণা মতো ইওরোপে যুদ্ধ শুরু হ'ল ১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর এবং তিনি তাকে অভ্যর্থনা জানালেন কারণ এই যুদ্ধ ভারতের সামনে স্বর্ণ সুযোগএনে দিল বলে। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে ইওরোপে ব্রিটেনের উপর একটি আঘাত ভারতের উপর তার মুষ্টিকে নিশ্চিতভাবে দুর্বল করবে। স্বরাজ অর্জনের জন্য তৎক্ষণাৎ আন্দোলন শুরু করতে কংগ্রেসী নেতাদের বোঝাবার চেষ্টা করলেন বসু। কিন্তু এ ছিল তাঁর ব্যর্থ চেষ্টা। গান্ধীজী এবং তাঁর অনুগামীরা কোন আন্দোলন শুরু করতে এতোটুকু আগ্রহী ছিলেন না। নিকট ভবিষ্যতে ব্রিটেনের সঙ্গে কোন লড়াইকে সম্ভাবনার অতীত বলে মনে করতেন মহাত্মা। ভাইসরয় লিনলিথগোর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর ৬ই সেপ্টেম্বর মহাত্মা গান্ধী এক প্রেসবিজ্ঞপ্তি জারি করলেন—ভারত এবং

ব্রিটেনের মধ্যে বিরোধ থাকা সত্ত্বেও ব্রিটেনের দুর্দশার সময় ভারত সহযোগিতা করবে তার সঙ্গে। এটি ছিল কংগ্রেসের গৃহীত নীতি লঙ্ঘনের সুস্পষ্ট উদাহরণ।

১৯৪০ সালের ২০শে মে পণ্ডিত নেহরু এক বিস্ময়কর বিবৃতি মারফত জানালেন: "ব্রিটেন যখন জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত সে সময় কোন আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু করা হবে ভারতের পক্ষে এক অসম্মানজনক কাজ।"[৪৮] একই ভাবে মহাত্মাজী বলেছিলেন: "ব্রিটেনের ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে আমরা আমাদের স্বাধীনতা চাই না। এটা অহিংসার পথ নয়।"[৪৯]

সেই সংকটময় মুহূর্তে বসু, গান্ধী এবং নেহরুর ভূমিকা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে মাইকেল এডওয়ার্ডস্ আরো বলেছিলেন: লড়াইয়ের সম্ভাবনাকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন বসু স্বয়ং। কারণ ইওরোপে ব্রিটেনের উপর একটি আঘাত ভারতের উপর ব্রিটিশ মুষ্টিকে নিশ্চিতভাবে দুর্বল করবে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এমন সুস্পষ্ট দৃষ্টি ছিল না অপর কংগ্রেসী নেতাদের। আপাতদৃষ্টিতে ব্রিটেনের অসুবিধার কোন সুযোগ গ্রহণ করার ইচ্ছা ছিল না গান্ধী এবং নেহেরুর। গান্ধীর সহানুভূতি ছিল --'এক খাঁটি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, তিনি বলেছিলেন—ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের পক্ষে। গণতন্ত্রের প্রতি অত্যধিক বিশ্বাস থেকে—যা ব্রিটেন ভারতে কখনও ব্যবহার করে নি—নেহরু ফ্যাসিবাদের বিরোধী ছিলেন……

"গান্ধী, আপন বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী, ব্রিটেনের প্রতি নিঃশর্ত সমর্থনের জন্য আবেদন জানালেন। তাঁর সমগ্র রাজনৈতিক চিন্তাধারা প্রকাশ পাবে ভারতবিজয়ীদের পরাজিত করার মধ্য দিয়ে নয়, তাদের পরিবর্তিত করার মধ্যে; ব্রিটিশদের বাদ দিয়ে পক্ষাবলম্বন করার মতো সবকিছুই অর্থহীন ··

"গান্ধী চেয়েছিলেন যুদ্ধে ব্রিটেন বিজয়ী হোক, যাতে তাঁর তাদের পরিবর্তিত করার আন্দোলনের ফলস্বরূপ ব্রিটিশ ভারত ত্যাগ করতে পারে। সর্বোপরি তিনি যে সর্বদাই সঠিক ছিলেন তা প্রমাণ করার জন্য তাদের পরিবর্তন সম্পর্কে প্রত্যয় জন্মানোর প্রয়োজন ছিল তাঁর……জওহরলালের আশা ছিল ব্রিটেন বিজয়ী হবে……প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ লেবারদলের বুর্জোয়া নেতাদের তুলনায় অধিক বিপ্লবী ছিলেন না তিনি।"[৫০]

১৯৪০ সালের জুন মাসে বসুর মহাত্মাজী এবং মুসলীম লীগ সভাপতি মিস্টার জিন্নার সঙ্গে পরবর্তী সাক্ষাৎকার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। ব্যাপক আন্দোলনের সম্ভাবনা রোধ করার জন্য জেলে পাঠান হ'ল সুভাষকে।

বন্দী থাকাকালে বসু উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে তাঁর সম্মিলিত সংগ্রামের পরিকল্পনার সাফল্যের সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ। সুতরাং স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিগুলিকে জোরদার করতে আন্তর্জাতিক রাজনীতির-ক্ষেত্রে সক্রিয়-ভাবে প্রবেশের প্রয়োজন অনুভব করলেন তিনি। আর যদি এটাই করতে হয় তবে জেলে বন্দী থাকাটা হবে তাঁর পক্ষে এক অতি মারাত্মক ভুল। জেল থেকে মুক্তিলাভের আশায় তিনি আমৃত্যু অনশন শুরু করলেন। অনশন শুরু করার আগে তাঁর বিরুদ্ধে যেসব অন্যায় আর অবৈধ অভিযোগ আনা হয়েছে তার উল্লেখ করে ১৯৪০ সালের ২৬শে নভেম্বর তিনি এক চিঠি পাঠালেন বাংলার গভর্নরের কাছে। তিনি লেখেন: "বর্তমান পরিস্থিতিতে জীবনধারণ আমার পক্ষে অসহনীয়। অস্তিত্বের স্থায়িত্ব ক্রয় করার জন্য অবৈধ এবং অন্যায়ের সঙ্গে সমঝোতা করে চলাটা আমার প্রকৃতিবিরোধী। এই মূল্য দেবার বদলে আমি বরং আমার জীবনটাই উৎসর্গ করব······

"যদিও কোন তাৎক্ষণিক বাস্তব লাভ নেই হয়তো—তবু কোন কষ্টভোগ, আত্মত্যাগ চিরদিনের জন্য ব্যর্থ হয় না। কষ্টভোগ আর আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়েই কেবল প্রতিটি যুগে, প্রতিটি দেশে একটি উদ্দেশ্য বেঁচে থাকে এবং প্রচার লাভ করে, বিজয়ী হয় শাশ্বত বিধি—'দি ব্লাড অব্ দি মার্টার ইজ্ দি সীড্ অব. দি চার্চ'। এই নশ্বর জগতে সবকিছুই ধ্বংস হয়, ধ্বংস হবে, কেবল নষ্ট হবে না ভাব, আদর্শ আর স্বপ্নর। একটি উদ্দেশ্যের জন্য একজন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করতে পারেন, কিন্তু সেই উদ্দেশ্য তাঁর মৃত্যুর পরেও হাজার জীবনের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখবে নিজেকে।" উল্লিখিত পত্রে তাঁর স্বদেশবাসীকে উদ্দেশ্য করে তিনি আরো বলেছিলেন: "ভুলে যেও না দাসত্বই একজন মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় অভিশাপ। ভুলে যেও না সবচেয়ে বড় অপরাধ অন্যায় এবং মিথ্যার সঙ্গে সমঝোতা করা। মনে রেখো সেই

শাশ্বত বিধি—'জীবন পেতে হলে জীবন দিতে হয়।' আর মনে রেখো যে, মূল্য যাই হোক না কেন তার জন্য ভাবনা না করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করাটাই হ'ল সবচেয়ে বড় গুণ।" ৫ই ডিসেম্বর বসু মুক্ত হলেন। ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে তিনি ফিরে এলেন বাড়িতে। অবশ্য গৃহে অন্তরীণ করে রাখা হ'ল তাঁকে।

মুক্তিলাভের পর বাড়িতেই ছিলেন বসু। তাঁর শয়নকক্ষ ত্যাগ করতেন না তিনি। এই নিঃসঙ্গ সময়ে তিনি সমগ্র যুদ্ধ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলেন এবং জাতীয় সম্মান বিসর্জন না দিয়ে, বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের সাহায্যে এবং বিদেশী শক্তির সহায়তায় ভারতের বাইরে থেকে দ্বিতীয় রণক্ষেত্র উন্মুক্ত করার সম্ভাবনা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করলেন। বাইরের সাহায্য প্রার্থনার প্রশ্নটিকে নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে সর্বশক্তিমান বৃটিশ সরকার যদি ভিক্ষাপাত্র হাতে সর্বত্র সাহায্য প্রার্থনা করে বিশ্বময় ঘুরে বেড়াতে পারে—এমনকি দাসত্বে বদ্ধ এবং দরিদ্র ভারতবাসীর কাছ থেকেও,—তবে ভারতের পক্ষে বাইরের সাহায্য প্রার্থনা করাটা মোটেই অন্যায় নয়। গত দু'শো বছর ধরে সংগঠিত স্বাধীনতা-সংগ্রামগুলির সতর্ক অধ্যয়ন করেও বসু এমন একটিও নাম উদ্‌ঘাটন করতে পারল না যেখানে বাইরের কোন প্রকার সাহায্য ব্যতিরেকেই স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। তিনি অনুভব করেছিলেন যে ভারতের কাছে কোন সাহায্যের প্রস্তাব এলে তা গ্রহণ না-করাটা হবে সবচেয়ে বড় বোকামি। আর তত্ত্বগত বিবেচনার দ্বারা প্রভাবিত হলে তা হবে এক শোচনীয় ভ্রান্তি।

এইভাবে নিজ প্রত্যয়ে অটল থেকে, দৃঢ় আশাবাদ আর আত্মবিশ্বাসকে আপন ক্রিয়াকলাপের পুঁজি হিসেবে সঙ্গে নিয়ে ১৯৪১ সালের ১৭ই জানুয়ারী বসু ইওরোপের পথে তাঁর কলকাতাস্থিত বাসগৃহ ত্যাগ করলেন। চললেন এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করতে, যা উজ্জ্বল হয়ে আলো বিকীর্ণ করবে চিরদিন আর সব বয়সের সব দেশের দেশপ্রেমিকদের সকল প্রকার দাসত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উজ্জীবিত করে চলবে।

ব্রিটিশ সংবাদপত্র

ডেইলী হেরলড

২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩

গান্ধীর সহযোগী স্ট্রেচারে দেশত্যাগ করলেন
তাঁকে সমুদ্র পর্যন্ত পাহারা দিয়ে নিয়ে গেল পুলিশ
ইওরোপের উদ্দেশ্যে কলকাতার প্রাক্তন মেয়র

ভারতীয় কর্তৃপক্ষ যে মানুষটিকে মিস্টার গান্ধীর কংগ্রেস আন্দোলনের মন্ত্রণাদাতা বলে মনে করেন, তিনি আজ ইওরোপের উদ্দেশ্যে একটি ইতালীয় জাহাজে ভারত ত্যাগ করেছেন।

তাঁকে ট্রেন থেকে জাহাজ পর্যন্ত একটি স্ট্রেচারে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং জাহাজ উপকূল ত্যাগ করে বহুদূরে না যাওয়া পর্যন্ত পুলিশী প্রহরার ব্যবস্থা থাকে। তাঁর রক্ষী বিশেষ ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে।

যে মানুষটি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ এতোই আশঙ্কিত তিনি হলেন বাংলার কংগ্রেস নেতা এবং কলকাতার প্রাক্তন মেয়র সুভাষ বসু।

"ভাইয়ের সঙ্গে কথোপকথন"

যক্ষ্মারোগের চিকিৎসার জন্য সুইজারল্যাণ্ডে যাবার উদ্দেশ্যে সুভাষ বসুকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁকে বন্দী করা হয়। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে ৬৪ পাউণ্ড ওজন হ্রাস পাবার ফলে তিনি অত্যন্ত দুর্বল। তা সত্ত্বেও সরকার কলকাতায় তাঁর প্রভাব এতো বেশী বলে মনে করেন যে ইওরোপ যাত্রার পূর্বে তাঁকে তাঁর মৃতপ্রায় মায়ের সহিত সাক্ষাতের অনুমতি পর্যন্ত দেন নি।

অবশ্য ট্রেন থেকে জাহাজ পর্যন্ত যাত্রায় একজন ভাইকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সর্বক্ষণই তাঁদের সঙ্গে ছিল পুলিশ। অন্যান্য সাক্ষাৎকারগুলি কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়।

পুলিশ অফিসারেরা তাঁর সঙ্গে জাহাজ পর্যন্ত যান, কিন্তু উপকূল ত্যাগ করে তাঁরা বহুদূরে না যাওয়া পর্যন্ত মুক্তির আদেশ প্রদান করেন নি।

প্রায় বছরখানেক সুইজারল্যাণ্ডে অবস্থান করা সুভাষ বসুর উদ্দেশ্য।

দি নিউ স্টেট্‌স্‌ম্যান এণ্ড নেশন
৩১শে আগস্ট, ১৯৩৫

প্রবেশ নিষেধ

মহাশয়—আমার ধারণা মতো, গ্রেটবৃটেনের জনগণের পক্ষে আকর্ষণীয় একটি বিষয়ে, আমি কি আপনার পত্রিকা-স্তম্ভের আতিথেয়তা কামনা করতে পারি—অন্তত ভাল মনের জনসাধারণের অংশের জন্য ?

১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাসে আমি ১৮১৮ সালের 'বিবর্ণ' রেগুলেশনের ৩নং ধারা মতে ভারতে কারারুদ্ধ হই এবং ১৯৩৩ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত হাজতবাস করি। এই সময়ের মধ্যে বারবার জানতে চাওয়া সত্ত্বেও সরকারের কাজ থেকে আমি আমার কারাবাসের কারণ কখনও জানতে পারি নি। আমার স্বাস্থ্য যখন সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে এবং যখন সরকারী চিকিৎসকগণ ও সরকার নিযুক্ত মেডিকেল বোর্ড বারংবার পরামর্শ দেন যে চিকিৎসার জন্য আমাকে ইওরোপে যাবার অনুমতি দেওয়া উচিত, তখনই আমাকে সেই অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমি জানি না যে কেন আমি বন্দী ছিলাম।

কয়েকদিন আগে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ইংল্যাণ্ড থেকে আসা কয়েকজন বন্ধু মারফত জানতে পারি যে সেখানে আমার বিরুদ্ধে এই বলে প্রচার চালানো হয়েছে যে আমি ভারতে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলাম। সন্ত্রাসবাদী এবং তার সমর্থকদের মোকাবিলা করবার জন্য বাংলা সরকারের হাতে যে ক্ষমতা আছে তা এতো বিস্তৃত এবং সুদূরপ্রসারী যে, যদি উক্ত অভিযোগের সামান্যতম ভিত্তি থাকত তবে আমি নিশ্চিত যে বাংলা সরকার বহুপূর্বেই আদালতে আমার মোকাবিলা করতেন। বিশেষত আমি যখন বারবার চেয়েছি যে, হয় আমার বিচার হোক, নয়তো মুক্তি দেওয়া হোক আমাকে। সন্ত্রাসবাদের সমস্যা সম্পর্কে আমার নিজস্ব মনোভাব আমার 'দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' (উইসহার্ট) গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মহাশয়, আমি এখন প্রশ্ন করি যে একজন মানুষের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করা কি উচিত, যখন শাস্তিদানের জন্য সম্ভাব্য ব্যাপকতম ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আপনারা তাঁকে অভিযুক্ত করতে অস্বীকার করেছেন

এবং যখন অপরাগ হয়েছেন, এমনকি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবেও জানাতে যে কেন তিনি তাঁর স্বাধীনতার অধিকার থেকে বঞ্চিত।

সমস্ত ব্যাপারটির মধ্যেকার এই অবিচার এবং অন্যায় আরো বৃদ্ধি পেয়েছে এই ঘটনার ফলে যে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আমাকে ইংল্যাণ্ডে আসার অনুমতি পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে, আমার ইওরোপে যাত্রা শুরু করার মুহূর্তে, যখন আমাকে পাসপোর্ট দেওয়া হ'ল আমি বিস্মিত হয়ে দেখলাম যে তাতে এক নির্দেশ মারফৎ জানানো হয়েছে যে আমি যুক্তরাজ্য (ইংল্যাণ্ড) এবং জার্মানিতে প্রবেশাধিকার পাব না। সেই সঙ্গে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে আমাকে জানানো হয়েছিল যে আমি যদি পাসপোর্টের সুযোগ বাড়াতে চাই তবে ইওরোপে থাকাকালে যেন সেক্রেটারি অব্ স্টেট ফর ইণ্ডিয়ার নিকট আবেদন জানাই। ১৯৩৩ সালে ইওরোপে আসার পর আমি সেক্রেটারি অব্ স্টেট ফর ইণ্ডিয়ার কাছে যুক্তরাজ্য এবং জার্মানি ভ্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করি, কিন্তু কেবল জার্মানী সফরের অনুমতি দেওয়া হয় আমাকে। সুতরাং অবস্থা হয়েছে এমন যে একজন ব্রিটিশ প্রজা এবং কেমব্রিজের স্নাতক হওয়া সত্ত্বেও আমি ইওরোপের সব দেশ সফর করতে পারি, কেবল পারি না বৃটেন সফর করতে।

এমনই এক অবিচার করা হয়েছে ভারতে আমার 'দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' গ্রন্থখানিকে নিষিদ্ধ করে। যদিও এটি প্রকাশ করেছেন এক ব্রিটিশ প্রকাশনালয় এবং বৃটেনে প্রচারের জন্য এটি অনুমতিপ্রাপ্ত। ইংরেজ আইনের ব্যাখ্যা কি গ্রেটবৃটেনে একরকম, অন্যরকম ভারতে ?

১৯২১ থেকে ১৯৩১-এর মধ্যে আমি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কাজকর্মে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছি, কিন্তু আমার সমস্ত কাজকর্মই ছিল প্রকাশ্য এবং খোলাখুলি। এই সময়কালে আমি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি, সর্ব-ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি এবং কলকাতার মেয়র হিসেবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিকার করেছি। আর এমনকি আজও আমি বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির সভাপতি। আমার এই খর্বিত স্বাধীনতার মধ্যে একটিই সান্ত্বনা আছে যে বাংলাদেশে মহিলাসহ আড়াই হাজারেরও অধিক মানুষ বিনা বিচারে

তাঁদের স্বাধীনতার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আছেন। (আমি ১৯৩৫ সালের ২রা আগস্টের 'টাইমস' থেকে সংখ্যাটি গ্রহণ করেছি।)

আমি বিশ্বাস করি যে সংখ্যায় যতো অল্পই হোক না কেন, ইংল্যাণ্ডে এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁরা ন্যায়বিচার ও সততার পক্ষে। আপনার সম্মানীয় সাময়িক পত্রের মাধ্যমে আমি উপরি-উক্ত বিষয়টির প্রতি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

সুভাষচন্দ্র বসু

কুরশায়ুস কনিজিন আলেকজান্দ্রা
কার্লস্‌বাড
(আই.ও. আর ফাইল নং পি. এণ্ড জে. ৭।৭৯৩)

দি ম্যান্‌চেস্টার গার্ডিয়েন
১লা অক্টোবর, ১৯৩৫

ভারতীয় কংগ্রেস এবং সঙ্কট

ম্যান্‌চেস্টার গার্ডিয়েন সম্পাদক সমীপেষু,

মহাশয়,

ভারতীয় সামরিক বাহিনীর কমাণ্ডার-ইন্‌-চীফ্, আদ্দিস আবাবায় ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রেরণ সম্পর্কে ১৭ই সেপ্টেম্বর কাউন্সিল অব্ স্টেটে অনুষ্ঠিত বিতর্কের সময় বলেন: "যদি আমরা যুদ্ধে যাই তবে আমরা ভারতকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইব।" যে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তা হল এ ক্ষেত্রে গ্রেটবৃটেনের সঙ্গে ভারত যোগ দিলে কি লাভ করবে? এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে যুদ্ধ আরম্ভ হলে ভারতীয় নেতারা সৈন্যসংগ্রহের এজেন্ট হিসেবে সহজে উৎসর্গ করবেন না নিজেদের, যেমন তাঁরা মহাযুদ্ধের সময় করেছিলেন। ১৯২৭ সাল থেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তার বাৎসরিক সম্মেলনে যুদ্ধবিরোধী প্রস্তাব গ্রহণ করে আসছে।

ইতালির বিরুদ্ধে বৃটেন যে সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা প্রথমে এক উৎসাহী সহানুভূতির ঢেউ তুলেছিল সারা ভারতে। এবং এই ঢেউয়ের মুখে ভারতীয় বাহিনীকে আদ্দিস আবাবায় প্রেরণ করা হয়েছিল। কিন্তু এ

আবেগ ক্রমশই ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। এর জন্য তিনটি কারণ দায়ী—প্রথম, ১৯০৬ সাল থেকে আবিসিনিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে ফ্রান্স এবং ইতালির সঙ্গে বৃটেনের অংশগ্রহণের কথা এখন ভারত জানতে পেরেছে। দ্বিতীয়ত, লীগের সভায় স্যার স্যামুয়েল হোর-এর বক্তৃতা, যেখানে তিনি ভারতকে প্রদান করা 'মহৎ ও জটিল স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার' জন্য নিজেকে অভিনন্দিত করেছেন, যা তাঁর সমর্থিত লীগের প্রতি ভারতীয় অনুভূতিকে নিরুৎসাহিত করেছে। (লীগে যদি বৃটিশ সরকারের মনোনীত প্রতিনিধির বদলে ভারত তার নিজস্ব প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারত তাহলে স্যার স্যামুয়েল নিশ্চিত ভাবে ঐ মন্তব্য করতেন না।)

তৃতীয়ত, সমসাময়িক কালে সীমান্ত জনগণের উপর আকাশপথে বোমাবর্ষণ—এই সেদিন এক প্রস্তাব মারফত যার নিন্দা করেছেন ইণ্ডিয়ান লেজিস্‌লেটিভ এসেমব্লি—ইতালীয় পদ্ধতির বিরুদ্ধে বৃটিশ পদ্ধতির প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি করে নি।

বর্তমান সংকটে যদি ভারতীয় সমর্থনের কোন মূল্য থেকে থাকে, তাহলে সীমান্তের জনগণের উপর বোমাবর্ষণ বন্ধ করে এবং ভারতকে 'যথেষ্ট' (কিন্তু জটিল নয়) পরিমাণ স্বায়ত্তশাসনাধিকার দিয়ে ইতালির উপর তার নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করতে হবে। নতুবা যদি ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে ভারতকে যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেওয়া হয় তবে, এটা সম্পূর্ণ সম্ভাবনার অতীত বলে মনে করা উচিত হবে না, কংগ্রেস অহিংসা অসহযোগিতার আদর্শে তার যুদ্ধবিরোধী প্রস্তাবকে হয়তো বাস্তবে রূপ দেবে।

একান্ত আপনার

হফগাস্টাইন, অস্ট্রিয়া, সুভাষচন্দ্র বসু, সভাপতি

২৬শে সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটি

ডেইলী হেরলড

২১শে মার্চ, ১৯৩৬

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে নির্বাসিত নেতা বন্দী হবেন

নির্বাসিত ভারতীয় জাতীয় নেতা, মিস্টার সুভাষ বসুকে সতর্ক করে

দেওয়া হয়েছে যে, তিনি যদি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন তবে তাঁকে পুনরায় গ্রেফতার করা হবে। তাঁর বৃটেনে অবতরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং তিনি এখন অস্ট্রিয়ায় রয়েছেন।

মিস্টার বসু 'ডেইলী হেরলড'কে লিখেছেন যে তিনি ভিয়েনায় ব্রিটিশ কনুসালের কাছ থেকে এক পত্র পেয়েছেন, যার বক্তব্য হল:

"আমি আজ বৈদেশিক দফতরের সেক্রেটারী অব্ স্টেটের কাছ থেকে আপনাকে সতর্কতা জ্ঞাপনের এক নির্দেশ পেয়েছি যে, সংবাদপত্রের বিবৃতি মারফত সরকার জ্ঞাত হয়েছেন যে আপনি বর্তমান মাসে ভারতে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং ভারত সরকার একথা আপনাকে স্পষ্ট ভাষায় জানাতে চান যে এমন আচরণ করলে আপনি মুক্ত থাকার আশা করতে পারেন না।"

মিস্টার বসু দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, তিনি ১৯৩২ সালের ২রা জানুয়ারী ভারতে গ্রেফতার হন এবং ১৯৩৩ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বিনাবিচারে জেলে বন্দী ছিলেন।

"আমি বারংবার জানতে চাওয়া সত্ত্বেও", তিনি লিখেছেন, "আমার বিরুদ্ধে ভারত সরকারের অভিযোগ কিংবা অসন্তোষের কারণ আমাকে জানানো হয় নি।

"গৃহে অন্তরীণ"

"আমি যখন গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ি এবং আমাকে পরীক্ষা করার জন্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অনেকগুলি মেডিকেল বোর্ড পরামর্শ দেন যে, হয় আমাকে মুক্তি দেওয়া উচিত অথবা উচিত চিকিৎসার জন্য ইওরোপে প্রেরণ করা, তখনই ভারত সরকার আমাকে ইওরোপ যাত্রার অনুমতি দেন এবং কারাদণ্ডের আদেশ প্রত্যাহার করেন।

"প্রকৃতপক্ষে গত তিনবছর যাবৎ আমি ইওরোপে রয়েছি। এই সময়ের মধ্যে ১৯৩৪ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি আমার মৃতপ্রায় পিতাকে দেখবার জন্য একবারমাত্র ভারতে গিয়েছিলাম; এবং সেখানে ছ সপ্তাহ অবস্থানকরি।

"ভারতে আমার স্বল্প অবস্থানকালে আমাকে গৃহে অন্তরীণ করে রাখা

হয়। এখন আমি গৃহে ফিরে যেতে আগ্রহী আর আমাকে এই সরকারী ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

"আইনগত এবং নৈতিক দিক থেকে আমার সর্বশেষ কারাবরণের ব্যাপারটি ছিল অত্যন্ত খারাপ। কিন্তু ভারতে প্রত্যাবর্তন করলে আমার প্রস্তাবিত কারাবাস এখন সব অতীত ইতিহাস অতিক্রম করেছে। আমি কি প্রশ্ন করতে পারি যে এই কি সম্প্রসারিত স্বাধীনতার পূর্ব অভিজ্ঞতা, যাকে অভ্যর্থনা জানাবে নতুন সংবিধান!"

দি টাইমস

২২শে মে, ১৯৩৬

······কলকাতার এক প্রাক্তন মেয়র মিস্টার বসু দীর্ঘদিন যাবৎ একজন উগ্রপন্থী হিসেবে কুখ্যাত ছিলেন। তিনি আটক ছিলেন রাজবন্দী হিসেবে, কিন্তু ডাক্তারী চিকিৎসার জন্য ইওরোপে আসার উদ্দেশ্যে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়, তাঁকে ইংল্যাণ্ডে অবতরণের অনুমতি দান করতে অস্বীকার করা হয়, এবং ভারতে প্রত্যাবর্তন করলে তিনি পুনরায় গ্রেফতার হন। সরকার তাঁকে পূর্বেই অবগত করান যে দেশে প্রত্যাবর্তন করলে মুক্ত জীবনের আশা করতে পারবেন না তিনি।

ইভনিং স্ট্যান্ডারড

১৮ই নভেম্বর, ১৯৩৭

কংগ্রেসী নেতা আসছেন

সুভাষচন্দ্র বসু, যাঁকে স্বচ্ছন্দে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর পরবর্তী কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে উল্লেখ করা হয়, তিনি আজ ডাচ-বিমানে ইওরোপের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন।

তিনি নেপলসে অবতরণ করেছেন, এবং সেখান থেকে রোম হয়ে অস্ট্রিয়ার বাডগাস্টাইনে যাবেন।

সম্ভবত ভারতে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে তিনি লণ্ডন সফর করবেন।

—রয়টার

ইভনিং নিউজ

১৮ই নভেম্বর, ১৯৩৭

লণ্ডনের উদ্দেশ্যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী

সুভাষচন্দ্র বসু, যাঁকে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর স্থানে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পরবর্তী সভাপতি হিসাবে প্রকাশ্যে উল্লেখ করা হয়, তিনি আজ ডাচ-বিমানে ইওরোপের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন।

তিনি নেপল্‌সে অবতরণ করেছেন এবং রোম হয়ে অস্ট্রিয়ার বাডগাস্টাইনে যাবেন।

সম্ভবত ভারতে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে তিনি লণ্ডন সফর করবেন।

—রয়টার

ইভনিং ক্রনিকল

১৮ই নভেম্বর, ১৯৩৭

ভারতীয় নেতা লণ্ডন সফর করতে পারেন

সুভাষচন্দ্র বসু, যাঁকে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর জায়গায় আগামী কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে প্রকাশ্যে উল্লেখ করা হয়, তিনি বিমানে ইওরোপের উদ্দেশ্যে বোম্বাই পরিত্যাগ করেছেন। সম্ভবত তিনি লণ্ডন সফর করবেন।

নিউজ ক্রনিকল

১১ই জানুয়ারী, ১৯৩৮

কংগ্রেসী নেতা লণ্ডনে মাল্যভূষিত

গতকাল রাত্রে হাজার হাজার ভারতীয় ভিক্টোরিয়া স্টেশনে ভারতের কংগ্রেস দলের নেতা মিস্টার সুভাষচন্দ্র বসুকে সাদর সম্ভাষণ জানান। এক সংক্ষিপ্ত সফরে তিনি লণ্ডনে এসেছেন।

তাঁর গলায় একটি ফুলের মালা পরিয়ে দেওয়া হয়। মিস্টার বসু, যিনি নিশ্চিতভাবেই পরবর্তী কংগ্রেস সভাপতি হবেন, বহুবার রাজবন্দী ছিলেন।

জেলে অবস্থানকালে ১৯৩০ সালে তিনি কলকাতার মেয়র নির্বাচিত

হন। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে তিনি ইওরোপ সফর করেন, কিন্তু তাঁকে ইংল্যাণ্ডে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় নি। এই নিষেধাজ্ঞা এখন তুলে নেওয়া হয়েছে।

"রাজবন্দীরা"

পৌঁছনর পর তিনি নিউজ ক্রনিকলের কাছে বলেন: 'কংগ্রেস সর্বদাই রাজবন্দীদের মুক্তির দাবি করে এসেছে এবং স্বাভাবিক ভাবেই আমরা প্রথমেই এটিকে কার্যে পরিণত করার চেষ্টা করেছি। এটা আজ গোপন নয় যে, এই ব্যাপারে কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রীগণ এবং ক্যাবিনেটগুলি গভর্নরদের মনোভাবের ফলে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন।

উদাহরণস্বরূপ বাংলায় এখন পাঁচ শ বন্দী আছেন। গভর্নর এবং ক্যাবিনেটের মধ্যে নিত্য টানাপোড়েনের এইগুলিই কারণ।

'এইসব ব্যক্তি মুক্তি পেলে আইন-শৃঙ্খলা ব্যাহত হবার সরকারী দাবির সঙ্গে আমি একমত হতে পারি না। কারণ কংগ্রেসের অধীনে শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে অবনতি ঘটে নি।'

ফেডারেশন প্রসঙ্গে-লড়াই

ফেডারেশন প্রসঙ্গে মিস্টার বসু ঘোষণা করেন যে সমস্ত ন্যায়সঙ্গত উপায়ে এর যথাসাধ্য বিরোধিতা করা হবে।

খারাপ যদি আরো খারাপ হয় তবু আমরা সেগুলিকে ফেডারেশনের তুলনায় সেইভাবেই অধিক পছন্দ করব—তিনি বলেন।

'সঠিকভাবে অথবা ভুলক্রমে, আমরা অনুভব করি যে ফেডারেশনের অধীনে দেশীয় রাজারা নিশ্চিতভাবেই এক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিতে পরিণত হবে।'

তিনি তাঁর সফরকে ব্যক্তিগত সফর বলে বর্ণনা করেন, কিন্তু তিনি আরো বলেন যে আমন্ত্রিত হলে, আগামী সপ্তাহে, তিনি, ভারতে ফিরে যাবার আগে ইণ্ডিয়া অফিসের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গি বিনিময়ের এক সুযোগকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবেন।

দি ম্যানচেস্টার গার্ডিয়েন
১১ই জানুয়ারী, ১৯৩৮

লণ্ডনে মিস্টার সুভাষ বসু
কংগ্রেসী মন্ত্রীদের পক্ষ সমর্থন :
"আমরা সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির উন্নতি ঘটিয়েছি"

লণ্ডনে নিজস্ব সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত, ফ্লিট স্ট্রীট, সোমবার। তাঁর লণ্ডন প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবার পর মিস্টার বসু আজ রাত্রে যখন ভিক্টোরিয়া স্টেশনে এসে পৌছেন, তখন বহু শত ভারতীয় এবং ইংরেজ বন্ধু তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। এই যুবকসুলভ মানুষটি যিনি সম্ভবত পরবর্তী কংগ্রেস সভাপতি হবেন, ডাক্তারী চিকিৎসার জন্য ইওরোপে এসেছিলেন। কিন্তু এখন পদের দায়িত্ব বহনের পক্ষে তিনি চমৎকার স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছেন এবং সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

যেসব ইংরেজ প্রথমবারের মতো তাঁর সঙ্গে মিলিত হন, তাঁরা সকলেই তাঁর মধুর এবং শান্ত ব্যবহার আর ভারতীয় বিষয়সমূহ সম্পর্কে আলোচনায় তাঁর প্রত্যয় লক্ষ্য করে মুগ্ধ হয়েছেন। এটি ঘটেছিল ঘণ্টাখানেক বাদে উরচেস্টার হোটেলে এক অভ্যর্থনা-সভায়, যেখানে এক বিরাটসংখ্যক ভারতীয় এবং ইংরেজ সাংবাদিকরাও উপস্থিত ছিলেন।

কংগ্রেসী মন্ত্রীদের অধীনস্থ প্রদেশগুলির অবস্থার কথা জানতে চাওয়া হলে মিস্টার বসু বলেন যে মন্ত্রীদের বহুপ্রকার অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের উপর তাঁদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই—যার হাতে রয়েছে বিশেষ দায়িত্ব এবং অবাধ ক্ষমতা। এমনকি নিজস্ব এলাকাগুলিতেও তাঁদের আপন ইচ্ছানুসারে চলবার ক্ষমতা নেই, যেমন, উদাহরণস্বরূপ, তাঁদের সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেবার ইচ্ছা সম্পর্কে। বাংলায় যেসব মানুষ গ্রামে কিংবা আপন গৃহে অন্তরীণ ছিলেন তাঁদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখনও বাংলায় পাঁচ শত মানুষ রাজনৈতিক অভিযোগে বন্দী আছেন।

"আর্থিক সমস্যা"

প্রাদেশিক সরকারগুলির সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন অর্থনৈতিক। কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ না করা পর্যন্ত তাঁদের পক্ষে বেশী

কিছু করা সম্ভব নয়। এর পরের সমস্যা হল সিভিল সার্ভিসের স্থায়ী সদস্যদের নিয়ে—যাঁরা মন্ত্রীদের নির্দেশ কার্যকর করেন, কিন্তু আর্থিক ব্যাপারে তাঁদের উপর নির্ভরশীল নন। 'তাঁদের এইসব-অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও,' মিস্টার বসু বলেন, 'আমি বিশ্বাস করি যে ক্ষমতায় থাকাকালীন এই স্বল্প সময়ের মধ্যে কংগ্রেসী মন্ত্রীগণ তাঁদের উপস্থিতির যৌক্তিকতা প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট কাজ করেছেন।'

এইসব মন্ত্রীরা ক্ষমতায় আসার পর পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে এবং কোন ভাবেই সাম্প্রদায়িক সমস্যা হ্রাস পায় নি, এই বিষয়ে ইঙ্গিত করা হলে মিস্টার বসু উত্তর দেন: "এটা সর্বৈব মিথ্যা। আমরা সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির উন্নতি ঘটিয়েছি। আমার ধারণা, একটি মাত্র ব্যতিক্রম ছাড়া, একটি প্রদেশ, যেটি এতোই ছোট যে সেখানে তিনজনের বেশী মন্ত্রী থাকতে পারেন না এবং যেখানে নিযুক্ত করার মতো কোন মুসলমানকে পাওয়া যায়নি, বাস্তবিক পক্ষে সমস্ত প্রদেশেই একজন করে মুসলমান মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়েছে। একাজ কবার জন্য তারা তাদের নির্দিষ্ট পথেরও বাইরে গেছে। আমরা মুসলীম লীগের সঙ্গে আরো ভাল সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়ে আশাবাদী।

কংগ্রেস-শাসিত প্রত্যেক প্রদেশে কৃষকসমাজের জন্য আমরা বাস্তব কিছু করেছি। উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, যেমন খাজনা বৃদ্ধি-রোধ এবং বকেয়া খাজনা আদায় বন্ধ করা। আমরা আপৎকালীন আর্থিক ব্যবস্থার মতো কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি এবং সমগ্র প্রশ্নটি পরীক্ষা করে দেখেছি কিভাবে স্থায়ী ত্রাণের ব্যবস্থা করা যায়।

ফেডারেশনের প্রতি বিরোধিতা

"আমরা ফেডারেশনের বিরোধী: আমরা সর্বোপায়ে এর বিরুদ্ধে লড়াই চালাব," মিস্টার বসু ঘোষণা করেন। "এর প্রবর্তনের বিরোধিতা করার জন্য আমরা প্রতিটি আইনসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চলেছি। এখন যেভাবে ফেডারেশনের পরিকল্পনা করা হয়েছে তা হবে একটি বাধা বিশেষ। আমরা মনে করি দেশীয় রাজারা নিশ্চিতভাবেই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি হয়ে উঠবে। চরম ব্যবস্থা হিসেবে ফেডারেশনের বদলে আমরা বরং চলতি অবস্থাকেই মেনে নেব।"

মিস্টার বসু বলেন যে তিনি কোন রাজনৈতিক লক্ষ্য নিয়ে এখানে আসেন নি। তিনি এসেছেন পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাঁদের অনেককেই তিনি বহু বৎসর যাবৎ দেখেননি।

ইণ্ডিয়া অফিসে যাবেন কিনা জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন যে তাঁর বন্ধুরা যদি কারো সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তাহলে তিনি তা করতে প্রস্তুত। "কংগ্রেসী দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে আমরা কারো কাছেই যাব না।"

দি ম্যানচেস্টার গার্ডিয়েন

১২ই জানুয়ারী, ১৯৩৮

ভারত এবং ফেডারেশন

গ্রহণযোগ্য নয়

কংগ্রেসী মনোভাব সম্পর্কে মিস্টার বসু

লণ্ডন থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত, মঙ্গলবার।

আজ আপনাদের সংবাদস্তম্ভে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে ভারতীয় কংগ্রেসের সম্ভাব্য সভাপতি মিস্টার সুভাষচন্দ্র বসু মন্তব্য করেছেন যে, কংগ্রেস ফেডারেশনের যথাসাধ্য বিরোধিতা করবে। উক্ত প্রসঙ্গে আমার সঙ্গে আরো আলোচনার সময় তিনি আমাকে বলেন, ফেডারেল নির্বাচন বয়কট করা কিংবা তাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা তারপর ফেডারেশন প্রস্তাবটিকে চালু করতে দিতে অস্বীকার করা—এ ব্যাপারে কংগ্রেস মনস্থির করে উঠতে পারে নি।

মিস্টার বসু বলেন যে এই দুই পথের মধ্যে ফেডারেশনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকর পথটিকেই গ্রহণ করবেন তাঁরা। তিনি অবশ্য স্বীকার করেন যে বর্তমানে মতামত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পক্ষেই বেশী ভারী বলে মনে হয়।

"একটি সতর্কীকরণ"

কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হ'ল, মিস্টার বসু মন্তব্য করেন, গ্রেট বৃটেনের জনগণকে তাঁদের এ চিন্তা সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া যে কংগ্রেস

'ভারতীয় নেতা' এই শিরোনামায় ম্যানচেস্টার গার্ডিয়েন তাদের ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৩৮ সালের সংখ্যায় সুভাষচন্দ্র বসুর একটি ছবি মুদ্রিত করে।

অতীতে যেমন প্রাদেশিক সরকার গঠনের দিকে ঝুঁকেছিল তেমনি আবার সে ফেডারেশন চালু করার পক্ষে ঝুঁকতে পারে। দুটি বিষয় সম্পূর্ণ আলাদা তিনি দাবি করেন।

তিনি আভাস দেন যে, সব দলই ফেডারেশনের বিরোধী, বিশেষত মুসলমানেরা। অপরদিকে সমস্ত দলই প্রাদেশিক সরকারের মুখোমুখী হয়েছিল খোলা মনের মতো কিছু একটা সঙ্গে নিয়ে। তাঁরা অনুভব করেছিলেন যে প্রাদেশিক গভর্নরদের বিশেষ ক্ষমতা সত্ত্বেও প্রাদেশিক সরকারগুলি রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি কার্যকর করার অধিকারী হবে।

ফেডারেল সেণ্টারের ব্যাপারটি, তিনি বলেন, এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি 'সংরক্ষিত' এবং সরকারের এই সংরক্ষিত বিভাগগুলি সর্বসাকুল্যে ভারতীয় বাজেটের আশি ভাগ। সর্বশেষ যুক্তি দেখিয়ে বসু বলেন—এই প্রকৃত ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করার উপরেও আবার রয়েছেন রাজারা, যাঁদের কাজ হবে অসংরক্ষিত এলাকা-গুলিতেও যাতে প্রতিক্রিয়াশীলতা বেঁচে থাকে তার প্রতি লক্ষ্য রাখা।

"শাসনতন্ত্র গঠনকারী পরিষদ"

এগুলি কংগ্রেসের ফেডারেল পরিকল্পনার পুরনো সমালোচনা হতে পারে, কিন্তু বসুর মতে তারা এখনও ব্যাখ্যা করে যে কেন ফেডারেশনের বিরুদ্ধে সর্বজনীন বিরোধিতা আজও বর্তমান। তিনি বলেন যে ফেডারেল নির্বাচন এগিয়ে এলে এই বিরোধিতা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠবে। মিস্টার বসু বিশ্বাস করেন যে প্রাদেশিক সরকার যে উত্তেজনা প্রশমিত করেছেন ফেডারেল প্রশ্নের উত্থাপন আবার তা সৃষ্টি করবে।

আসন্ন অচলাবস্থা দূর করার পথ হ'ল বসুর যুক্তিতে—যা সর্বদা কংগ্রেস প্রচার করে এসেছে—ভারতের আপন আকাঙ্ক্ষার নিকটবর্তী এক সংবিধান প্রণয়নের জন্য একটি শাসনতন্ত্র-গঠনকারী পরিষদ গঠন।

বসুর প্রবন্ধ দেখুন: 'দি প্রবলেম অব্ ইণ্ডিয়া' ১৭.১.৩৮ তারিখে নিউজ ক্রনিকলে প্রকাশিত।—গ্রন্থকার।

নিউজ ক্রনিকল

১৭ই জানুয়ারী, ১৯৩৮

ভারতের সমস্যা

সুভাষচন্দ্র বসু

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলের নির্বাচিত সভাপতি

(জন্ম ১৮৯৭ সালে, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, আইন অমান্য আন্দোলনের ঘটনায় ১৯২১ সালে হাজতবাস। ১৯২২ সালে স্বরাজদলে যোগদান। ১৯২৪ সালে গ্রেফতার এবং ১৯২৭ সাল পর্যন্ত বিনাবিচারে আটক। পণ্ডিত নেহেরুর সঙ্গে ১৯২৮ সালে 'ইণ্ডিপেণ্ডেস লীগ' সংগঠিত করা। ১৯২৯ থেকে '৩১ সাল পর্যন্ত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি। জেলে থাকাকালে ১৯৩০ সালে কলকাতার মেয়র নির্বাচিত। ১৯৩২-৩৩-এ বিনা বিচারে কারাবাস। স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়লে ইওরোপ যাত্রার অনুমতি-লাভ। ১৯৩৬-এ ভারতে প্রত্যাবর্তন, পুনরায় কারাবাস এবং ১৯৩৭-এ মুক্তি। এখন স্বাস্থ্যোদ্ধার করছেন ইওরোপে।)

আবিসিনিয়া, স্পেন এবং চীন ধারাবাহিক ভাবে নিজেদের সভ্য পৃথিবীর মনোযোগের বিষয় করে তুলেছে। পিছনে সরে গিয়েছে ভারত এবং বৃটিশ জনগণ এই বলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে বলে মনে হয় যে, অন্য যা কিছুই ঘটুক না, ঝামেলাপূর্ণ ভারতীয় সমস্যার সমাধান করা গিয়েছে শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু সেটাই কি ঘটনা? ভারতীয় জনগণ এবং বিশেষ করে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের চিন্তা ভিন্ন।

দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকের পর আবার বৈঠকে অংশ গ্রহণ করা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে এসেছিল কংগ্রেস; এবং উক্ত সংগঠনের অংশ-গ্রহণ ব্যতিরেকেই তখন রচিত হয়েছিল সংবিধানের খসড়া। ফলে আমাদের কংগ্রেসীদের, এটিকে কার্যকর করার ব্যাপারে কোন দায়িত্ব থাকতে পারে না। শুরু থেকেই তার ক্ষমতা অনুযায়ী সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সংবিধানকে

[১৯৩৮ সালের ১৭ই জানুয়ারী সোমবার, সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায়, সুভাষ বসুর একটি ছবি সহ এই প্রবন্ধটি মুদ্রিত হয়।]

নিন্দা করেছে কংগ্রেস, ফেডারেল অংশটি সম্পর্কে বিরোধিতা ছিল সর্বাধিক।

* * *

সংবিধানটির দুটি অংশ আছে—প্রাদেশিক এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় (ফেডারেল)। সংবিধানের প্রাদেশিক অংশটিকে ১৯৩৫ সালের ১লা এপ্রিল কার্যকর করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় (ফেডারেল) অংশটি, কিছুদিন আগে আমাদের বলা হযেছিল, কার্যে পরিণত করা হবে ১৯৩৮ সালের ১লা এপ্রিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এ ব্যাপারে বৃটিশ সরকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছুই শোনা যায নি। কযেক মাস দফতর গ্রহণে ইতস্তত করেছিল ভারতের জাতীয কংগ্রেস। প্রদেশগুলিতে গভর্নরদের হাতে ব্যাপক ক্ষমতা থাকার ফলে আশঙ্কা করা যাচ্ছিল যে তাঁরা সম্ভবত মন্ত্রীদের কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করবেন। সেই মতো এই আশ্বাসের দাবি জানানো হচ্ছিল যে এই বিশেষ ক্ষমতাগুলি ব্যবহার করা হবে না। সোজাসুজি এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে এই আশ্বাসদানে অস্বীকার করলেন বৃটিশ সরকার। কিন্তু তা সত্ত্বেও পরোক্ষে ঘোষণা করলেন যে সাধারণ ভাবে এই ক্ষমতাগুলিকে কার্যকর করা হবে না। এরপর ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে কংগ্রেস দফতর গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়।

* * *

দফতর গ্রহণের স্বল্প সমযকালের মধ্যে কংগ্রেসী মন্ত্রীগণ অকংগ্রেসী মন্ত্রীদের তুলনায় অনেক ভাল প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁরা বহু-সংখ্যক রাজবন্দীর মুক্তি দিয়েছেন। দুর্দশাগ্রস্ত এবং অত্যন্ত হয়রাণ কৃষক-সমাজের বকেয়া খাজনা মকুবের মধ্য দিয়ে সাময়িক হলেও কার্যকর ত্রাণ-ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম হয়েছেন।

এক পরিবর্তিত ধরনের মদ্যপান নিষিদ্ধকরণ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে এবং মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশানুসারে গ্রহণ করা হয়েছে এক শিক্ষা-নীতি। কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশগুলিতে শ্রমমন্ত্রীগণ এক ঐক্যবদ্ধ শ্রম পরিকল্পনার খসড়া তৈরি করেছেন। অন্যান্য কর্মসূচী, বিশেষত জনস্বাস্থ্য এবং বেকার সম্বন্ধীয়, এখন বিবেচনাধীন রয়েছে। পর্যায়ক্রমে সর্বশেষ হলেও গুরুত্বে নয়, কংগ্রেসী মন্ত্রীগণ সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি ঘটাতে সক্ষম

হয়েছেন। এটা দেখাতে পেরেছেন যে জনসাধারণের সমস্ত অংশের পক্ষেই রয়েছে কংগ্রেস। ছোট্ট প্রদেশ উড়িষ্যা ব্যতিরেকে, যেখানে মাত্র তিন জনের একটি ক্যাবিনেট রয়েছে, সমস্ত কংগ্রেসী ক্যাবিনেটে মুসলমান সদস্য রয়েছেন।

কিন্তু কি হবে ভবিষ্যতে? যদিও কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশগুলিতে উপর থেকে স্বচ্ছন্দে কাজকর্ম চলেছে বলে মনে হয়, তবু এটা মোটেই বাড়িয়ে বলা হবে না যে একদিকে মন্ত্রীগণ এবং অপরদিকে গভর্নর ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব চলেছে।

গভর্নরগণ তাঁদের বিশেষ ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন, যে ক্ষমতা বলে তাঁরা মন্ত্রীদের অগ্রাহ্য করতে সক্ষম। অপরদিকে সিভিল সার্ভিসের সদস্যরা জানেন যে তাঁদের মাইনে এবং অন্যান্য আর্থিক সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারে তাঁরা মন্ত্রীদের উপর নির্ভরশীল নন।

তারপর থাকে অর্থের সবচেয়ে বড় প্রশ্নটি। কংগ্রেসী মন্ত্রীগণ কি তাঁদের নীতিকে কার্যকর করতে এবং তাঁদের কর্মসূচীকে কার্যে রূপায়িত করতে প্রয়োজনীয় অর্থসম্পদ সংগ্রহ করতে পারবেন? গুরুতর সন্দেহ রয়েছে আমাদের, যা গোপন করার কোন প্রয়োজন নেই বিশেষত কেন্দ্রে যখন একটি স্বৈরাচারী সরকার রয়েছে

* * *

সংবিধানের অপর অংশটি, অর্থাৎ (ফেডারেল) অংশ, এ্টা বেশী প্রতিক্রিয়াশীল যে কেবল কংগ্রেসই নয়, সমস্ত রাজনৈতিক দল, মুসলীম লীগ পর্যন্ত. শুরু থেকে এর বিরোধিতা করে আসছে। ফেডারেল সংবিধানের সবচেয়ে খারাপ অংশগুলির অন্যতম হ'ল ফেডারেল আইনসভার গঠন, যেখানে প্রতিক্রিয়াশীল রাজাদের মনোনীত সদস্য থাকবেন এবং থাকবে ফেডারেল সরকারের ভিতরে বহু সংরক্ষিত বিভাগের উপস্থিতি।

ফেডারেল মন্ত্রীগণ কেবল স্বল্পগুরুত্বের বিভাগগুলি পরিচালনা করবেন, যা কেবল ফেডারেল বাজেটের প্রায় কুড়ি শতাংশের অন্তর্ভুক্ত। অপর দিকে গুরুত্বপূর্ণ দফতরগুলি, সামরিক বিভাগ, বাজেটের প্রায় আশি শতাংশ অধিকার করে থাকবে প্রতিনিধি মারফত গভর্নর জেনারেলের শাসনাধীনে।

সুতরাং সিদ্ধান্ত হ'ল যে, কংগ্রেস সমস্ত বৈধ এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে ফেডারেশনের বিরোধিতা করবে। কংগ্রেস দলের মত পরিবর্তনের সামান্যতম সম্ভাবনা নেই এবং সম্ভবনা নেই প্রাদেশিক সরকারের মতো ক্রমশঃ ফেডারেল দফতর গ্রহণের নীতি অনুসরণের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করার। দুটির মধ্যে এতোটুকু সাদৃশ্য নেই।

আগেব মতোই আজও ভারতীয সমস্যা তেমনই সমাধানের অতীত হযে রয়েছে। এবং জোর কবে ফেডারেশনেব সূত্রপাত করার প্রচেষ্টা এক প্রথম শ্রেণীব সমস্যার সৃষ্টি করবে। এমন কি ফেডারেশন ছাড়াও সমস্যা এসে হাজির হতে পাবে কংগ্রেসী ক্যাবিনেট এবং গভর্নর ও তাঁর সমর্থক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের মধ্যেকার ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে।

জটিল ভারতীয সমস্যাব সমাধানে কংগ্রেসের একটি গঠনমূলক প্রস্তাব রযেছে ভারতীয জনগণের জন্য একটি শাসনতন্ত্র-প্রণয়নকারী পরিষদ (কন্‌স্‌টিটুযেণ্ট এসেমব্লি) গঠন। যতক্ষণ না পর্যন্ত জনগণ তাঁদের নিজেদের তৈবী একটি সংবিধান পায, ততোদিন কোন সমাধানই স্থায়ী ও চূড়ান্ত হতে পাবে না। এবং অবশ্যই ভারতীয় জনগণেব পূর্ণ স্বাধীনতার ভিত্তিতেই হবে সেই সমাধান।

-কবার ভাবতীয জনগণ স্বাধীনতা পেলে দুটি দেশের মধ্যে অতি বন্ধুত্বপূর্ণ এব' আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপিত না হবাব কোন কারণ থাকবে না। ভারত আজ কে'ল আপন জাতীয় স্বপ্নই দেখে না। দেখে গ্রেটবৃটেনসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশেব সঙ্গে সহযোগিতা স্থাপনের স্বপ্ন।

গোয়েন্দা তথ্য

১৯৩২ সালের ১৫ই ডিসেম্বর এম. জে. ক্লউসন কর্তৃক সুভাষ চন্দ্র বসুর উপর রচিত নোট থেকে উদ্ধৃতি :

বিভাগীয় কার্যবিবরণী

এটি কেবল ভারত সরকার কর্তৃক প্রেরিত একটি 'সতর্কীকরণ' তারবার্তা ; যার উত্তর দানের প্রয়োজন নেই। কিন্তু এটি একটি নীরব মনকে, সেই সব সমস্যা সম্পর্কে, বোঝবার সুযোগ করে দেবে, যার উপাদান-গুলি নিম্নলিখিত :

১. বসুর চরিত্র, কার্যাবলী এবং বিপদ

এস সি. বসু একজন দীর্ঘদিনের সুপ্রতিষ্ঠিত চরম জাতীয়তাবাদী। তিনি সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে জড়িত ছিলেন প্রধানত এই কারণে যে পৌর নির্বাচনের এজেন্ট হিসেবে বাঙালী সন্ত্রাসবাদীরা অত্যন্ত কার্যকর। তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের অধীন স্থানীয় কর্মচারী নিয়োগে ভারপ্রাপ্ত এবং রাজনৈতিক সমর্থনের মূল্য হিসাবে সন্ত্রাসবাদীদের নিয়োগের জন্য দায়ী। একটি সন্দেহ অন্তত রয়েছে যে ভারতের চোরাপথে অস্ত্র আমদানী করার কিছু কিছু পরিকল্পনার পিছনে রয়েছেন তিনি সাধারণভাবে, কামউনিস্ট মতবাদের সঙ্গে কিংবা ভারতে বাইরে বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের সঙ্গে তাঁর জড়িত থাকার সম্পর্কে কোন ধারণা নেই, তাঁকে সম্ভবত একজন তিক্ত অপরিবর্তনীয় বৃটিশ বিরোধী উচ্চাকাঙ্খী রাজনীতিবিদ্ হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে ; যাঁর আকর্ষণ মূলত বাংলার রাজনীতিকে কেন্দ্র করে.। গৌণ আকর্ষণ রয়েছে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে তাঁর কোন দ্বিধা নেই এবং তাঁর ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে সাহায্য করলে যে কারো সঙ্গে তিনি কাজ করতে পারেন।

২. বসুকে ইউরোপে আসতে দেবার ব্যাপারে বিরোধিতা—

বসু যদি ইউরোপে আসেন এবং তাঁর কর্মশক্তি ফিরে পান তবে তিনি সুইজারল্যাণ্ড এবং জার্মানিতে গেলে হয়তো ভয়ংকর আন্তর্জাতিক বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসবেন এবং পরিকল্পনা রচনা করবেন—যাকে কাজে পরিণত

করবেন তাঁর ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর। যদি তিনি ডেনমার্ক অথবা স্ক্যানডিনেভিয়ায় যান তবে নিঃসন্দেহে ভয়টা কম, তবে এই চিন্তা সম্ভবত উড়িয়ে দেওয়া যায় না (যদিও অত্যন্ত দূরবর্তী চিন্তা)। আমার জানা কেবল মাত্র দুটি বৈদেশিক জলপথ ব্যবস্থা, যারা উত্তর সাগরের ইউরোপীয় এবং ভারতীয় বন্দরের মধ্যে নিয়মিত চলাচল করে তারা অস্ত্র পাচারের পক্ষে সুবিধাজনক, তাই হানসা লাইনসের (যার লস্কর এবং নাবিকেরা সাংঘাতিক রকমের খারাপ) মাধ্যমে সহজে অস্ত্র পাচার করা যেতে পারে ; এবং আরো একটি লাইন, যার নাম সম্ভবত উইলিয়মহানস (?), যেটি স্ক্যানডিনেভিয়া থেকে যাতায়াত করে, যার কথা, বসুর যাবার পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত বলে ডাক্তার সুনীল বসু (ভাই) নিশ্চয়ই উল্লেখ করেছেন। তিনি যদি ইংল্যাণ্ড যান তবে সেখানে অধ্যয়নরত তরুণ বাঙালীদের সঙ্গে তিনি মূল্যবান যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম হবেন। তাঁদের অনেকেই কমিউনিস্ট মতবাদের দ্বারা সংক্রামিত হন এবং অধ্যয়নকালে সক্রিয় কমিউনিস্টদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন।

এক কথায় বসুকে ইংল্যাণ্ডে আসতে দেওয়া হলে আন্তর্জাতিক বিপ্লবীদের দ্রুত প্রসারের ক্ষেত্রটিতে তাঁকে সুযোগ করে দেওয়া হবে। কারণ ভারত সরকারের মতে তাঁর ভারত পরিত্যাগের নীতি একবার মেনে নেওয়া হলে চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ গ্রহণের অজুহাতে তাঁর ইউরোপ ঘুরে বেড়ানোর পথ রুদ্ধ করা একেবারেই অসম্ভব হবে। এটাও আশা করা যায় না যে ১৯২৭ সালে একবার সাফল্যের সঙ্গে কোন প্রতিশ্রুতি প্রদানে অস্বীকার করার পর তিনি এখন আবার তাঁর যাতাযাত সীমাবদ্ধ করার কোন অঙ্গীকার দানে স্বীকার হবেন। অথবা এমনকি তেমনই একটা কিছু দেবেন যা ভাঙতে ব্যর্থ হবেন তিনি।

(আই. ও আর. ফাইল নং পি এণ্ড জে ৫৯।৫৫।৩২, পৃঃ ১৯১)

প্রাগের ভাইস-কনসাল জে. ডব্লিউ টেলার কর্তৃক লণ্ডনের চীফ পাসপোর্ট অফিসারকে লেখা ৩০.৬.৩৩ তারিখের চিঠির থেকে উদ্ধৃতি : স্তবক ৩ : "১৯৩৩ সালের ২৫ শে মার্চ ভিয়েনায় কনসাল হাঙ্গেরী এবং চেকোস্লোভাকিয়ার জন্য এবং ১৯৩৩-এর ২৪ শে এপ্রিল

যুগোস্লোভিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, গ্রীস, তুরস্ক, স্পেন, পর্তুগাল, সুইডেন, নরওয়ে, এবং ডেনমার্কের জন্য তাঁর পাসর্পোটে অনুমতি প্রদান করেন। ১৩ই মে আরো একটি অনুমতি দেখতে পাওয়া যায়, যেটিতে উল্লেখ রয়েছে, 'জার্মানীর জন্যও কার্যকরী।" কর্তৃপক্ষ পি. ও. এস/এফ তাং ৯ই মে, ১৯৩৩।

স্তবক ৪ঃ "মিষ্টার সুভাষ বসুর নাম সতর্কীতের তালিকায় নেই; সুতরাং আমি তাঁর বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড এবং পোল্যাণ্ড যাত্রার অনুমতি গ্রাহ্য করেছি। আর তাঁকে জানিয়ে দিয়েছি যে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ভিন্ন তাঁর পাসপোর্টে মিশর যাত্রার অনুমতি দান আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

মিষ্টার ক্লাউসন,

আমার ধারণা ভিয়েনার কনসাল এবং প্রাগের ভাইস-কনসাল এই ব্যাপারটিতে অত্যন্ত বোকার মতো কাজ করেছেন। ঐ পাসপোর্টে লাল কালিতে যে মন্তব্য ছিল, সেটাই নিশ্চয়ই যথেষ্ট সতর্কতার কারণ ছিল আর কোন ভবিষ্যত আবেদন সম্পর্কে লণ্ডনকে অবহিত করার জন্য? সাধারণ দৃষ্টিতে সেটা ছিল না এবং আমার পরামর্শ হ'ল সেইভাবে অবহিত করার জন্য একটি পি. ও সার্কুলার এখুনি পাঠান হোক।

রাজনৈতিক কাজে তাঁকে যুক্তরাষ্ট্র কিংবা মিশরে যেতে দেবার কোন কারণ নেই।

স্বাক্ষর: আই. পি. আই

৫. ৭. ৩৩

(আই. ও. আর ফাইল নং এল পি এবং জে।৭।৭৯২, পার্ট ১।১৭৪।১৯৩৫, পৃষ্ঠা ৯৮ এবং পৃষ্ঠা ৯৬)

১৯৩৩ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী এলাহাবাদে সুভাষচন্দ্র বসুকে দেওয়া পাসর্পোটের ভিতরকার বিশদ বিবরণের আসল অনুলিপি:

পাসপোর্ট নং: ৭২৩০-সি

বাহকের নাম: সুভাষচন্দ্র বসু

জাতিগত পরিচয়: জন্মসূত্রে বৃটিশ নাগরিক

বৃত্তি: জনসেবক

জন্মস্থান জন্ম তারিখ : কটক, ভারত, ২৩ শে জানুয়ারী, ১৮৯৭

স্থায়ী বাসস্থান : ভারত

উচ্চতা : ৫ ফুট ৮১/২ ইঞ্চি

চোখের রং : কালো

দৃশ্যগোচর বৈশিষ্ঠ্যপূর্ণ চিহ্ন : কপালের মাঝখানে একটি ছোট কালো গর্ত।

যে সব দেশের জন্য এই পাসপোর্ট কার্যকরী : অষ্ট্রিয়া, ইতালি, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড এবং ভারতে প্রত্যাবর্তন।

বৈধ : ১৯৩৮ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত।

পর্যবেক্ষণ :

পিতার নাম : মিস্টার জানকীনাথ বসু

ভারতে আবাস স্থান : ১, উডবার্ণ পার্ক, কলকাতা

বর্ণ : বাঙালী কায়স্থ হিন্দু

লাল কালিতে অনুমোদন : জার্মানী অথবা যুক্তরাজ্যে প্রবেশের জন্য কার্যকর নয়

(আই. ও. আর ফাইল নং এল. পি. এবং জে।৭।৭৯২ পার্ট ১।১৭৪।১৯৩৫ পৃঃ ১০০।

১৯৩৫ সালে ভিয়েনাতে সি ৯২৮৭ নম্বর যুক্ত একটি নতুন পাসপোর্ট দেওয়া হয় সুভাষচন্দ্র বসুকে)

গোপনীয় ১৪. ৩. ৩৪.

ইউ এস অব এস

এফ. ও

মহাশয়,

এস অব এস ফর আই আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন এস অব এস ফর এফ এর জ্ঞাতার্থে কলকাতার সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে দশ কপি গোপন নোট পাঠানোর জন্য, যাঁর পাসপোর্টের সুযোগের বিষয়ে এই অফিসে চীফ পাসপোর্ট অফিসারের সঙ্গে গত গ্রীষ্মে যোগাযোগ

করেছিলেন। ডিসেম্বরে রোমে অনুষ্ঠিত এশিয়াটিক কংগ্রেসে বসু যোগদান করেছিলেন এবং ঐ উপলক্ষ্যে আতিথেয়তা লাভ করেছিলেন ইতালি সরকারের কাছ থেকে। এটা ধারণা করার কারণ আছে যে তিনি অন্যান্য সরকারের দ্বারা সমাদৃত হবার চেষ্টা করবেন। আমি স্যার জন সাইমনের বিবেচনার্থে জানাতে চাই যে, তিনি ভিয়েনা, বার্লিন, রোম, প্রা :, ওয়ারশ, ব্রাসেলস এবং প্যারী-র, প্রতিটি স্থান সফর করতে পারেন। সেখানকার প্রতিনিধিদের এই নোটের একটি করে কপি পাঠাতে হবে, যাতে তাঁদের কাজের ব্যাপারে সরকারের পরামর্শের প্রয়োজন হলে সেটি তাঁদের গোপন পথনির্দেশের কাজ করে। বসু যে একদিন কলকাতার মেয়র ছিলেন এই ঘটনার ফলে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর পক্ষে সহজ হবে তাঁদের উপর প্রভাব বিস্তার করা যাঁরা তাঁর অতীত ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে অবহিত নন।

স্বাঃ আর. পীল

১ ইউ এস অব এস. এফ ও—আণ্ডার সেক্রেটারী অব স্টেট, ফরেন অফিস।

২ এস ফর এস ফর আই—সেক্রেটারী অব স্টেট ফর ইণ্ডিয়া।

৩ এস অব এস ফর এফ.এ—সেক্রেটারী অব স্টেট ফর ফরেন এ্যাফেয়ার্স

—গ্রন্থাকার।

নকল বৃটিশ দূতাবাস

(ডব্লিউ ৩৭৩৩।২৬৩৪।৫০) বার্লিন

(৩৬৯।২।৩৪) ১৮ই এপ্রিল, ১৯৩৪

প্রিয় দফতর,

আপনাদের ২৩ শে মার্চের ৩৩৭ নং (ডব্লিউ ২৬৩৪।২৬৩৪।৫০) প্রতিবেদন প্রসঙ্গে আপনারা জানতে আগ্রহী হবেন যে মিস্টার সুভাষচন্দ্র বসু সম্প্রতি ড্রেসডেন সফর করছেন। সেখানে 'ড্রেসডেনার এ্যানজাইজারের' এক সংবাদদাতা তাঁর এক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন।

এই সাক্ষাৎকার চলাকালে মিস্টার বসু যদিও ইংল্যাণ্ড সম্পর্কে অত্যন্ত অবন্ধু সুলভ কিছু মন্তব্য করেছেন, তবু পত্রিকাটি সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছে তাঁর

মন্তব্যে, “ড্রেসডেন একটি চমৎকার শহর” এবং তাঁর চমৎকার চেহারার দীর্ঘ বর্ণনার উপর। একবছর আগে তিনি যখন সেখানে ছিলেন তারপর জার্মানীতে যে উন্নতি ঘটেছে তার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করে মিষ্টার বসু মন্তব্য করেছিলেন যে ভারতের অগ্রগতির প্রাথমিক শর্ত হল রাজনৈতিক কর্তৃত্বের স্থান থেকে ইংরেজদের হটিযে দেওয়া। ভারতীয় জনগণের মধ্যে অনেক বিরোধ আছে, কিন্তু এই ধ্বনিটির পিছনে তারা সকলেই অটল যে “ইংল্যাণ্ডকে অবশ্যই চলে যেতে হবে!” জয় এখন কেবল সময় আর অর্থের ব্যাপার। এটিকে বাদ দিলে ভারতীয় আন্দোলনের অনেক কিছুই হিটলার-বাদের সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ; যেমন ফুয়েরারপ্রিনজিপ চালু করা হয়েছে এমন ভাবে যে প্রত্যেক প্রদেশেই একজন ফুয়েরার রয়েছে (sic)।

মিস্টার বসু ভারতে বৃটিশ পণ্য বর্জনের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে জার্মানীর রপ্তানীকারকদের সুযোগের বিষযে বার্লিনেব অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। জার্মানীর সমস্ত প্রধান শহরে অবস্থানরত আন্দোলনের স্থানীয় প্রতিনিধিদের দেখবার জন্য তিনি সাধারণ ভাবে এক সফর করেন। তাঁকে বর্তমানে স্বাস্থ্য বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে আগ্রহী বলেও মনে হয়।

শোনা যাচ্ছে মিস্টার বসু শুক্রবার দিন প্রাগের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। সেখান থেকে তিনি যাবেন ভিয়েনা, জেনিভা, বলকান অঞ্চলে। সেখানে কিছুকাল থাকবার ইচ্ছা আছে তাব।

ওয়েস্টার্ন ডিপার্টমেণ্ট, একান্ত আপনার
ফরেন অফিস চ্যানসেরী

(আই. ও. আর ফাইল ন এল/পি, জে/৭/৭৯২ পৃঃ ৭৭-৭৯)

নকল বৃটীশ লীগেশন
(ডব্লিউ ৪৩৬৮।২৬৩৪।৫০) ভিয়েনা
২০ শে এপ্রিল, ১৯৩৪

প্রিয় কেনড্রিক,

ভিয়েনার ওয়েস্টারাইখসিখ অউসলানডিসচার ষ্টুডেনটেন ক্লাবের (Oesterreichisch-Auslandischer Studenten Klub) ১৯৩৪ সালের

মার্চে প্রকাশিত বাৎসরিক রিপোর্টে মিস্টার কে. এস. গায়রোলার (যাঁর জাতিগত পরিচয় আমার কাছে পরিষ্কার নয়) একটি রচনা ৩২ পৃষ্ঠায় রয়েছে বলে আপনি দেখতে পারেন। তাতে ভিয়েনায় হিন্দুস্থান একাডেমিকাল এ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে উপরি-উক্ত স্টুডেন্ট্স ক্লাবের যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টার ইঙ্গিত রয়েছে,—যার সদস্যদের মধ্যে রয়েছে ব্রিটিশ ছাত্র, এবং লীগেশন যাঁদের সাহায্য করার চেষ্টা করছেন।

গায়রোলার রচনাটি আরো প্রকাশ করেছে যে ভিয়েনার হিন্দুস্থান এ্যাকাডেমিকাল এ্যাসোসিয়েশনটি রয়েছে কলকাতার প্রাক্তন মেয়র সুভাষচন্দ্র বসুর হাতে, এবং আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আজ জীবিত সর্বাধিক ব্রিটিশ বিরোধীদের অন্যতম তিনি। আপনার স্মরণ থাকতে পারে যে গত বছর কিংবা তার আগের বছর বিদেশে ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান স্টুডেন্ট্স-এর প্রধান দফতর লণ্ডন থেকে ভিয়েনায় স্থানান্তরিত করার আপাত-উদ্দেশ্য নিয়ে বসু ভিয়েনায় ছিলেন। এই স্থানান্তকরণের উদ্দেশ্য পরিষ্কার এবং তাঁর কাজকর্ম যথাসম্ভব সংযত করা বিশেষভাবে কাম্য।

আপনি কি এ্যাসোসিয়েশনের প্রতি পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে পারেন, পারেন তাঁদের দিয়ে ও. এ এস. কে-এর কাছে এইচ. এ. এ ভি-র সঙ্গে তাদের জড়িত হবার বিপদ সম্পর্কে সতর্কবার্তা পাঠাতে? এই কাজের ন্যায্যতা প্রমাণের জন্য আপনি যদি কোন পুলিশ রিপোর্ট সংগ্রহ করতে পারেন, তবে স্টুডেন্ট্স ক্লাবের সেক্রেটারীকে আমি জানাতে চাইব যে এইচ. এ. এ. ভি-র সঙ্গে তাঁরা সম্পর্ক ছিন্ন না করলে লীগেসনের কাছ থেকে তাঁরা আর কোন সাহায্য কিংবা সহানুভূতি আশা করতে পারবেন না। কিন্তু প্রথমেই আমাদের দরকার প্রমাণ করার মতো যথেষ্ট তথ্য, যাতে এই প্রসঙ্গে এইচ. এ. এ. ভি., মিস্টার এইচ. এম. গায়রোলার এবং মিস্টার বসুর কাজকর্মকে জড়িয়ে ফেলা যায়। এটাও জানা দরকার যে আমাদের বন্ধু মিস্টার অগ্নিহোত্রী কোনভাবে এই সংগঠনের সঙ্গে জড়িত কিনা।

এই চিঠির সঙ্গে পাঠানো সাময়িক পত্রিকার সংখ্যাটি দয়া করে ফেরত পাঠাবেন।

স্বাঃ আর. এইচ. হ্যাডাও

ক্যাপটেন টি. জে. কেনড্রিক
পাসপোর্ট কণ্ট্রোল
ভিয়েনা।

বুদাপেস্ট প্রতিবেদন নং ১২৬, ১২ই মে, ১৯৩৪-এর অন্তর্ভুক্ত 'পেস্টার লয়েডে' প্রকাশিত মিস্টার সুভাষচন্দ্র বসুর সাক্ষাৎকার—৯ই মে, ১৯৩৪।

যুদ্ধের সময় থেকে স্বরাজপার্টি গঠনের রূপরেখা এবং যে পরিস্থিতিতে দল পুনরায় কংগ্রেসের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়, তার বিশ্লেষণ শুরু করেন মিস্টার বসু।

স্বরাজপার্টির নবনির্বাচিত সভাপতি ডাক্তার আনসারির রাজনৈতিক আদর্শের বিষয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে মিস্টার বসু বলেন যে, তিনি একজন মুসলমান এবং গান্ধীর মতোই একজন মধ্যপন্থী। দলের মধ্যপন্থী অংশও অবশ্য ইংরেজের শ্বেতপত্রে উল্লিখিত সাংবিধানিক প্রস্তাব গ্রহণের বিরোধী। এমনকি মধ্যপন্থীদের লক্ষ্যও ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা. "কিন্তু", মিস্টার বসু আরো বলেন, "আমরা এই তরুণেরা আরো বেশী সক্রিয় পদ্ধতির পক্ষে।"

জাতীয় আন্দোলনে গান্ধীর ভূমিকা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মিস্টার বসু বলেন যে. গান্ধীর প্রভাব দুটি ভিন্ন উপাদানে গঠিত; একদিকে তাঁর জীবন্ত উদাহরণ এবং তাঁর চরিত্র আর অন্যদিকে তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ। তাঁর সৎ এবং মহিমাময় চরিত্র ভারতীয় জনগণের কাছে সর্বদাই এক দৃষ্টান্তস্বরূপ। তাঁর রাজনীতি সম্পর্কে অবশ্য জাতীয় আন্দোলনের অনেক সদস্য মনে করেন যে আরো বৈপ্লবিক এবং আপোসহীন মনোভাবের প্রয়োজন। অহিংসার প্রতি গান্ধীর অটল বিশ্বাস, তাঁর মহান চরিত্র এবং তাঁর সততাকে কেবল নিজ উদ্দেশ্যসাধনে ব্যবহার করেছে ইংরেজ।

জাতীয় আন্দোলন, সমস্ত উপায়, এমনকি বৈপ্লবিক উপায়কেও লক্ষ্য অর্জনের জন্য ন্যায্য বলে মনে করে কিনা জানতে চাওয়া হলে মিস্টার বসু উত্তর দেন, "হাঁ, ইংরেজের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য সমস্ত উপায়ই ন্যায্য এমন কি বিপ্লব এবং হিংসাও। একটি বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান অবশ্য আজ কোন উদ্দেশ্যসাধন করবে না। এই মুহূর্তে আমরা বিশ্বাস করি যে পার্লামেণ্টারী পদ্ধতিতে আমরা আমাদের কাম্য বহু কিছু অর্জন করতে পারব।"

"অস্পৃশ্যতা" সম্পর্কে বসু ঘোষণা করেন যে, তিনি এবং তাঁর গোষ্ঠী এবিষয়ে গান্ধীর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত যে সমস্ত জাতপাতের বিভেদ দূর করা

উচিত। প্রতিক্রিয়াশীলরাই কেবল এখনও অস্পৃশ্যতাকে সমর্থন করে এবং একাজে তারা নিজেদের শক্তি সম্পর্কে আস্থাশীল ; কারণ তারা জানে যে ইংরেজ তাদের পিছনে রয়েছে। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের ইচ্ছা সম্পর্কে ইংরেজদের দাবি এমনকি তাঁদের জাতিচ্যুতের প্রতি ভোটাধিকার বিস্তৃত-করণের দাবিকেও নস্যাৎ করে মিস্টার বসু মন্তব্য করেন যে, সরকারী ব্যবস্থার উদ্দেশ্য একটি সমাধানকে বিলম্বিত করা। অস্পৃশ্যদের মন্দিরে প্রবেশের বাধা দূর করার জন্য একটি প্রস্তাব ইতিমধ্যে দেড় বৎসরকাল যাবৎ কেন্দ্রীয় পালার্মেন্টের সামনে রাখা রয়েছে, কিন্তু এখনও তা বিধিবদ্ধ হবার অপেক্ষায়। ইংরেজরা যদি প্রকৃতই অস্পৃশ্যতা প্রথার বিরোধী হতেন, তাহলে প্রস্তাবটি বহুদিন আগেই অনুমোদিত হতো। আসলে ভারতীয়দের বিভক্ত করে রাখার যে কোন উপায়ই ইংরেজদের পক্ষে অত্যন্ত ভাল।

হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে অনৈক্যের ফলে স্বাধীন ভারতকে অসুবিধার মধ্যে পড়তে হবে কিনা জানতে চাওয়া হলে মিস্টার বসু দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে ভারত স্বাধীন হলে সমস্যাটির সমাধানে সক্ষম হবে। ধর্মীয় অনৈক্যকে ইংরেজরা কৃত্রিম উপায়ে বাড়িয়ে তুলেছে ভারতীয় জনগণের মধ্যে ঘৃণা এবং বিভেদের বীজ বপন করার জন্য। উদাহরণস্বরূপ, এটা প্রমাণিত ঘটনা যে, শুয়রের শব ছড়িয়ে মসজিদকে কলুষিত করার মধ্যে যে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ শুরু হয়েছে, তা অধিকাংশ সময় সংগঠিত হয়েছে সরকারী কর্তৃপক্ষের উৎসাহে। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতার জন্য ভারতীয়দের শেষ মহাসংগ্রামের মতোই হিন্দু এব মুসলমানরা জাতীয় আন্দোলনে পাশাপাশি লড়াই করছে।

কমিউনিস্টদের কুখ্যাত অভিযোগ যে গান্ধী এবং তাঁর রাজনৈতিক বন্ধুরা মোটা পুঁজিবাদী ভিন্ন আর কিছু নন এবং তারা চাইছেন ভারতীয় সর্বহারাদের শোষণ করতে, এ সম্পর্কে সাক্ষাৎ-গ্রহণকারী তাঁকে প্রশ্ন করলে মিস্টার বসু উত্তর দেন যে, তিনি যে দলে রয়েছেন তা একটি জনগণের দল। এর নেতারা, তিনি বলেন, পুঁজিবাদী নন; বরং গান্ধীর মতোই তাঁদের কোন পার্থিব চাহিদা নেই এবং নিজেদের জন্য সম্পদ জমিয়ে তোলার কোন ইচ্ছাও নেই তাঁদের। তাঁদের অভিলাষ প্রতিটি ভারতীয় একটি স্বাধীন দেশে

নিজেকে মুক্ত মনে করুক। এটা স্বাভাবিক ভাবেই ইউরোপীয় মানদণ্ডে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মসূচীকে মাপা। তাঁরা অবশ্য শ্বেতকায় দেশগুলির সমস্ত রাজনৈতিক প্রবণতার ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ করছেন। উদাহরণস্বরূপ, তাঁদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে যে, তাঁদের এক ব্যাপক অর্থনৈতিক কর্মসূচী ইতিমধ্যে প্রস্তুত রাখা দরকার। সেটা সেই ভবিষ্যৎ দিনের জন্য যেদিন তাঁরা ক্ষমতা দখল করবেন। এই ভাবে তাঁরা পরিকল্পিত অর্থনীতির জন্য সমস্ত ধরনের প্রচেষ্টায় আগ্রহী—তা সে ইউরোপীয় কিংবা মার্কিনী হোক না। তাঁরা অবশ্য কমিউনিজম চান না, কারণ তা ভারতীয় জনগণের চরিত্র এবং স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

হাঙ্গেরী এবং ভারতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতির এক সাদৃশ্য টেনে মিস্টার বসু তাঁর বক্তব্য শেষ করেন। তিনি বলেন যে, স্বাধীনতার জন্য হাঙ্গেরী বিভিন্ন সংগ্রাম সম্পর্কে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা অত্যন্ত আগ্রহী। উদাহরণস্বরূপ তাঁরা বিশেষ ভাবে পড়াশুনা করেছেন কোসুথের (Kossuth) রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে। হাঙ্গেরীর যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি সম্পর্কেও তাঁদের যথেষ্ট সহানুভূতি রয়েছে। শান্তি-সম্মেলনের দিকে ভারত এই আশা নিয়ে তাকিয়ে আছে যে এটি একটি নতুন এবং ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থার প্রবর্তন করবে। চুক্তিসমূহ অবশ্য ভারতে কোন প্রগতি ঘটাতে সক্ষম হয় নি। ফলে ভারতীয়রা তেমন কোন ব্যবস্থার বিরোধী, যা হাঙ্গেরীর উপর অমন ভয়ংকর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে।

(আই. ও. আর. ফাইল নং এল / পি জে / ৭ ৭৯২)

নকল

(ডব্লিউ ৪৯০৫/২৬৩৮/৫০)

ব্রিটিশ লীগেশন
প্রাগ
১৫ই মে, ১৯৩৪

প্রিয় ওরমি,

আপনার গত ২৩শে মার্চের ৫৬নং গোপন প্রতিবেদনে (ডব্লিউ ২৬৩৪/২৬৩৪/৫০) সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে যে বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন তা মিশনগুলিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে গোপন নির্দেশ হিসেবে যদি

কোন রাষ্ট্র বোস সংক্রান্ত ব্যাপারে আমাদের দূতাবাসের পরামর্শ প্রার্থনা করে।

৪ঠা মে বসু প্রাগে ছিলেন (আমি যতদূর জানি হয়তো এখনও আছেন)। উক্ত দিনে তিনি 'চেকোশ্লোভাকিয়া এবং ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের উন্নতির জন্য' গঠিত একটি ক্লাবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং ভারতের পক্ষ থেকে ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউটের ডাক্তার লেসনীর উদ্বোধনী ভাষণের উত্তর দিয়েছিলেন। লেসনী একজন ভয়ংকর ব্রিটিশবিরোধী (এবং একজন গাধা -অবশ্য দুটি সর্বদাই মিশ খায়)।

ঘটনাচক্রে ভাইস্ কনসাল ফ্রান্সিস্ সেখানে ছিলেন এবং আমাকে জানিয়েছেন যে বসু যদিও সরাসরি শত্রুতামূলক কিছু না বলার ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন, তাঁর সমগ্র ভাষণের ভাবটি ছিল যে, স্বাধীনতার জন্য লড়াইয়ে ব্রিটিশ ভারতের অবস্থা 'তার অস্ট্রিয়ান অত্যাচারীদের' অধীনে চেকোশ্লোভাকিযার পূর্বেকার অবস্থার মতোই।

এই অর্থহীন বিষযে দৃষ্টি দেওয়া অবশ্যই আমাদের পক্ষে সম্মানহানিকর হবে—বিশেষত এমন এক পরিস্থিতিতে, যা হাস্যকর, —সুতরাং এর মূল্যানুযাযী আমি আপনাকে তথ্যটুকু জানালাম মাত্র।

আপনার একান্ত,

স্বাঃ জোশেফ এডিশন

ও.জি. সারজেণ্ট. সি.এম জি.
ফরেন অফিস
এস ডব্লিউ --১

(আই. ও আর ফাইল নং এল/পি জে/৭/৭৯২)

রুমানিয়া থেকে

তারবার্তা (সাংকেতিক ভাষায় নয়), মিস্টার প্যালেইরেৎ কর্তৃক প্রেরিত (বুখারেস্ট)।

প্রেরণ : ১৫ই মে, ১৯৩৪ (ডাক মারফত)

গ্রহণ : ১৭ই মে, ১৯৩৪।
নং ৪৩
সেভিং

আজকের সকালের 'ডিমিনিয়েৎসা' খবর দিচ্ছে সুভাষচন্দ্র বসু এক সপ্তাহের সফরে বুখারেস্টে এসে পৌঁছেছেন ; সঙ্গে রয়েছেন একজন 'সামরিক চিকিৎসক' এবং একজন 'মোহসৃষ্টিকারী শিল্পী', নাম কিঙ্। একই পত্রিকায় মুদ্রিত এক সাক্ষাৎকারে সুভাষচন্দ্র বসু বলেছেন যে, তিনি একসময় কলকাতার মেয়র ছিলেন। তাঁকে ছত্রিশ বছর বয়স্ক বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের চরমপন্থী-গোষ্ঠীভুক্ত, যাঁরা ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সর্বাধিক সক্রিয় পদ্ধতি অনুসরণ করতে চান। তিনি কৌশলগত ব্যাপারে স্বরাজপার্টি এবং গান্ধীর অনুগামীদের মতপার্থক্য বিশ্লেষণ করেছেন : তাঁর দল সহিংস প্রক্রিয়া প্রচার করে কিনা জানতে চাওয়া হলে তিনি উত্তর দেন যে ইংরেজ শাসন থেকে ভারতকে মুক্ত করার জন্য প্রতিটি পদ্ধতিই ভাল, এমনকি শক্তি-প্রয়োগও ; যদিও এই মুহূর্তে তিনি বিশ্বাস করেন যে পার্লামেণ্টারী কাজকর্মের মধ্য দিয়েই উন্নতি অর্জন করা যাবে। তিনি বলেন যে, মসজিদের উপর আক্রমণ করে এবং মুসলমানদের উপর শব নিক্ষেপ করে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে গণ্ডগোলের উস্কানি দেওয়া হয়েছিল, তা হয়েছিল ব্রিটিশ কতৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায়, হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের উত্তেজিত করবার জন্য। ভারতে ধর্মীয় অনৈক্যকে ইচ্ছাকৃত ভাবে উৎসাহিত করেছে ইংরেজ।

আমি তাঁর এখানকার কাজকর্ম সম্পর্কে আরো তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করব।

(আই. ও. আর ফাইল নং এল/পি জে/৭/৭৯২)

নং ১১৪ বেলগ্রেড
(১৪৬/৩/৩৪) ৯ই জুন, ১৯৩৪

মহাশয়,

আপনার ২৫শে এপ্রিলের (ডব্লিউ ৩৭৩৩/২৬৩৪/৫০) ১১০নং

প্রতিবেদন অনুসারে আমি আপনাকে জানাতে চাই যে, কলকাতার সুভাষচন্দ্র বসু ২৮শে মে থেকে ৩রা জুন পর্যন্ত বেলগ্রেড সফর করেছিলেন।

২. আমি যতদূর জানতে পেরেছি তাতে বসুর এখানকার অধিকাংশ সময় কেটেছে শ্রমিক কর্মচারীদের কল্যাণসংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠন সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের কাজে। প্রকাশ্য কথাবার্তায় সরকারের সমালোচনার ব্যাপারে তাঁকে অত্যন্ত সর্তক বলে মনে হয়েছে। ভারতীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর মতামত সীমিত রেখেছিলেন গান্ধী সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা প্রকাশের মধ্যে এবং এটি প্রকাশ করতে যে গান্ধীর আন্দোলন ক্রমশ শক্ত ঘাঁটি অধিকার করছে।

৩. বসুব পৌছানর সংবাদ পাবার পর আমি বৈদেশিক মন্ত্রীর দফতরের রাজনৈতিক পরিচালকমণ্ডলীর কাছে তাঁর অতীত বৃত্তান্ত জানাবার সুযোগ গ্রহণ করেছি। ফলে সংবাদপত্রগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে কেবলমাত্র বেলগ্রেডে তাব উপস্থিতির সংবাদের মধ্যেই যেন তাঁদের খবর সীমিত রাখা হয়। আমি অনুধাবন করতে পেরেছি যে তাঁর সফরের প্রচাবেব অভাবে তিনি তিক্ত হতাশা নিয়ে যুগোশ্লাভিয়া ত্যাগ করেছেন।

সশ্রদ্ধ নমস্কাব জানিবেন,

দি রাইট অনারেবল্ স্যার জন সাইমন, জি সি এস. আই, কে. সি. ভি. ও, ইত্যাদি ইত্যাদি

মহাশয়,
আপনাব একান্ত অনুগত
(সম্মানীয় মন্ত্রীব পক্ষে)
স্বাক্ষর :

(আই. ও. আর ফাইল নং এল/পি জে/৭/৭৯১)

নং ১৪১
(১৩৯/৪/৫৭)

ব্রিটিশ লীগেশন
সোফিয়া
১০ই জুন, ১৯৩৭

মহাশয়,

সুভাষচন্দ্র বসুর গতিবিধি সম্পর্কে আমার ২৬শে মে-র ১২৬নং প্রতিবেদন অনুসাবে আমি খবর দিতে চাই যে, দশদিন আগে এখানকার গ্রীক লীগেশন থেকে এই ব্যক্তিটি সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ

পেয়েছি। উক্ত ব্যক্তি এথেন্সে গ্রীক কর্তৃপক্ষকে দেবার জন্য তাঁকে একটি পরিচয়পত্র দিতে আবেদন জানিয়েছেন।

২. আপনার ২৫শে এপ্রিলের ৯২ নং প্রতিবেদনে (ডব্লিউ ৩০৩৩/২৬৩৪/৫০) উল্লিখিত গোপন তথ্যটি সেইমতো গোপনে গ্রীক লীগেশনের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁরা মিস্টার বসুকে জানিয়েছেন যে, তিনি নিজেই যেন এখানে অথবা এথেন্সে গ্রীক লীগেশনকে তাঁর পরিচয় জানান। তিনি তা করতে অস্বীকার করেছেন এবং জানিয়েছেন যে তিনি তাঁর ভ্রমণসূচী থেকে এথেন্সকে বাদ দেওয়াটাই পছন্দ করবেন।

৩. আমি জানি যে তিনি ২৯শে মে সোফিয়া ত্যাগ করে ভিয়েনার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান।

৪. গত রাত্রে আমার কর্মীদের একজন অশ্বারোহী পুলিশের প্রধানের সঙ্গে সন্ধ্যাটি অতিবাহিত করেছিলেন। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এই অফিসারটি সুভাষচন্দ্র বসুর সোফিয়ায় কাজকর্ম সম্পর্কে তাঁকে জানান। তিনি যা জানিয়েছিলেন তার একটি নোট আমি সঙ্গে পাঠালাম।

৫. এই প্রতিবেদনের একটি কপি আমি এথেন্স এবং ভিয়েনায় প্রতিনিধিদের কাছে পাঠাচ্ছি।

আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিবেন,

মহাশয়,

আপনার একান্ত অনুগত,
সি. এইচ. বেনটিংক

দি রাইট অনারেবল
স্যার জন সাইমন,
জি সি. এস আই, কে. সি. ভি. ও
ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি
(আই. ও. আর ফাইল নং এল/পি জে/৭/৭৯২)

সোফিয়া প্রতিবেদনের (নং ১৪৫, ১০ই জুন, ১৯৩৪) সংযুক্ত অংশ।

নোট

মিস্টার বসু স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কিছুটা দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি যেহেতু 'ব্রিটিশ প্রজা' তাই তাঁরা তাঁকে সরিয়ে দিতে

চাইছিলেন না। যাই হোক, তিনি নিহত বিপ্লবীদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত সমস্ত সমাধি, স্মৃতিসৌধ ইত্যাদি পরিদর্শন করেন। সোফিয়ায় দুটি স্থানে তিনি বিশ মিনিট থেকে আধঘণ্টা পর্যন্ত বক্তৃতা দেন। তিনি সংরক্ষিত পাঁচ হাজার অফিসার সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছিলেন, যাঁরা যুদ্ধে লড়াই করেছেন, এবং এখন বৈপ্লবিক কৌশল অনুসরণ কবতে প্রস্তুত। তিনি বুলগেরিয়ান, ফরাসী এবং জার্মান ভাষায় রচিত মার্কসবাদী সাহিত্য বাক্সবন্দী করে নিয়ে গেছেন। তিনি প্রকাশ্যেই বলেছেন যে গান্ধীর শিগ্‌গীরি মৃত্যু হবে এবং তিনিই তাঁর স্থান দখল করবেন···ভারত একটি বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত·· তবে সম্ভবত দু'একটি বছর কেটে যেতে পারে ভারতে চল্লিশ কোটি মানুষ রযেছেন, তার পনের কোটিকে ব্রিটিশ শাসনের কবল থেকে ভাবতেব মুক্তির জন্য লডাইযে জীবন বলিদান কবতে হতে পারে।

বিববণী দলিল পাবলিক এণ্ড জুডিসিয়াল ডিপার্টমেন্ট

স্যার এফ. স্টিউয়ার্ট

এস অব এস। (প্রেরণের পর)

ইউ এস অব এস

স্বা: ।১ ১২ :৪

এই তারবার্তা ইঙ্গিত করে যে ভারতসরকার পূর্ববর্তী তারবার্তার ধারণা অনুযায়ী সুভাষ বসুর প্রতি তেমন কঠোরভাবে ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে চাইছেন না। তাঁরা তাঁকে তাঁর পিতাকে দেখতে যেতে দিতে প্রস্তুত এবং পিতার মৃত্যু হলে অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানেও তাঁব যোগদানের অনুমতি দিতে রাজী এবং এই উদ্দেশ্যে তাকে 'প্যারোলে' বিশেষভাবে মুক্তি দেওয়া যেতে পারে রেগুলেশান থ্রি মোতাবেক তাকে গ্রেফতার করার পর। (এটা পরিষ্কার যে বসুর নিকট বৈধ পাসপোর্ট থাকায় পাসপোর্ট আইনে তাঁকে গ্রেফতার করার কোন প্রশ্নই ওঠে না)। ভারত সরকার বাংলা সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছেন যে, সুভাষ বসুর প্রতি যেন তাঁর ভাই শরৎ বসুর মতোই একই আচরণ প্রদর্শন করা হয়। প্রথম আগমনেই সুভাষ বসুকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া সম্ভব হবে কিনা সে সম্পর্কে তাঁরা সন্দিহান। তবু তাঁরা বাংলার সরকারের সঙ্গে আলোচনা করছেন এবং প্রস্তাবিত আচরণের যৌক্তিকতায়

সন্ত্রাসবাদী পরিস্থিতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আরো কিছু ধারণা দেবার জন্য অনুরোধ জানিয়াছেন। বন্দী করে রাখার পরিবর্তে সুভাষ বসুকে ইউরোপে ফিরে যাবার অনুমতি না দেবার ভারত সরকারের প্রস্তাবটি এই সমস্যার এক মনোমত সমাধান বলে মনে হয়। এটা সত্যিই নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে তাঁকে কোন প্রকার স্বাধীনতা প্রদানের ব্যাপারে বাংলা সরকার সম্মত হবেন না। শরৎ বসুকে আটক করাই যখন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে তখন, তাঁর আরো ভয়ংকর ভাইটিকে, তাঁর আগমনে, পূর্ণ স্বাধীনতা দেবার কোন যুক্তি নেই—অন্তত অল্প সময়ের জন্যে হলেও।

আমরা এখন খবর পেয়েছি যে, সুভাষ বসু প্রকৃতই ডাচ্ এয়ারলাইনে রোম ত্যাগ করেছেন এবং সবকিছু ইঙ্গিত করে যে তিনি স্বল্পসময়ের জন্য ভারতে অবস্থান করতে মনস্থ করেছেন। তিনি যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ভিয়েনাতে ফিরে যাবেন।

সুভাষ বসু রওনা হযেছেন বলে ভারতসরকারকে জানিযে পাঠানো একটি খসড়া-তারবার্তা এবং তাঁর সঙ্গে আচরণ সম্পর্কে তাঁদের প্রস্তাব গ্রহণ করে তা পেশ করা হয়েছে।

স্বাঃ আর. শীল

৩০।১১

(আই. ও আর ফাইল ন এল। পি এণ্ড জে।৭।৭৯৩)

সুভাষচন্দ্র বসু

১৯৩৬ সালের মার্চ মাসে সুভাবচন্দ্র বসুর বিরুদ্ধে প্রস্তুত মামলা সম্পর্কে দফতবের নোট সংযুক্ত করা হয়েছে।

১৯২২ সালের শুরুতে একটি বেআইনী সংগঠনের পরিচালন পবিষদে অংশগ্রহণ এবং সাহায্য করার দায়ে সুভাষ বসু ছ'মাস কারাবাস যাপন করেন। পরবর্তী কালে তিনি সন্ত্রাসবাদীদের যুগান্তরগোষ্ঠীর সুপরিচিত নেতা হয়ে ওঠেন। ১৯২৪ সালে এই গোষ্ঠী কর্তৃক পুনরায় শুরু-করা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের পিছনে ছিলেন তিনি। ফলে ১৯২৪ সালের অক্টোবরে তিনি গ্রেফতার হন এবং ১৮১৮ সালের বেঙ্গল রেগুলেশনে থ্রি অনুসারে আটক

থাকেন। তাঁর প্রতিষ্ঠার পরিপ্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে তাঁর বিষয়টি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পর্যালোচনা করে দেখা হয়। কিন্তু পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে তাঁকে বন্দী না করলে সাফল্যের সঙ্গে যুগান্তরের কার্যকলাপের মোকাবিলা করার কোন আশা নেই। ১৯২৭ সালের মে মাসে তিনি স্বাস্থ্যের কারণে মুক্তি লাভ করেন এবং তৎক্ষণাৎ সরকার-বিরোধী প্রচারে অংশ নেন - প্রথমে সন্ত্রাসবাদীদের এবং পরে আইন অমান্য আন্দোলনের পক্ষে। দ্বিতীয় আন্দোলনে তাঁর কার্যকলাপ তাঁকে ১৯৩০ এবং ১৯৩১ সালে তিনটি ভিন্ন কারাবাসের শাস্তিগ্রহণে বাধ্য করে। এই সময় কলকাতার মেয়র হিসাবে তাঁর নির্বাচন তাঁকে প্রভাবশালী করে তোলে এবং তিনি দ্রুত এর সুযোগ গ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা কর্পোরেশনে সক্রিয় সন্ত্রাসবাদীদের নিয়োগের ব্যবস্থা করেন, বিশেষ করে কর্পোরেশনের ইস্কুলে শিক্ষক-কর্মচারী-পদে। এইভাবে সন্ত্রাসবাদী দলের কর্মী সংগ্রহের সুযোগ করে দেন। সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে তাঁর এই ধারাবাহিক সংযোগের ফলে রেগুলেশন থ্রি-য়ের অধীনে তার পুনঃগ্রেফতারের বিষয়টি বহুবার বিবেচনা করে দেখা হয় এবং সবশেষে ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাসে। এরপর শীঘ্রই স্বাস্থ্য গোলমাল করতে শুরু করে এবং১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারীতে তাঁকে চিকিৎসার জন্য ইউরোপে আসার অনুমতি দেওয়া হয়। ১৯৩৪ সালে বসুর পিতা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তার মায়ের প্রেরিত এক তারবার্তার উত্তরে নভেম্বরের শেষে তিনি ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পিতার মৃত্যুর পর ১৯৩৫-এর-জানুয়ারীতে বসু ইউরোপে প্রত্যাবর্তন করেন এবং আয়ারল্যাণ্ডে এক সফরের পর ১৯৩৬-এর শুরুতে বাডগাষ্টাইনে চূড়ান্ত পর্যায়ের ডাক্তারী চিকিৎসার জন্য তিনি অস্ট্রিয়ায় চলে যান। ১৯৩৬ সালের শুরুতে খবর পাওয়া যায় যে বসু ভারতে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ভারত এবং বাংলা সরকারের মধ্যে আলাপ-আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে ভারতে তাঁকে স্বাধীনতা প্রদান এক অসম্ভব ব্যাপার। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে আয়ত্তে আনা গিয়েছিল। কিন্তু এবিষয়ে একমত হওয়া গেল যে ভারতের যে কোন স্থানে বসুকে স্বাধীনভাবে থাকতে দিলে তিনি অনতিবিলম্বে বৈপ্লবিক

কার্যকলাপের কেন্দ্র হয়ে উঠবেন, যা বাস্তবিকপক্ষে উন্নত পরিস্থিতিকে নিশ্চিতভাবে খারাপ করে তুলবে। সরকার সম্পর্কে তাঁর মনোভাবের যে পরিবর্তন ঘটেনি তার প্রমাণে একটি প্রচারপত্রে পাওয়া গিয়েছে; ভিয়েনাতে ডাকে ফেলা এবং বসুর হাতের লেখা ঠিকানাযুক্ত তার একটি কপি আটক করা হয়েছে। এটা সন্দেহ করার যথেষ্টই কারণ রয়েছে যে প্রচারপত্রটি বসুই রচনা করেছিলেন। অবস্থা সম্পর্কে যাতে তাঁর কোন ভুল ধারণা না হয় তাই ভিয়েনায় কন্‌সালকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে তিনি যেন তাঁকে সতর্ক করে দেন যে ভারতে প্রত্যাবর্তন করলে তিনি স্বাধীনজীবন যাপনের আশা করতে পারবেন না। এই সতর্কবাণী সত্ত্বেও তিনি ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং ১৯৩৬ সালের ৮ই এপ্রিল পৌঁছানর সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার হন। তিনি বোম্বাইয়ের আর্থার রোড জেলে আটক থাকেন। ১৩ই এপ্রিল তিনি পুণার ইয়ারভেদা সেণ্ট্রাল জেলে বদলী হন এবং ২০শে মে তাঁকে হাজত থেকে মুক্তি দিয়ে কার্শিযাঙের কাছে গিদ্ধা পাহাড়ে তাঁর ভাইয়ের বাড়িতে অন্তরীণ রাখা হয়। বাংলা সরকার অবশ্য খুশী হয়েছিলেন যে তাঁদের তৈরী নিয়মাবলী যা তাঁর ভাই শরৎ বসুর উপর চাপানো হয়েছিল. তিনি তা সম্মানজনকভাবে মেনে চলবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। নিয়মগুলির একটি কপি এর সঙ্গে যুক্ত করা হ'ল। সংক্ষেপে সেই নিয়ম অনুসারে তাঁকে তাঁর ভাইয়ের বাড়ির চারপাশের এক মাইলের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে বলা হয়েছিল; দার্জিলিং-এর সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট অব্ পুলিশের অনুমতি ভিন্ন কার্শিয়াঙে কারো সঙ্গে যোগাযোগ করা নিষিদ্ধ ছিল: পুলিশসুপার তাঁর সমস্ত চিঠি সেন্সর করতেন। সরাসরি কিংবা পরোক্ষে কোন জনসংযোগমূলক কাজকর্ম অথবা রাজনৈতিক আন্দোলনে তাঁর অংশগ্রহণ করা কিংবা সংবাদপত্রে রচনা পাঠানো নিষিদ্ধ ছিল। গিদ্ধা পাহাড়ে তাঁর ভাইয়ের বাড়িতে অন্তরীণ থাকাকালে ভারত সরকার বাংলা সরকারের সুপারিশক্রমে তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটাতে মাসিক ২৫০ টাকার এক ভাতা মঞ্জুর করেছিলেন তাঁর জন্য। ভাতাদান শুরুর সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছিল ১৯৩৬ সালের ১৫ই মে থেকে।

১৯৩৬ সালের ৩০শে অক্টোবরের এক পত্রে ভারত সরকার স্যার

নীলরতন সরকারের বসুর স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ১৯৩৬ সালের ৯ই সেপ্টেম্বরের এক যুগ্মরিপোর্ট প্রেরণ করেন। তাতে বলা হয় যে ১৯৩৬-এর ৯ই সেপ্টেম্বর তাঁকে পরীক্ষা করা হয় এবং দেখা যায় যে তাঁর কার্শিয়াঙে আগমনের পর থেকে তিনি সাত পাউণ্ড ওজন হারিয়েছেন। সন্ধ্যের দিকে তাঁর সামান্য জ্বর হয়, শরীরের ভিতরে অনেক যন্ত্রণা, একটি ফুস্‌ফুসে ঘর্ষণজনিত শব্দ (বাহ্যত তাকে যক্ষ্মা বলে নির্ণয় করা হয়নি) পাওয়া যায়। আর সেই সঙ্গে তাঁর টন্‌সিলও খারাপ অবস্থায় রয়েছে। রিপোর্টে আরো প্যাথোলজিকাল, ব্যাক্‌টেরিওলজিকাল এবং এক্সরে পরীক্ষার সুপারিশ করা হয়। ১৯৩৬ সালের ৫ই অক্টোবর লেজিস্‌লেটিভ এসেমব্লিতে এক প্রশ্নের উত্তরে স্যার হেনরী ক্রেইক বলেন যে সরকার "আরো এক রিপোর্টের অপেক্ষা করছেন, এবং চিকিৎসকেরা যদি তাঁকে কলকাতায় পাঠাতে বলেন, তবে তা করা হবে।"

লর্ড হে-র উত্থাপিত প্রস্তাবের প্রথম বিষয়টি সম্পর্কে এক এসেমব্লি প্রশ্নের উত্তরে ১৯৩৬-এর ৩১শে আগস্ট স্যার এইচ. ক্রেইক বলেন যে জনস্বার্থে যতদিন প্রয়োজন ততদিন বসুকে আটক রাখা হবে এবং সরকারের মতে জনস্বার্থে এখনও তাঁর মুক্তির যৌক্তিকতা নেই। দ্বিতীয় প্রশ্নটির, যে আসন্ন নির্বাচনে তাঁকে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হবে কিনা, মোটামুটি উত্তর ছিল যে, কার্শিয়াংএ তাঁর ভাইয়ের বাড়িতে রাজবন্দী থাকাকালে তাঁর উপর জারী করা বিধান অনুসারে তাঁর প্রকাশ্যে কিংবা পরোক্ষে জনসংযোগমূলক কার্যকলাপ এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান নিষিদ্ধ। এর অর্থ এই নয় যে সরকার তাঁকে নির্বাচনে সব ধরনের অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখতে চান। যেমন, উদাহরণস্বরূপ, তিনি যদি নিজে নির্বাচনে দাঁড়াতে চান তবে, আমি মনে করি যে, তাঁকে প্রায় নিশ্চিতভাবেই সে কাজ করতে দেওয়া হবে, যদিও তাঁকে তার নিজস্ব প্রচারে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না। যেহেতু এই বিষয়টি সমগুরুত্বপূর্ণ, তাই জি. অব. আইকে তারবার্তা পাঠিয়ে এই উত্তর সম্পর্কে তাঁদের মত জানাটা ভাল হবে। সঙ্গে আমি একটা খসড়া তারবার্তা পাঠালাম।

বসুর আটকের যৌক্তিকতার কারণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ব্যাপারটি ১৯৩৬-এর

২৩শে মার্চ এসেমব্লিতে আলোচিত হয় এবং বির্তকটি এখানে দেওয়া হল। মিস্টার হ্যালেট এবং স্মিথ ক্রেইক উভয়ই বিশদভাবে বক্তব্য রাখেন। সংক্ষেপে বসুর বিরুদ্ধে অভিযোগ হল যে তিনি একজন সন্ত্রাসবাদী এবং অন্যতম প্রধান সন্ত্রাসবাদী দলের নেতা। তিনি সহিংস বিপ্লবের পক্ষে প্রচার চালান। এই বিষয়টি প্রচারের জন্য এবং তা কার্যে পরিণত করার জন্য জনগণকে সংগঠিত করার ব্যাপারে তাঁকে স্বাধীনতা দেওয়া হলে জননিরাপত্তার পক্ষে তা ক্ষতিকর হবে।

স্বাঃ আর পীল

২৪/১১

(আই. ও. আর ফাইল নং এল্/পি এণ্ড জে ৭/৭৯৩)

গোপনীয়

সুভাষচন্দ্র বসু

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের এক নির্দয় শত্রু। ১৮৯৭ সালে ভারতে জন্ম, একজন আইনজীবীব পুত্র। ভারতে শিক্ষালাভ করেন এবং ১৯১৯ সালে ইংল্যাণ্ডে আসেন। সেই সময় এখানে তিনি সাফল্যের সঙ্গে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; কিন্তু মিস্টার গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের জন্য তিনি নিয়োগপত্র প্রত্যাখ্যান করেন।

তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একজন সংগঠক এবং বাংলার অতি-পরিচিত জাতীযতাবাদী নেতা মিস্টার সি. আর. দাশের অনুগামী হয়ে ওঠেন। (কলকাতার মেয়র হিসেবে শ্রীদাসের নিবাচনের পর বসু কর্পোরেশনের চীফ্ এক্জিকিউটিভ অফিসার পদে নিযুক্ত হন)। স্থানীয রাজনীতিতে তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন এবং পববর্তীকালে মেয়র হিসেবে পৌর-দফতরে তাঁর বিপ্লবী অনুগামীদের চাকুরির ব্যবস্থা করেন।

১৯২১ সালে প্রিন্স অব্ ওয়েল্সের কলকাতায় আগমন উপলক্ষে একটি হরতাল সংগঠিত করার ব্যাপারে তিনি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। হিংসাত্মক আন্দোলনের সাহায্যে অসহযোগ আন্দোলনকে অতিক্রম করে যাওয়ার লক্ষ্যে তিনি একটি বিপ্লবী দল গঠনে সাহায্য করেন এবং

১৯২১-২২ সালে একটি অবৈধ সংগঠন পরিচালনার দায়ে ছ'মাসের জন্য কারারুদ্ধ হন।

১৯২২ সালে তিনি বিদেশে অবস্থিত কমিউনিস্ট এজেন্টদের সংস্পর্শে আসেন, বিশেষত বিশিষ্ট ভারতীয় কমিউনিস্ট এম. এন. রায়ের সংস্পর্শে; আর সময় সময় কমিউনিস্ট মতবাদের প্রতি কিছু আগ্রহ প্রদর্শন করেন।

১৯২২-এর পর থেকে তিনি ক্রমশ বাংলার দুই প্রধান সন্ত্রাসবাদী দলের একটির উপর প্রকৃত কর্তৃত্ব স্থাপন করেন।

১৯২৪ সালে তিনি গ্রেফতার হন এবং বৈপ্লবিক অপরাধ সংগঠিত করার এক সাধারণ ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণের দায়ে রাজবন্দী হিসেবে অন্তরীণ থাকেন।

১৯২৭ সালে তাঁর যক্ষ্মারোগের উদ্বেগজনক লক্ষণ দেখা যায় এবং স্বাস্থ্যের কারণে বন্দীজীবন থেকে মুক্তি পান।

১৯২৮-এ পুনরায় রাজনৈতিক এবং সন্ত্রাসবাদী কাযকলাপে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সেই সঙ্গে 'ইণ্ডিপেন্‌ডেন্স লীগ্‌ ফর্‌ বেঙ্গল' নামে এক সংগঠন তৈরী করেন। তাঁরা বলশেভিকদের নীতি অনুসারে একটি ইস্তাহার প্রকাশ করেন।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসেও তার কার্যকলাপ পুনরায় শুরু করেন। সেখানে তিনি ছিলেন গান্ধীর একজন প্রতিদ্বন্দ্বী এবং আরো বেশী জঙ্গী নীতির প্রচারক।

একটি বেআইনী বিক্ষোভ আন্দোলন পরিচালনার জন্য ১৯৩০ সালের শুরুতে তিনি এক বছরের জন্য কারারুদ্ধ হন এবং কারাবাসে থাকাকালে কলকাতার মেয়র নির্বাচিত হন।

মুক্তি পাবার পর তিনি পুনরায় তাঁর কাজকর্ম শুরু করেন এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৩২ সালের শুরুতে আবার রাজবন্দী হিসেবে অন্তরীণ হন।

১৯৩৩ সালের শুরুতে তাঁর অসুস্থতার গুরুতর লক্ষণ দেখা দেয়, চিকিৎসাসংক্রান্ত পরামর্শ অনুসারে তিনি মুক্তি পান এবং চিকিৎসার জন্য তাঁকে ইওরোপ আসতে অনুমতি দেওয়া হয়। তিনি ভিয়েনা এবং সুইজারল্যাণ্ডে চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে ছিলেন, কিন্তু ব্রিটিশবিরোধী প্রচারেও অংশগ্রহণ করেন। বাহ্যত একটি স্থায়ী প্রচারব্যবস্থা গড়ে তোলার

আশায় তিনি ইউরোপের রাজধানীগুলিতে যোগাযোগ স্থাপন করেন। যে আইন অনুসারে বসু অন্তরীণ ছিলেন, তা ভারতের বাইরে কার্যকর ছিল না; তাই সরকারের পক্ষে তাঁর কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয় নি।

(আই. ও. আর. ফাইল নং এল/পি জে/৭/৭৯২ পৃ. ৮৭)

নং ৯ ব্রিটিশ কনস্যুলেট

ভিয়েনা

২৫শে এপ্রিল, ১৯৩৬

মহাশয়,

আপনার ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬ তারিখের ৮নং প্রতিবেদন (ডব্লিউ ১৫৭৯/১৪০/৫০) প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসুর বিষয় সম্পর্কে আমি জানাতে চাই যে ভিয়েনায় প্রেসিডেণ্ট অব পুলিশ এস. এস. 'কন্টি ভার্দে' জাহাজে বসে লেখা বসুর একটি চিঠি পেয়েছেন, সেটি অবশ্য ভিয়েনাতে ডাকে ফেলা হয়েছিল। সেই চিঠিতে তিনি বাডগাস্টাইনে তাঁর সাম্প্রতিক স্বল্পস্থায়ী অবস্থানকালে তাঁর উপর যে কড়া নজরদারি করা হয় তার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন যে সেই ছোট জায়গায় এটি সকলের কাছেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে ভিয়েনা থেকে আসা নির্দেশ অনুসারে তাঁর সমস্ত গতিবিধির উপর দৃষ্টি রাখা হচ্ছে। তিনি তাঁর অতীত অভিযোগও পুনরায় উত্থাপন করেন যে গত বছর মহামহিম প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্সের অস্ট্রিয়া সফরকালে তাঁকে সর্বদাই নজরবন্দী করে রাখা হয়েছিল। তিনি মন্তব্য করেন যে, তাঁর জানা নেই যে অস্ট্রিয়া এখনও একটি ব্রিটিশ উপনিবেশ। তিনি জানিয়েছেন যে পুলিশী কার্যকলাপের যদি কোন সদুত্তর না পান, তবে তিনি তাঁর অস্ট্রিয়ায় অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করবেন যাতে তিনি তাঁর স্বদেশবাসীকে এমন এক দেশ পর্যটনের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিতে পারেন যেখানে তাঁদের সব গতিবিধির উপর এমন ঘনিষ্ঠ দৃষ্টি রাখা হয়। তিনি তাঁকে উত্তর পাঠাতে লিখেছেন আমেরিকান এক্সপ্রেস কোম্পানি, ভিয়েনার ঠিকানায়।

২. আমি যতদূর জানি বসুর উল্লিখিত দুটি ক্ষেত্রে পুলিশী পর্যবেক্ষণের জন্য বসুর কোন অসুবিধা হয়নি। মহামহিম প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্সের ভিয়েনা-সফরের সময় মিস্টার বসু সন্দেহ করেন যে তাঁকে অনুসরণ করা

হচ্ছে এবং তাঁর সন্দেহে নিশ্চিত হবার জন্য তিনি ভিয়েনার শহরতলীতে গ্রিনজিঙে বেড়াতে যান। সেখানে তিনি বরফ আচ্ছাদিত প্রান্তরের উপর দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। সেই প্রান্তরের উপর দিয়ে দুজন পুলিশ এজেন্ট তাঁকে অনুসরণ করতে বাধ্য হয়। কারণ তাঁকে দৃষ্টির আড়াল করতে তাদের বারণ করা হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট অব্ পুলিশ মিস্টার বসুকে কোন উত্তর পাঠাতে চান না।

সশ্রদ্ধ নমস্কার সহ,

হিজ ম্যাজেস্টিস প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী — মহাশয়,
অব্ স্টেট ফর ফরেন এফেয়ার্স — আপনার একান্ত অনুগত
ফরেন অফিস, এস ডব্লিউ—১. — স্বাঃ জে. ডব্লিউ. টেলর

বাংলা সরকারের এ্যাডিশনাল সেক্রেটারীর কাছ থেকে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতরের সেক্রেটারীর কাছে পাঠানো ১লা মার্চ, ১৯৩৭-এর ৮০৯৫ এক্স নং প্রতিবেদনের অনুলিপি।

১৮১৮ সালের রেগুলেশন থ্রি অনুসারে মিস্টার সুভাষ বসুর আটকের বিষয়ে স্টিফেন্সনের কাছে থাকা ১৯৩৭ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখের এফ ৪৪।২৬।৩৬ নং—(রাজনৈতিক)—প্রতিবেদনটির প্রসঙ্গে উল্লেখ করার জন্য আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিভিন্ন কারণে চিঠির সঙ্গে পাওয়া ওয়ারেন্ট সম্পর্কে ব্যবস্থাগ্রহণ স্থগিত রাখা হয়েছে; আর গভর্নর ইন্ কাউন্সিল এখন এই মত পোষণ করছেন যে মিস্টার বসুকে জলপাইগুড়িতে পাঠানোর প্রয়োজন নেই, কারণ তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে যথাশীঘ্র সম্ভব রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হবে। এদিকে হিজ্ এক্সেলেন্সি ইন্ কাউন্সিল এটা নিশ্চিত ভাবে জানেন যে, বসু এমন এক নীতি অনুসরণের চেষ্টা চালাবেন যা ভারতে ব্রিটিশ শক্তির রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক প্রভাবকে উৎখাত করবে; ঠিক একই প্রসঙ্গে তিনি আবার নিশ্চিত যে আসন্ন সাংবিধানিক পরিবর্তনের ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হবে তাতে মিস্টার বসু এবং তাঁর সমমনোভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ এমন এক অবস্থার সম্মুখীন হবেন যে, শক্তি সংহত করতে সময় লাগাবে তাঁদের। এ এমন এক অসুবিধাজনক কাজ যা অতিক্রম করা তাঁদের পক্ষে

সহজে সম্ভব হবে না। নতুন সরকার কার্যভার গ্রহণ করার পূর্বে বসুর ব্যাপারটি মিটিয়ে ফেললে নতুন সরকারের বোঝাও অনেকখানি হালকা হবে। নতুন মন্ত্রীদের কাছে এ এক অবশ্য রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার বিষয় এবং যার প্রতি হিজ্ এক্সেলেন্সি ইন্ কাউন্সিল অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেন।

২ সুতরং গভর্নর ইন্ কাউন্সিল এটি কাম্য মনে করেন যে, বর্তমানের মতো, আঞ্চলিক সরকার গঠনের সময় মিস্টার বসুকে মুক্তি দেওয়া উচিত। একই সঙ্গে তিনি এটিও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন যে মন্ত্রিসভা গঠনের সময় অথবা দলগুলির কিংবা দলের অংশগুলি এই প্রসঙ্গে গোষ্ঠীবদ্ধ হবার সময় তাকে প্রভাবিত করতে বসুকে মুক্তি দেওয়া উচিত নয়। এটিও গুরুত্বপূর্ণ যে, এই রাজবন্দীদের মুক্তি, কার্যভার গ্রহণের একটি শর্ত বলে কোন ধারণা জন্মবার সুযোগ দেওয়া হবে না। এই সমস্ত বিবেচনা করে গভর্নর-ইন্-কাউন্সিলের পরামর্শ হল যে মার্চের মাঝামাঝির আগেই এই মুক্তিদানের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। এই সময়ে মিস্টার বসু মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আটক থাকবেন, যদিও চিকিৎসা-বিষয়ক কর্তৃপক্ষ তাঁকে ছেড়ে দেবার পরামর্শ দিয়েছেন।

মার্চের শুরুতে মিষ্টার বসুকে মুক্তি দেওয়া সম্পর্কে পরামর্শটি যদি ভারত সরকার গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকেন তবে অঞ্চলিক সরকার তারবার্তা মারফৎ তাঁদের মতানুসারে সঠিক দিনটি জানাবেন এবং ভারত সরকারকে অনুরোধ করবেন উক্ত দিনে মুক্তির আদেশটি জারী করতে।

(আই. ও. আর ফাইল নং এল/পি এণ্ড জে/৭/৭৯৩ পৃঃ ২৯-৩০)

ডব্লিউ ২১৭৫৮/২১৬৬২/৫০

বিতরণের জন্য নয়

মহামহিম কনসালকে (ইনসব্রাক) প্রেরিত সাংকেতিক তারবার্তা।

বৈদেশিক দফতর

৬ই ডিসেম্বর, ১৯৩৭

নং ১ বিকেল ৫-২০

পাসপোর্ট অফিস সার্কুলার ইণ্ডিয়ানস নং ২, জুলাই ২১, ১৯৩৩

সুভাষচন্দ্র বসুর কাছে এখন ১৮ই অক্টোবর, ১৯৩৫-এ ভিয়েনা থেকে ইস্যু করা ৯২৮৭ নং পাসপোর্ট রয়েছে। ইওরোপের সব দেশের জন্য অনুমতি দেওয়া আছে, কিন্তু তিনি জানেন না যে এটা যুক্তরাজ্যের জন্য বৈধ।

বসু যদি আবেদন করেন তবে আপনি যুক্তরাজ্যের জন্য অনুমতি দেবেন, কিন্তু সাধারণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অনুমতিটি দেবেন না; এবং এটি জানাতে সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে যাবেন যে এই পাসপোর্টটি এ দেশের পক্ষেও বৈধ।

উপরি-উক্ত সার্কুলারটি বৈধ রয়েছে এবং যুক্তরাজ্য ভিন্ন অন্য যে-কোন দেশের জন্য অনুমতির আবেদন এই দফতরে জানাবেন।

একই নির্দেশ রোম ও ভিয়েনাতে পাঠানো হয়েছে।

(আই. ও আর. ফাইল নং এল/পি এণ্ড জে/৭/৭৯৩)

গোপনীয়

ডি. ও. নং ৬-জিজি ২/৩৯

অফিস অব্ দি সেক্রেটারী টু দি
গভর্নর-জেনারেল (পাবলিক)
নতুন দিল্লী, ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯

প্রিয় ডিবডিন,

গভনর-জেনারেলের আজকের ৪২৮ জি নং তারবার্তার সঙ্গে সেক্রেটারী অব্ ষ্টেটের অবগতির জন্য আমি ১৯৩৯ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে সভাপতি হিসেবে সুভাষ বসুর নির্বাচন সম্পর্কে একটি নোট সংযুক্ত করতে ইচ্ছুক।

আপনার একান্ত,
স্বাঃ অস্পষ্ট

এ. ডিবডিন,
সেক্রেটারী,
পাবলিক এণ্ড জুডিসিয়াল ডিপার্টমেণ্ট,
ইণ্ডিয়া অফিস, লণ্ডন।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নির্বাচন (২৯শে, জানুয়ারী, ১৯৩৯) সম্পর্কে তথ্য।

নির্বাচনের ফল : কিছুটা বিস্ময়জনকভাবে কংগ্রেস কোন প্রামাণিক বিবৃতি প্রকাশ করেনি। সুভাষ বসুর সংখ্যাধিক্য সম্পর্কে সংবাদপত্রের খবর বিভিন্ন রকমের—কখনও ১৯৯, কখনও ২০৩, কিংবা কখনও ২০৭। মাঝামাঝি সংখ্যা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ :

	সুভাষ বসু	পট্টভি সীতারামাইয়া
বর্মা	৮	৬
উৎকল	৪৪	৯৯
তামিলনাদ	১১০	১০২
গুজরাট	৫	১০০
পাঞ্জাব	১৮১	৮৬
বেরার	১১	২১
বাংলা	৪০৪	৭৯
কেরল	৮০	১৮
অন্ধ্র	২৮	১৮১
যুক্ত প্রদেশ	২৬৯	১৮৫
দিল্লী	১০	৫
বিহার	৭০	১৯৭
মহারাষ্ট্র	৭৭	৮৬
নাগপুর	১২	১৭
বোম্বাই সিটি	১৪	১২
আসাম	৩৪	২২
আজমীর	১৮	৮
কর্ণাটক	১০৬	৪১
সিন্ধ	১৩	২১
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	১৮	২৩
মহাকোশল	৬৭	৬৮
	১,৫৮০	১,৩৭৭

এটিকে সঠিক কিংবা প্রায় সঠিক বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। সর্বমোট নির্বাচক-সংখ্যা ছিল ৩,৩০০ বলে মনে হয়। এইভাবে অল্পকিছু অবৈধ ভোটের হিসেব মেনে নিলে প্রায় নব্বই শতাংশ ভোট পড়েছিল।

২. "প্রাদেশিক" সংখ্যাগুলির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল :

(ক) গুরুত্বপূর্ণ "প্রদেশগুলির" মধ্যে পট্টভি সীতারামাইয়া এক বিরাট সংখ্যাধিক্য লাভ করেন, বিহার, অন্ধ্র (তাঁর নিজের 'প্রদেশ'), গুজরাট এবং উৎকলে (উড়িষ্যা); আর সামান্য সংখ্যাধিক্য পান মহারাষ্ট্র এবং মহাকোশলে। সুভাষ বসুর সংখ্যাধিক্য বিরাট ছিল বাংলায় (তাঁর নিজের রাজ্য), পাঞ্জাব, সংযুক্ত প্রদেশ, কেরল এবং কর্ণাটকে; অল্প ছিল তামিলনাদে।

(খ) কেবল বাংলার সংখ্যাধিক্যই এই নির্বাচনে বসুর জয়ের পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

(গ) যে চারটি 'প্রদেশ' নিয়ে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি গঠিত তার কেবল একটিতে (অন্ধ্র) সীতরামাইযা সংখ্যাধিক্য লাভ করেছিলেন।

৩. নির্বাচনের পূর্বে তিনজন প্রার্থী মনোনীত হন। তাঁরা হলেন সুভাষ বসু, পট্টভি সিতারামাইয়া এবং আবুল কালাম আজাদ। শেষোক্ত ব্যক্তিকে সরকারী মনোনীত বলে ধরা হয়েছিল। তিনি যদি প্রার্থী হতেন, তবে সীতারামাইয়া প্রার্থী-পদ প্রত্যাহার করতেন এবং সম্ভবত বসুও; কারণ একজন বাঙালী মুসলমানের বিরুদ্ধে প্রার্থী হতে অনিচ্ছুক ছিলেন তিনি। কিছু দ্বিধার পর আবুল কালাম আজাদ সম্মানটি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। নির্বাচনের অল্প কয়েকদিন আগে তাঁর নাম প্রত্যাহার সীতারামাইয়াকে 'সরকারী' প্রার্থীতে রূপান্তরিত করে। তখন প্রতিযোগিতা থেকে সরে আসার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয় বসুর উপর। গান্ধী নিজেই এটি চেয়েছিলেন। নির্বাচনের পর প্রকাশ পায় যে তিনি নাম প্রত্যাহারের জন্য বসুর কাছে এক ব্যক্তিগত আবেদন জানিয়েছিলেন। ২৪শে জানুয়ারী ওয়ার্কিং কমিটির সাতজন সদস্যের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। তাঁরা হলেন বল্লভভাই প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, জে. দৌলতরাম, আচার্য কৃপালনী, শঙ্কর রাওদেব, ভুলাভাই

দেশাই এবং জমনলাল বাজাজ। বিবৃতিতে এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যাপারটিকে নিন্দা করা হয়, প্রতিনিধিদের কাছে সীতারামাইয়ার নাম প্রস্তাব করা হয় এবং প্রত্যাহারের জন্য আবেদন জানানো হয় বসুর প্রতি। বসুকে বাতিল করার একটি মাত্র কারণ দেখানো হয়েছিল যে, বিশেষ পরিস্থিতি ভিন্ন পুনর্নিবাচন প্রতিষ্ঠিত নীতি বিরোধী। বসুর ফেডারেশনের বিরোধিতা করার দাবি এবং তাঁর "মতবাদ, নীতি এবং কর্মসূচী" সম্পর্কে উল্লেখ অবান্তর বলে বর্ণনা করা হয়েছিল। কারণ ফেডারেশনের বিরোধিতার অংশীদার ছিলেন ওয়ার্কিং কমিটির সব সদস্য এবং নীতি ও কর্মসূচী নির্ধারিত হয় কংগ্রেস অথবা ওয়ার্কিং কমিটির দ্বারা—সভাপতির দ্বারা নয়। তাঁর পদ কেবল একজন চেয়ারম্যানের অনুরূপ। এই বিবৃতিটি প্রকৃতপক্ষে পুরো ওয়ার্কিং কমিটির দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ বলে ধরা হয়েছিল। ২৭শে জানুয়ারী জওহরলাল নেহেরু একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন (সংযুক্ত করা হয়েছে); এতে তিনি বলেন যে অনেক কারণ রয়েছে (স্পষ্ট করে দেখানো হয়নি) যার জন্য বসুর প্রার্থী হওয়া উচিত নয় : তিনি সীতারামাইয়ার নাম উল্লেখ করা থেকে বিরত (স্বেচ্ছাকৃত বলে ধরা যেতে পারে) থাকেন।

৪. এই ফলাফলের অর্থ : বসুর সাফল্যের কারণগুলিকে মোটামুটি এইভাবে শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে—

(ক) দুই প্রার্থীর ব্যক্তিগত পরিচিতি এবং (খ) অন্যান্য :

(১) বসু অনেক বেশী পরিচিত ;

(২) বসুর পদে বহাল থাকার সুবিধা ;

(৩) সাম্প্রতিক মাসগুলিতে বসু নিজেকে দেশের সামনে সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরেছিলেন ; তিনি প্রচুর সফর করেন এবং অনেক বক্তৃতা দেন।

(৪) সীতারামাইয়া অনেক শত্রু সৃষ্টি করেছিলেন, বিশেষ করে বাংলায় তিনি অত্যন্ত অপ্রিয় ছিলেন। মাদ্রাজ প্রদেশ থেকে অন্ধ্রকে বিচ্ছিন্ন করা এবং মাদ্রাজ শহরকে অন্ধ্র প্রদেশে অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টার নায়ক হওয়ায় তামিলনাদে জনপ্রিয়তা ছিল না তাঁর। (এই ঘটনা এবং নিচে খ-

এর (২)-এ উল্লিখিত তাঁর রাজাগোপালাচারীর সঙ্গে বিরোধ তামিলনাদে সমাজবাদী ঝোঁকের তুলনায় বড় হয়ে উঠেছিল)।

(৫) দ্বিতীয় প্রার্থী হওয়ায় অসুবিধা ছিল সীতারামাইয়ার। শেষ মুহূর্তে তাঁকে সামনে ঠেলে দেওয়া হয়।

(৬) এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাংলায় বসু এবং বি. সি. রায়ের গোষ্ঠীর মধ্যে বোঝা পড়া হয় এবং প্রদেশটি ঐক্যবদ্ধ হয় একজন বাঙালীকে বিজয়ী করার জন্য।

(খ) (১) বসুর মনেপ্রাণে ফেডারেল পরিকল্পনার বিরোধিতা করার দাবি, এবং সেই সঙ্গে ওয়ার্কিং কমিটিতে তাঁর সহকর্মীগণ এই মৌলিক প্রশ্নেব বিরোধিতায় স্থিরচিত্ত নয় বলে তাঁর স্পষ্ট অভিযোগ যে সন্দেহের সৃষ্টি করেছিল তা আর দূর করা যায়নি। বসু ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে তাঁরা ঠিকই করে ফেলেছিলেন যে কারা ফেডারেল মন্ত্রী হবেন।

(২) ওয়ার্কিং কমিটির প্রভাবশালী সদস্যের এবং বাইরের কিছু কংগ্রেসী নেতার "ফ্যাসিবাদী" পদ্ধতি, তাঁদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত খারাপ মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্যে কবেছিল। বিশেষত বল্লভভাই প্যাটেল সাধাবণভাবে তাঁর তর্জন গর্জনের পথ অনুসরণের জন্য এবং বিশেষভাবে বোম্বাইতে নারিম্যান এবং মধ্যপ্রদেশের খারের সঙ্গে তাঁর আচবণের জন্য অপ্রিয ছিলেন। 'প্রাচীনপন্থীদের' নির্বাচকমণ্ডলীর উপর তাঁদের মনোনীত প্রার্থীকে চাপিয়ে দেবার প্রচেষ্টা নিন্দার বিষয় হয়ে উঠেছিল। মাদ্রাজে দক্ষিণপন্থার প্রতীক রূপে চিহ্নিত রাজাগোপালাচারী তাঁর স্বেচ্ছাচারী আচরণের ফলে নিজেকে অপ্রিয করে তুলেছিলেন। বসু এমনকি রাজাগোপাচারীর নিজস্ব 'প্রদেশেও' (তামিলনাদ) সংখ্যাধিক্য লাভ করেছিলেন। পাঞ্জাবে ওয়ার্কিং কমিটিকে অপছন্দ করা হতো, কারণ ঐ কমিটিতে কোন পাঞ্জাবীকে নিয়োগ করা হয়নি।

(৩) বামপন্থীদের শক্তিবৃদ্ধি। যথেষ্ট বয়স্ক সীতারামাইযা পুরনো ধাঁচের মধ্যপন্থী নীতির প্রতিনিধি ছিলেন। সমস্ত বামপন্থী ভোট পেযেছিলেন বসু। যুক্তপ্রদেশে কিদোয়াই (একজন মন্ত্রী ও একজন সমাজবাদী) খোলাখুলিভাবে বসুর পক্ষে কাজ করেছিলেন। পাঞ্জাব,

কেরল এবং কর্ণাটকে (সব কটি স্থানে বসু সংখ্যাধিক্য লাভ করেছিলেন) সমাজবাদীরা শক্তিশালী।

(৪) জাল নির্বাচকমণ্ডলী। এটা স্বীকার করা হয়েছে যে প্রাথমিক সদস্যের তালিকায় অনেক ভুয়া নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে : ফল হয় এই যে, সব এলাকায় ব্যাপকভাবে জাল-জুয়াচুরি করা হয়েছে যেখানে নির্বাচকমণ্ডলীতে অসঙ্গত সংখ্যায় প্রতিনিধি রয়েছে। (নোট—বসু যেখানে বেশী ভোট পেয়েছেন সেখানে জুযাচুরি যদি বিশেষভাবে চালু থেকে থাকে তবে তা বসুর পক্ষে সুবিধাজনক হয়েছিল। অভিযোগ করা হয়েছে যে বাংলায বিশেষ করে এইভাবে 'রিগিং' করা হয়েছে)।

(৫) এই নির্দিষ্ট কর্মসূচীর প্রবক্তাগণ বসুর পক্ষে কার্যকর প্রচার চালান। 'কংগ্রেসীদের নিকট আহ্বান' নামে এক পুস্তিকায় তা বিবৃত করা হয় এবং তা অক্টোবর মাস থেকে প্রচার করা হয়েছিল। এই কর্মসূচী ১৯৩৭ এবং ১৯৩৮ সালে সর্বভারতীয় সম্মেলনে কংগ্রেসের গৃহীত নীতির পূর্ণপ্রয়োগের প্রতিনিধিত্বের দাবি জানায়। যদিও এটি বাস্তবিকপক্ষে এক বৈপ্লবিক পরিকল্পনার প্রাথমিক স্তরের প্রতীক ছিল, তবু এটি, সমাজবাদী নয় এমন অনেক কংগ্রেস সমর্থকের কাছে বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল ; কারণ তাঁরা মনে করেন বর্তমান কংগ্রেসী মন্ত্রীরা তাঁদের প্রতিশ্রুতি রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছেন, অথবা অন্য কারণে তাঁরা তাঁদের কাজকর্মে অখুশী ছিলেন।

৫. সাধারণ মনোভাব এই যে, যদিও নির্বাচন কিছুটা বামপন্থার দিকে ঝোঁক দেখিয়েছে, তবু সংখ্যাগুলি যা প্রকাশ করে তা তেমন শক্তিশালী কিছু নয়। এটা এখন নিশ্চিত যে বামপন্থীরা এ. আই সি. সি-র সম্মেলনে সংখ্যালঘু হবে। নির্বাচনের এই ফলাফলকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে প্রধানত, বসুর উন্নততর ব্যক্তিত্বের আবেদন, ফেডারেশন সম্পর্কে তাঁর সহকর্মীদের বিরুদ্ধে তাঁর কুৎসা এবং গোঁড়া কংগ্রেসী নেতাদের স্বেচ্ছাচারী আচরণের প্রতি বিতৃষ্ণার সাফল্য হিসেবে।

৬. সম্ভাব্য প্রভাব : এগুলি হিসেব করা অত্যন্ত অসুবিধাজনক। হয়তো মার্চে এ. আই. সি. সি.-র অধিবেশন বসা পর্যন্ত পরিস্থিতি সুস্পষ্ট

রূপ ধারণ করবে না। ইতিমধ্যে হয়তো উভয়পক্ষেই সম্মেলনে সুবিধা লাভের জন্য কৌশল অবলম্বন করবে। নির্বাচনটিকে গান্ধী তৎক্ষণাৎ আপন পরাজয় বলে বর্ণনা করেছেন। (তাঁর ৩১শে জানুয়ারীর বিবৃতি এর সঙ্গে যুক্ত করা হ'ল)। বসুর উপযোগী একটি 'ক্যাবিনেট' গঠন করার জন্য এবং বসুর কর্মসূচীকে কার্যকর করার জন্য তিনি স্পষ্ট ভাষায় বসুকে আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি পরোক্ষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন কংগ্রেসের গান্ধীপন্থীদের কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসা এবং অবিচলিতভাবে গান্ধী-বাদী কর্মসূচী অনুসরণ করা উচিত। তিনি আরো ইঙ্গিত করেছেন যে বাঞ্ছিত বসুর পছন্দসই মন্ত্রীদের স্থান করে দেবার জন্য বর্তমান কংগ্রেসী মন্ত্রীদের বাইরে বেরিয়ে আসতে হবে।

এই ভাঙনের আহ্বান কোন দায়িত্বশীল কংগ্রেসী মহলের সমর্থন লাভ করে নি। এবং কখনও কখনও স্পষ্ট ভাষায়, কংগ্রেসী পত্রিকায় প্রকাশিত গান্ধীর বিবৃতির, সমালোচনা করা হয়েছে। দক্ষিণপন্থী মন্তব্য হ'ল বাম-পন্থী ঝোঁকটা গান্ধী বাড়িয়ে দেখাচ্ছেন এবং তাঁর অনুগামীরা কংগ্রেসে সংখ্যালঘু হলেও (যা স্বীকার করা হয়নি) তাদের সংগঠনের ভিতরে থাকা উচিত। বসুর অনুগামীরা ৭ই ফেব্রুয়ারী কলকাতায় মিলিত হন। তাঁদের ঘোষিত সিদ্ধান্ত হবে যে, একটি ভাঙন রোধের জন্য সম্ভবপর সবকিছু করা হবে এবং পরিস্থিতিকে ব্যবহার করা হবে কেবলমাত্র ফেডারেল পরি-কল্পনার বিরুদ্ধে কঠোরতর বিরোধিতার নীতি গ্রহণের কাজে, স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য, এবং 'রাজ্যগুলির কর্মসূচী' এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির কাজে মনোনিবেশ করবার প্রয়োজনে। 'পার্লামেন্টারী কাজকর্ম চালিয়ে যাবার' উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়— একটি অস্পষ্ট উক্তি, যার অর্থ হয়তো এই যে বর্তমান কংগ্রেসী মন্ত্রীদের পথে কোন বাধাসৃষ্টির চেষ্টা করা হবে না।

প্রকাশ্য সমালোচনার জন্য প্রস্তাবের খসড়া প্রস্তুত করা হবে এবং এরই আলোকে ত্রিপুরী সম্মেলনের মুখে প্রণয়ন করা হবে চূড়ান্ত প্রস্তাব।

এটা অনুমান করা যেতে পারে যে খসড়া প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রস্তাব হবে ব্রিটিশ সরকারকে এক চরমপত্রদান। সেটি হল ছ'মাসের মধ্যে

একটি নতুন সংবিধান প্রণয়নের জন্য তাকে অবশ্যই কংগ্রেসের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদনে সম্মত হতে হবে। কয়েকদিন আগে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস, মিলিত হয়ে, এর পক্ষে ওকালতি করে।

৭. গান্ধীর কাজে লেগে পড়ার সাম্প্রতিক আহ্বান এবং বোম্বাই ও উড়িষ্যার মন্ত্রীদের উদ্দেশ্যে তাঁর ইঙ্গিত, যে যথাক্রমে রাজকোট এবং উড়িষ্যা রাজ্য সম্পর্কে তাঁদের একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত,—এর পরিপ্রেক্ষিতে "রাজ্যসমূহের কর্মসূচী"র উল্লেখ গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রশ্নটিকে সম্মুখে ঠেলে দেবার জন্য এটি কংগ্রেসের সমস্ত অংশের পক্ষেই উপযুক্ত হবে। এটির উল্লেখ করে জওহরলাল নেহরু ৭ই ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত এক উদ্দীপ্ত বিবৃতিতে বলেন, "এই প্রধান সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে আর সবকিছুই গৌণ, কারণ এর ধাবমান স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে ফেডারেশান, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন এবং আমাদের স্বাধীনতার পথে আর সব বাধা····· সেই আহ্বান আবার আসছে আমাদের কাছে। ভারত আহ্বান করছে, তা প্রবল এবং আরো দৃঢ় হয়ে উঠছে। উঠে দাঁড়াও, ভারতের পুরুষ এবং নারী, উঠে দাঁড়াও! যাত্রা শুরুর সময় এগিয়ে আসছে। এখুনি উঠে দাঁড়াও!"

এইভাবে বজায় থাকবে গান্ধীর নেতৃত্ব এবং রাজ্যের প্রশ্নগুলিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা হবে। ঐ প্রশ্নে সম্ভবত জঙ্গী কার্যকলাপও মেনে নেওয়া হবে (এখনকার মতো—তা সে যে অবস্থাই হোক না কেন)। তা করা হবে ফেডারেশন সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারকে একটি চরমপত্র দেবার এবং তারা মনমতো উত্তরদানে ব্যর্থ হলে, আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার বসুর কর্মসূচীর এক বিকল্প হিসেবে—অথবা সেটিকে পিছনে ফেলে দেবার জন্য।

দক্ষিণপন্থীরা তাঁদের নীতি নির্ধারণ না করা পর্যন্ত এবং ওয়ার্কিং কমিটিতে কি পরিবর্তন ঘটে তা না জানা পর্যন্ত আরো কোন নির্ভুল মূল্যায়ন সম্ভব নয়।

১৩ই এপ্রিল, ১৯৪০

প্রিয় লিন্‌লিথগো,

সুভাষ বসুর সাম্প্রতিক কালের, বিশেষ করে, একটি বিশ্রী বক্তৃতা

প্রসঙ্গে বিস্ময় লাগে যে বাংলা সরকার কেন শাস্তি দিচ্ছেন না তাঁকে। সে বক্তৃতায় অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে তিনি এই আশা প্রকাশ করেছেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যুদ্ধে পরাজিত হবে। আমি তাই আপনাকে অবস্থাটা জানাবার জন্য লিখছি।

আপনার মনে পড়বে যে, সময় সময় আমি আমার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছি কি তাঁর চিন্তার বিষয় –এক স্বাচ্ছন্দ্যকর শহীদের জীবনলাভ এবং অতি সহজে তাঁকে তা দিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অনীহা। এই চিন্তা এখন প্রাসঙ্গিক। এ ছাড়া, যতদিন তিনি মুক্ত থাকবেন ততদিন, নানাভাবে, সরকারের তুলনায় কংগ্রেসের কাছে তিনি অনেক বেশী ক্ষতিকর। এখন সন্দেহ হয় যে তিনি তাঁর সম্মানবৃদ্ধি করতে পারছেন কিনা। এটা অবশ্যই স্বীকৃত যে সে সময় আসতে পারে যখন তাঁকে অবশ্যই শাস্তি দিতে হবে এবং এ ব্যাপারে নাজিমুদ্দিন অত্যন্ত সজাগ। কিন্তু এর পক্ষে এবং বিপক্ষে চিন্তাগুলি এখনও কিছুটা সূক্ষ্ম ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে। আর এই মুহূর্তে তাঁর বিরুদ্ধে নাজিমুদ্দিনকে ব্যবস্থাগ্রহণে বাধ্য করার কোন শক্তিশালী কারণ দেখছি না আমি।

আপনার একান্ত,
স্বাঃ জে এ হার্বার্ট

মহামহিম ভাইসরয় এবং
গভর্নর জেনারেল অব্ ইণ্ডিয়া

(আই. ও. আর ফাইল নং এল/পি জে/৮/৬৩৯ পৃ. ৬৫ ।

পি এণ্ড জে ডিপার্টমেন্টের জন্য নির্দিষ্ট বিতরণ-করা কপি এবং স্যার ডি. ডাওসনকে প্রেরিত কপি

তারবার্তার পাঠোদ্ধার—

পাবার সময়ঃ সন্ধ্যে ছটা, ৪ঠা জুলাই, ১৯৪০

বাংলার গভর্নরের কাছ থেকে সেক্রেটারী অব্ স্টেট ফর ইণ্ডিয়ার নিকট প্রেরিত ;

তাং ঢাকাঃ বিকেল ৫-২০ মিনিট, জুলাই, ১৯৪০

পাবার সময়ঃ সন্ধ্যে ছটা, ৪ঠা জুলাই, ১৯৪০।

গুরুত্বপূর্ণ :

৭৯. গোপন : ভাইস্‌রয়ের উদ্দেশ্যে লেখা এবং সেক্রেটারী অব্ স্টেটের নিকট পুনরুল্লিখিত। সুভাষ বসু গ্রেফতার এবং হলওয়েল মনুমেন্ট। ৩রা জুলাই বিকেলে মনুমেন্টের কাছে শক্তিশালী পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে এবং বিরাটসংখ্যক দর্শনকারীকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। চারজন হিন্দু, যারা মনুমেন্টের আক্রমণ চালানোর জন্য হাতুড়ি হাতে অগ্রসর হয়েছিল, তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। সুভাষের জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর নেতা হেমন্ত বসু, একজন প্রাক্তন যুগান্তরদলের বিপ্লবী, পান্নালাল মিত্র, এবং একজন হাওড়ার বাসিন্দা, কৃষ্ণ চ্যাটার্জীর গ্রেফতারের সংবাদও পাওয়া গিয়েছে। আক্রমণে নেতৃত্ব দিতে চাইছিলেন তাঁরা।

১. বিকেল পাঁচটায় টাউনহলে এক সভা ডাকা হয়েছিল। সেটি শান্তভাবেই শুরু হয়েছিল, কিন্তু ময়দানে ফুটবল শেষ হবার পর তা ফেঁপে ফুলে ওঠে। সিরাজদ্দৌল্লার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে, বিদেশী ঐতিহাসিকদের মিথ্যা ভাষণকে নিন্দা করে, ইস্কুলের পাঠ্যবই থেকে সিরাজদ্দৌল্লার বিষয়ে অসম্মানজনক মন্তব্য বাদ দেবার দাবি জানিয়ে, সরকারের মুসলমান সমর্থকদের অনুরোধে, বিনা হৈচৈতে, প্রস্তাবগুলিকে অনুমোদন করা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতির অস্পষ্টতায় দুঃখ প্রকাশ করে এবং দ্রুত সিদ্ধান্তের দাবি জানিয়ে গ্রহণ করা প্রস্তাব প্রসঙ্গে উত্তাপ বাড়তে থাকে। কিছু মুসলমান ১৫ই জুলাইয়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত দাবি করেন। অপরদিকে চরমপন্থী মুসলমানগণের কর্মপরিষদ ১৬ই জুলাই 'সত্যাগ্রহে'র ভীতি প্রদর্শন করেন। পরিচিত হিন্দু বিপ্লবীরা হিন্দু-মুসলমান ঐক্যকে অভ্যর্থনা জানিয়ে এবং আশু ব্যবস্থা গ্রহণের দাবির উল্লেখ করে উত্তেজনাকর বক্তৃতা দেন। সাধারণ ধারণা এই যে, স্থিরমস্তিষ্ক মুসলমানগণ শান্ত থাকার অনুকূলে ছিলেন। কিন্তু সুভাষের হিন্দু অনুগামীরা এবং কিছু চরমপন্থী মুসলমান আগ্রহী ছিলেন গণ্ডোগোলের সৃষ্টি করতে। ৫ই জুলাই 'হরতালে'র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে এবং পরবর্তী পরিস্থির জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে। সুপরিচিত প্রাক্তন সন্ত্রাসবাদী ও ফরওয়ার্ড ব্লকের হিন্দু আন্দোলন কারীরা বিশেষ সক্রিয় ছিলেন।

৩. আমি এটা সৌভাগ্য বলে মনে করি যে সুভাষের গ্রেফতার তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে গণ্ডগোলের নেতৃত্বদানে বাধা সৃষ্টি করেছিল।

(আই. ও. আর ফাইল নং এল/পি জে/৮/৬৩৯ পৃ. ৪৯)

গভর্নর জেনারেলের কাছ থেকে সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট ফর ইণ্ডিয়ার উদ্দেশ্যে প্রেরিত। তাং সিমলা, বিকাল -৫-৩০ মিনিট, ২০শে জুলাই, ১৯৪০।

পাওয়া গেছে: ৫-৩০ মিনিট, ২০:শ জুলাই, ১৯৪০।

১৪৫৫ এস

বাংলার গভর্নরের কাছ থেকে ১৯শে জুলাইয়ে পাঠানো তারবার্তা ২০ তথ্যের জন্য প্রেরিত। শুরু হয়: গোপন। আজ ভাইসরয়ের ব্যক্তিগত সচিবকে টেলিফোনে জানানো মতো আমি মঙ্গলবার কলকাতায় উড়ে গিয়েছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল নিশ্চিত করা যে আমাকে সতর্ক না করে মন্ত্রিসভা যেন সুভাষকে মুক্তি না দেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন, যিনি লীগকে একত্রিত রাখতে চান এবং মুখ্যমন্ত্রী, যিনি চান ভাঙতে, উভয়েই ভাঙনের ক্ষেত্রে সুভাষের সমর্থনলাভের চেষ্টা করছেন। পুলিশ এবং আমলাগণ সতর্ক করা সত্ত্বেও আমার ভাবনা ছিল যে তাঁরা একযোগে তাঁকে মুক্তি দেবেন। নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি পেয়েছি যে তাঁকে অভিযুক্ত করা হবে এবং আমার বিশেষ অনুমতি ভিন্ন মুক্তি দেওয়া হবে না। মন্ত্রীগণ অবশ্য এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারেন, যে পরিস্থিতিতে তাঁরা পরামর্শ দিতে পারেন যে সুভাষকে মুক্তি না দিলে মুসলমান ছাত্রদের দ্বারা শান্তি বিঘ্নিত হবে। কিন্তু অপরদিকে আমার ধারণা যে, শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তাঁকে বন্দী করে রাখা প্রয়োজন। পুলিশ কমিশনার কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা অফিসারের কাছ থেকে ভারত সরকারের ওয়ারেন্ট পাবার আবেদন জানিয়েছেন। এটি জানানো হয়েছে সেই মুহূর্তটির জন্য যে মুহূর্তে উপরি-উক্ত ঘটনাটি ঘটবে বলে তিনি সন্দেহ করবেন। কারণ তিনি নিশ্চিন্ত হতে চান যে কোন মন্ত্রীকে খুশী করার জন্য যেন সুভাষকে মুক্তি না দেওয়া হয়।

(আই. ও. আর. ফাইল নং এল/পি জে/৮/৬৩৯ পৃ. ৪৬)

পি এণ্ড. জে. ডিপার্টমেণ্টের জন্য নির্দিষ্ট
কপি বিতরণ করা হয়েছে ; এবং
স্যার ভি. ডাওসনের উদ্দেশ্যে
প্রেরিত কপি।

তারবার্তার পাঠোদ্ধার

ভাইস্‌রয়ের কাছ থেকে সেক্রেটারী অব্‌ ষ্টেট ফর ইণ্ডিয়ার নিকট প্রেরিত। তাং ভাইস্‌রয়েজ্‌ ক্যাম্প, গুণ্ডি, রাত্রি ১১-৩০ মিনিট, ২৭-৭-৪০ ; পাওয়া গেছে : রাত্রি ১১-৪৫ মিনিট, ২৭শে জুলাই, ১৯৪০।

গুরুত্বপূর্ণ

৩৫৮---এস. সি। হার্বাট যেমন তাঁর ৩রা এবং ৪ঠা জুলাইয়ের তার-বার্তায় এবং ৪ঠা জুলাইয়ের চিঠিতে জানিয়েছিলেন আর আপনার কাছে যার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছিল এবং যে চিঠির কপি পাঠান হয়েছিল, সেই অনুসারে সুভাষকে গ্রেফতার করা হয়েছে ; কারণ তিনি হলওয়েল মনুমেণ্টের বিরুদ্ধে এক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার চেষ্টা করছিলেন। আন্দোলন চলেছে এবং তিনশ'রও অধিক মানুষকে গ্রেফতার করা হয়েছে। হার্বাট ৪ঠা জুলাইয়ের চিঠিতে এই মত ব্যক্ত করেছিলেন যে রাস্তার ব্যস্ত জায়গায় দাঁড়-করানো এই মনুমেণ্টটিকে কবরখানা কিংবা অন্য কোন উপযুক্ত জায়গায় স্থানান্তরিত করা উচিত। তাঁর ধারণা আইন সভায় ইওরোপীয় গোষ্ঠী তাঁর এই প্রস্তাবে সম্মত হবেন।

২. কার্জন পুরনো মনুমেণ্টের জমিতে ১৯০২ সালে মনুমেণ্টটিকে নির্মাণ করান, যেটি "অন্ধকূপে"র অন্যতম জীবিত এবং পরবর্তী কালের গভর্নর হলওয়েল নির্মাণ করিয়েছিলেন, কিন্তু ১৮২১ সালে সেটি ভেঙে পড়ে। কার্জন মূলত নির্মাণের খরচ বহন করেন এবং মনুমেণ্টটিকে কলকাতাকে উপহার দেন। সেই সময় এবং তারপর থেকে আর সব খরচ বহন করে আসছেন বাংলার সরকার। ১৯২৩ সালে পুরাতাত্ত্বিক সংরক্ষণ আইনের ৩নং ধারার অধীনে মনুমেণ্টটিকে সংরক্ষিত বলে ঘোষণা করা হয়। কারণ এমনকি সেই সময়ও সেটিকে বিকৃত করার চেষ্টা হয়েছিল।

৩. ১৮ই জুলাই বাংলা সরকার আমার শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং ভূমি-দফতরে

চিঠি লিখে জানতে চান যে ঐ সরকার যদি মনুমেন্টটিকে সরানোর সিদ্ধান্ত নেন, তবে ভারত সরকার সংরক্ষণের বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করে নেবেন কিনা। ২৩শে তারিখে প্রধানমন্ত্রী আইনসভায় বিবৃতি দেন যে বাংলা সরকার মনুমেন্টটিকে স্থানান্তরিত করার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার সর্বদাই এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে এসেছেন যে মনুমেন্টটির পুরাতাত্ত্বিক আকর্ষণ নেই এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সেটিকে স্থানান্তরিত করার প্রয়োজনে বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি থাকতে পারে না। আমি উল্লেখ করতে চাই যে অন্ধকূপের প্রকৃত স্থানটি সংরক্ষিত রয়েছে এবং সেটি আন্দোলনের লক্ষ্য নয়।

৪. এটা দুর্ভাগ্যজনক যে আন্দোলনের চাপে সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে, যা অবশ্য স্থগিত রাখা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু যে জায়গায় সংরক্ষণ করা সম্ভব, সেই জায়গায় মনুমেন্টটিকে স্থাপন করার জন্য সেটিকে অপসারণ করার ব্যাপারে কি পুরাতাত্ত্বিক, কি রাজনৈতিক, কোন ভিত্তিতেই আমরা এর বিরোধিতা করতে পারি বলে আমার মনে হয় না। ইউরোপীয় গোষ্ঠী প্রধানমন্ত্রীর ২৩শের বিবৃতিকে মৌন সম্মতি জানিয়েছেন বলে মনে হয়। সুতরাং আমি, সরকারী পত্রের উত্তরে, আমার সরকারের সঙ্গে আপনার ঐক্যমত জ্ঞাপন মারফত জানাতে অনুরোধ করব যে ১৯২৩ সালের বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহারে তাঁদের কোন আপত্তি নেই। হার্বার্টকে আমার এ সংবাদ জানানোর ব্যাপারে মত দিয়ে বলব যে আমরা অপসারণে মত দিতে রাজী, যদি প্রথমত, সত্যাগ্রহ নিশ্চিতভাবে বাতিল করা হয়; দ্বিতীয়ত, যদি ইউরোপীয় গোষ্ঠী দ্ব্যর্থহীনভাবে সম্মতি জানান এবং তৃতীয়ত, সুভাষের ব্যাপারে পরবর্তী আচরণকে এই ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বাইরে আর ভিন্ন সিদ্ধান্তের জন্য রেখে দেওয়া হয়। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এবং তারবার্তা মারফত দ্রুত উত্তরের জন্য আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকব। শেষ।

(আই. ও. আর. ফাইল নং এল। পি জে।৮।৬৩৯পৃ. ৪৩)

১১ই ডিসেম্বর, ১৯৪০

প্রিয় লিনলিথগো,

মুক্তি পাবার পর গত ৯ই ডিসেম্বরে সুভাষ বসুর মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা

চিঠির একটি কপি আমি এর সঙ্গে দিলাম। আজ সকালে এই চিঠিটির বিষয়ে ক্যাবিনেটে আলোচনা হয়েছে, এবং সম্মত হওয়া গিয়েছে যে এ চিঠির উত্তরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানাবেন যে সরকার ভারতরক্ষা আইনের ২৬নং ধারার অধীনে জারী করা নির্দেশ কিংবা বর্তমানে মুলতুবী মামলা দুটি প্রত্যাহার করতে ইচ্ছুক নন। স্বরাষ্ট্রদফতর এ বিষয় আইনের পরামর্শ নিয়েছেন যে, সুভাষ হাজতে কিংবা জামিনে না থাকার ফলে কোন গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মের সৃষ্টি হচ্ছে না। এটা ক্যাবিনেটে মেনে নেওয়া হয়েছে যে, তিনি স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করার পরই পুনরায় গ্রেফতার হবেন এবং আদালতে বিচার চলবে তাঁর। যদি তিনি পুনরায় অনশন শুরু করেন, তবে বর্তমানের দ্বৈত নীতি একই ভাবে চলতে থাকবে। আশা করা যায় যে, অনশন-নীতির প্রয়োগের ফলে উভয় ধরনের কাজই হবে—সেটি তাঁকে নির্দোষ করে তুলবে এবং তাঁকে বুঝতে সাহায্য করবে যে একনাগাড়ে অনশন থেকে কিছু লাভ করা যাবে না।

আপনি কলকাতায় পৌঁছলে আমি অবশ্য পরিস্থিতি নিয়ে আরো আলোচনা করব আপনার সঙ্গে। এখনকার মতো কেবল পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত রাখতে চাইছি আপনাকে। সেই সঙ্গে এটা পরিষ্কার করে দিতে চাইছি যে গত জুলাইয়ে উপনীত সমঝোতাকে অসম্মান করার কখনও কোন উদ্দেশ্য ছিল না আমার। সুভাষ বসুর স্থায়ী মুক্তির কোন নির্দেশ এখনও জারী করা হয়নি। যা করা হয়েছে, তা হ'ল, তাঁর আটক থাকার নির্দেশ স্থগিত রাখা হয়েছে সাময়িক ভাবে।

আপনার একান্ত

মহামহিম ভাইস্‌রয় এবং
ভারতের গর্ভনর-জেনারেল

স্বাঃ জে. হার্বার্ট

ফাইল সম্পর্কে নোট

ইউ. এস. অব্ এস

এই চিঠি প্রতিপন্ন করে যে সুভাষ বসুকে স্থায়ী ভাবে মুক্তি দেবার কোন ইচ্ছা নেই। ২নং স্তবকে যে সমঝোতার উল্লেখ করা হয়েছে, তা হ'ল

ভাইস্‌রয়ের ১৯৪০ সালের ২০শে জুলাই তারিখের তারবার্তায় উল্লিখিত সমঝোতাটি।

২৭শে জানুয়ারী রয়টারের সংবাদ হ'ল যে বসু নিরুদ্দেশ হয়েছেন।

স্বা: অস্পষ্ট

৩০/১/৪১

(আই. ও. আর. ফাইল নং এল/পি জে/৮/৬৩৯ পৃ. ৫৫)

অত্যন্ত গোপনীয়

পুনরায় প্রকাশ করা কিংবা উল্লেখ করা চলবে না। সুভাষ বসুর বর্তমান কার্যকলাপ

১. সুভাষ বসু, যিনি মে মাসে জার্মানি থেকে পূর্ব এশিয়ায় এসে পৌঁছেছিলেন, সম্ভবত জুনের মাঝামাঝি টোকিওতে চলে গিয়েছেন। তাঁর এশিয়াতে পৌঁছনোর সংবাদ প্রথমে গোপন রাখা হলেও এখন ব্যাপকভাবে প্রচার করা হচ্ছে।

২. টোকিওতে পৌঁছে বসু ইম্পেরিয়াল হোটেলে তাঁর প্রধান দফতরে অক্ষশক্তির সাংবাদিকদের অনেকগুলি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। এইসব সাক্ষাৎকারের সারমর্ম হ'ল, অক্ষশক্তির বিজয় সম্পর্কে, অক্ষশক্তির সাহায্যে ভারতের আসন্ন মুক্তি সম্পর্কে এবং বসুর থেকে আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গতি-বিধানের জন্য ভারতে এক সশস্ত্র বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাসের পুনরুল্লেখ। তিনি এমন সব বিষয় সম্পর্কিত উত্তর দেন, যেমন চিয়াং-কাই-শেখের চরিত্র এবং নতুন ভাইস্‌রয় নিয়োগ।

৩. বেতারযন্ত্র মারফতও বসু ভারতের উদ্দেশ্যে ইংরেজী, হিন্দী এবং বাংলায় আর জার্মানির উদ্দেশ্যে এবং জার্মানিতে ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে জার্মান ভাষায় বক্তব্য রেখেছেন।

এইসব বেতারপ্রচারে তিনি পুনরায় অক্ষশক্তির মহানুভবতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন এবং সমস্ত ভারতীয়দের তাঁর সংস্পর্শে আসার জন্য ও "ভারত থেকে ব্রিটিশদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করার জন্য প্রচণ্ড শক্তি" সংগঠিত

করতে তাঁকে সাহায্য করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি' সম্পর্কে এই প্রথম অস্পষ্ট উল্লেখ পরবর্তী কালে সিঙ্গাপুরে আই. আই. এল-এর প্রধান দফতর থেকে এক সরকারী প্রচারে পরিবর্ধিত করে ঘোষণা করা হয়। বলা হয় যে, এই "নতুন ভারতীয় সৈন্যবাহিনী এখন শিক্ষানবিস রয়েছে।" ৮ই জুলাই জাপানী প্রধানমন্ত্রী তোজোর সিঙ্গাপুর সফরের সময় এই আই. এন. এর. একটি সংগঠন বসু এবং তোজোর সম্মুখে প্যারেড করে।

৪. ৪ঠা জুলাই সিঙ্গাপুরে ("শোনান") ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের এক সভায় লীগের অস্থায়ী সভাপতি রাসবিহারী বসু সুভাষ বসুকে লীগের নতুন সভাপতি হিসেবে উপস্থাপিত করেন। এস. সি. বসু, যিনি "মেহেতারজী" অথবা নেতা পদবী গ্রহণ করেছেন, তিনি সভাপতি হিসেবে দীর্ঘ ভাষণ দেন; যার প্রধান বিষয়গুলি ছিল :

(ক) তাঁর কর্তৃত্বাধীনে অবিলম্বে ভারতের জন্য একটি অস্থায়ী সরকার গঠন। বিপ্লব সাফল্য লাভ করলে, এটির স্থান গ্রহণ করবে একটি স্থায়ী, জনপ্রিয় নির্বাচিত সরকারে।

(খ) ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধের সময় সমুপস্থিত।

(গ) জাপানের শুভ ইচ্ছার প্রতি তাঁর আন্তরিক বিশ্বাস।

(ঘ) ভারতের স্বাধীনতার আশা কেবলমাত্র অক্ষশক্তির জয়ের উপরই নির্ভরশীল।

(ঙ) ওয়াভেলের নিয়োগের অর্থ আরো বেশী নিষ্ঠুরতা।

(চ) ব্রিটিশ গোয়েন্দা দফতর থাকা সত্ত্বেও তাঁর অনেক এজেণ্ট রয়েছে ভারতে, যাদের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছেন।

(ছ) সামনে বিরাট বাধা।

সাধারণভাবে, এশিয়ায় বসুর উপস্থিতি ধ্বংসাত্মক কাজের গতিকে দারুণভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে বলে ধরা যেতে পারে, এবং মনে হচ্ছে যে রাজনৈতিক কার্যকলাপে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স্ লীগকে আরো বেশী বলদৃপ্ত করে তুলেছে। এটা লক্ষণীয় (এবং আশা করা যেতে পারে) যে জাপানকে প্রশংসা করা এবং ধন্যবাদ জানাবার সময়ও কিন্তু বসু কখনও জার্মানির, এবং ভারতের জন্য অক্ষশক্তির সহানুভূতির উল্লেখ করতে ভুল করেন নি :

তাঁর আগমনের পূর্বে আই. আই. এল.-এর প্রচার ছিল কেবলমাত্র জাপানের পরিপ্রেক্ষিতেই ; স্পষ্টতই বসু চান আন্দোলনটিকে তিনটি অক্ষশক্তির সমর্থনে স্বাধীনতার জন্য এক জাতীয় আন্দোলনের স্তরে তুলে ধরতে।

৬. বসুর প্রবল প্রচেষ্টা এবং রাজনৈতিক ধীশক্তি, ভারতীয় বিপ্লবী মহলে তাঁর সম্মান, ভারতীয় এবং ইংরেজ উভয় চরিত্র সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান জাপানীদের কাছে প্রকৃত মূল্যবান বিষয় হয়ে উঠবে। ভারতের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রচারে এতোদিন কল্পনার অভাব দেখা গেছে। যদিও আমাদের বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে তাঁর বিবৃতির ৪-এর (চ) অংশটি বাড়িয়ে বলা হয়েছে, তবু সন্দেহ নেই যে বসুর নির্দেশে ভারতে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ এবং গুপ্তচর-বৃত্তি বহুগুণ তীব্র হয়ে উঠবে।

৭. জার্মানি এবং জাপানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক স্থাপন করে বসু এখন আমাদের সঙ্গে, শেষ পর্যন্ত, তাঁর সব সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেললেন। তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ল জাপানীদের সাফল্য এবং আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের ফলে ভারতে ব্রিটিশ শাসন পঙ্গু হয়ে যাবার উপর। সৌভাগ্যক্রমে ভারতে জনগণের মনোবল এবং আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা-ব্যবস্থা এখন বেশ দৃঢ়, আর জাপানীদের সম্পর্কে ব্যাপক ভীতি রয়েছে। অর্থনৈতিক দুরবস্থা এবং রাজনৈতিক অচলাবস্থা থেকে বসু নিশ্চয়ই কিছু সুবিধা আদায় করে নিতে পারবেন। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে কংগ্রেসকে জয় করে নিতে না পারলে তাঁর বড়সড় এক বিপ্লব জাগিয়ে তোলার সুযোগ ক্ষীণ বলেই মনে হয়। গত আগস্ট মাসে যদি তিনি পূর্ব এশিয়ায় এসে পৌঁছতে পারতেন, অথবা এমনকি গান্ধীর অনশনের সময়েও, তবে তাঁর সম্ভাবনা অনেক বেশী থাকত।

৮. বসুর জীবনী সংক্রান্ত একটি নোট যুক্ত করা হল।

এম. আই ২ (ক)

১৪ই জুলাই, '৪৩

এক্সটে—১৭৩

বিতরণ :

ডি. ডি. এম. আই (আই)

এম. আই. ২বি. ২সি.

এম. ও. ১২

ইণ্ডিয়া অফিস (ব্রিগেডিয়ার থম্পসন)

আই. পি. আই (কর্নেল ভিকারী)

এয়ার মিনিস্ট্রি

এডমিরালটি (কমানডার লেগ্‌গাট্)

(আই. ও. আর ফাইল নং এল/ডব্লিউ এস/১/১৫৭৬ পৃ. ২৯১—৯২)

নং ১০০০৫/৩/জি এস আই (বি) কপি নং ৫৪৭

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কমাণ্ড এবং ভারতীয় কমাণ্ড

'ফরর্টনাইট্‌লি সিক্যুইরিটি ইন্‌টেলিজেন্স সামারি' নং ৩, তাং ১৪ই সেপ্টেম্বর, পৃষ্ঠা ৪৫।

গুরুত্বপূর্ণ

এই 'সামারির' চিহ্নিত বিষয়গুলি কেবল গ্রহীতা, উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার এবং কমাণ্ডারদের ব্যক্তিগত তথ্যের জন্য। যেগুলিতে "পুনঃ প্রকাশ নিষিদ্ধ" বলে চিহ্নিত করা আছে, সেগুলি বাদে অন্যান্য বিষয়গুলি, গ্রহীতার ইচ্ছানুসারে, সামরিক গোয়েন্দা সংগঠনে বিতরণের জন্য পুনঃ প্রকাশ করা যেতে পারে।

নিরাপত্তা গোয়েন্দা বিভাগ

আই. এন. এ. যুদ্ধবিরতি ঘটিয়েছে

১. ২৬শে আগস্ট '৪৫ তারিখে আই. এন. এ-এর সুপ্রীম কমাণ্ড নিম্নলিখিত নির্দেশ জারী করেছেন :

"মালয় এবং শেনানে (সিঙ্গাপুর) সব ইউনিট এবং কমাণ্ডের উদ্দেশ্যে :

(ক) বর্তমান পরিস্থিতি, যখন সমস্ত দেশ শান্তিস্থাপনের সিদ্ধান্ত করেছে, আজাদ হিন্দের অস্থায়ী সরকারের ক্যাবিনেট ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট, শনিবার, থেকে যুদ্ধ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

(খ) এতদ্বারা আপনাদের অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করার নির্দেশ জানানো হচ্ছে। আপনাদের কমাণ্ডের অধীনস্থ সব ইউনিট এবং দলকে এই সিদ্ধান্ত এই মুহূর্তে জানিয়ে দিন।

দাবি করা মাত্র ব্রিটিশের হাতে তুলে দেবার জন্য নিজেদের, আপনাদের সৈন্যদলকে, অস্ত্র এবং অন্যান্য সামরিক সম্ভার প্রস্তুত রাখুন। সময়মতো আরো নির্দেশ দেওয়া হবে। কঠোর শৃঙ্খলা রক্ষা করা হবে। কমাণ্ডারগণ তাঁদের অধীনস্থ সৈন্যদলের মঙ্গল এবং স্বাস্থ্যের জন্য দায়ী থাকবেন।

বৃটিশ শক্তি গ্রহণ না করা পর্যন্ত অথবা অন্য নির্দেশ জারী না করা পর্যন্ত স্বাভাবিক শাসনকার্য এবং অনুশীলন অব্যাহত থাকবে। সৈন্যেরা ক্যাম্পের এলাকার মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে থাকবে, কেবলমাত্র জরুরী শাসন-সংক্রান্ত কাজে বাইরে যাওয়া ছাড়া। সেক্ষেত্রেও তারা একজন দায়িত্বশীল অফিসারের অধীনে একটি উপযুক্ত দলের সঙ্গে যাবে।

স্বাঃ এম. জেড. কিয়ানি,
মেজর-জেনারেল, অফিসার কমাণ্ডিং,
রিয়ার হেডকোয়ার্টার্স, সুপ্রীম কমাণ্ড,
আজাদ হিন্দ্ ফৌজ।

২. শ্যামদেশে সমস্ত জিফ কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য সরকার তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন এবং এমন কি মিত্রশক্তির সুপ্রীম কমাণ্ডের সঙ্গে আলোচনার পূর্বেই সমস্ত আই. এন. এ. সৈন্যদলের আর. আই. আই. এল-এর পদস্থ ব্যক্তিদের গতিবিধি সীমাবদ্ধ করে এবং আজাদ হিন্দের অস্থায়ী সরকারের যে-কোন সদস্যের শ্যামদেশে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে নির্দেশজারী করেছিলেন।

৩. তারপর থেকে ব্যাংককে ভারতীয় কমাণ্ডের প্রতিনিধিগণ জিফ পরিস্থিতিকে আয়ত্তে নিয়ে এসেছিলেন এবং শ্যাম দেশে আই. এন. এ-কে অস্ত্রহীন এবং একত্রিত করা হয়েছিল। ব্যাংককে আত্মসমর্পণে ক্যাপ্টেন (কর্নেল) জে. কে. ভোঁসলে আই. এন. এ-র প্রতিনিধিত্ব করেন বলে জানানো হয়েছে।

বসুর মৃত্যু সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া এবং আই. এন. এ. সমস্যা

৪. জাপানের আত্মসমর্পণের পর থেকে এবং সম্ভবত প্রেস সেন্সর প্রথা উঠে যাওয়ার প্রভাবে, সমস্ত ধরনের মতবাদী ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি, খুঁজে পাওয়া আই. এন. এ. অফিসারদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে, গবেষণায় মেতে উঠেছে। গ্রহণযোগ্য নীতি সম্পর্কে ভারত সরকারের ঘোষণাকে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে গ্রহণ করা হয়েছে এবং ন্যাশানালিস্ট প্রেস, যদিও অধিকাংশ সময় সংযমী, আই. এন. এ.-র সমর্থনে উঠে দাঁড়িয়েছে। পথভ্রষ্ট হয়ে থাকলেও আন্তরিক দেশপ্রেমিক বলে বর্ণনা করা হয়েছে তাঁদের।

৫. আই. এন. এ-র সামরিক বিচারে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আইন-বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করার প্রশ্নটি পরীক্ষা করে দেখার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আইন-বিশেষজ্ঞের দ্বারস্থ হচ্ছেন।

৬ বসুর মৃত্যু সম্পর্কে জাপানী রিপোর্টগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কেবলমাত্র রাজনৈতিক জগতেই নয়, যাঁরা নিরাপত্তার সঙ্গে যুক্ত তাঁদের ক্ষেত্রেও। 'নেতাজী'র অস্তিত্ব টিকে থাকা, সম্ভবত ছদ্মবেশে, নিশ্চিত ভাবে বহু জিফ, সৈন্য এবং নাগরিকদের মধ্যে এক উৎসাহ জাগিয়ে রাখবে। যাঁরা, যাকে প্রায় জাদুমন্ত্র বলা চলে, তাঁর প্রভাবে তাঁর অধীনে এসেছিলেন অন্তত তাঁদের মধ্যে। অপর দিকে নেতার নিশ্চিত প্রয়াণের সংবাদ সম্ভবত বিপরীত প্রতিক্রিয়ার মতো কিছু একটা সৃষ্টি করবে।

৭. ভারতে অধিকাংশ মহলে বসুর মৃত্যুসংবাদকে সহানুভূতি এবং দুঃখের সঙ্গে গ্রহণ করা হয়েছিল। সভাসমিতি এবং হরতালের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু সন্দেহটা ব্যাপক ভাবেই রয়ে গেছে। বাংলার প্রতিক্রিয়াগুলি বিশেষ ভাবে আগ্রহের সৃষ্টি করে। সাধারণভাবে এটাই বিশ্বাস করা হয় যে জাপানের নীরব সমর্থনের সাহায্যে সংবাদটিকে সাজানো হয়েছে এবং সঠিক মানসিক পরিস্থিতিতে পুনরাবির্ভাবের জন্য তিনি গুপ্তস্থানে আত্মগোপন করে রয়েছেন। সেই মুহূর্তটি উপস্থিত হবে সম্ভবত জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে, অথবা বসুর বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে বর্তমান সরকার উদারনীতি গ্রহণ করলে। প্রদেশটি আই. এন. এ.-র রাজনৈতিক চক্র সাম্প্রতিক একটি সংবাদের বিষয়ে অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে

উঠেছে, যাতে বিমান-দুর্ঘটনার পরে বসুকে জীবিত অবস্থায় সাইগনে দেখা গিয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

৮. যেখানে সাধারণভাবে সংবাদটিকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে সেখানে এক হতাশ মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে। সে মনোভাব হ'ল বসু আর মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করে তাঁর "যথাযোগ্য স্থান" গ্রহণ করতে পারবেন না। প্রায় ধরেই নেওয়া হয়েছে যে, সরকার তাঁকে মার্জনা করবেন, বিশেষত বর্তমান দুর্বল রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে। বসুর ব্যাপারটি অবশ্যই বন্দী আই. এন. এ. সদস্যদের ভবিষ্যতের সঙ্গে জটিল ভাবে যুক্ত। উভয় প্রসঙ্গে সংবাদপত্রের মন্তব্য তাঁদের অপরাধকে ছোট করে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে এবং বিপথগামী হলেও তাঁদের দেশপ্রেমের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। আই. এন. এ প্রসঙ্গে অভিযোগ করা হয়েছে যে শত্রুর চাপে চরম অবস্থা এবং হিংস্রতা থেকেই এই অপরাধগুলি জন্ম নিয়েছে। কিছু কিছু পত্রিকায় আরো রয়েছে এবং বসু এবং তাঁর লোকজনেরা এই বিপথগামী কার্যকলাপের সুযোগ পেয়েছিলেন বলে বিদ্বেষপূর্ণ পরিতৃপ্তিও প্রকাশ পেয়েছে। এই বিষয়ে নেহেরু দুরভিসন্ধিমূলক ভাষায় স্বাধীনভাবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন। ঠিক যেমনটি আশা করা গিয়েছিল, এক-দিকে যেমন এই প্রশ্নে "ইংরেজ দৃষ্টিভঙ্গিকে" স্বীকার করেছেন, তেমনই 'ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির' গুরুত্বের উপরও তিনি জোর দিয়েছেন।

৯. বসুর নিশ্চিত মৃত্যুসংবাদ তাঁর সম্পর্কে আচরণের জটিল সমস্যাটির সমাধান করবে: কিন্তু তাঁর দেশপ্রেম এবং কার্যকলাপ, পরাজিত হলেও, জাতীয়তাবাদী মনে, বিশেষ করে তরুণ বাঙালী মনে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে থাকবে বলে মনে হয়। একজন রাজনীতিবিদ্ এমন কি এ-ও ঘোষণা করেছেন, "তাঁর রোমাঞ্চকর কাহিনী জনগণকে উজ্জীবিত করে চলবে এবং ভারত ও এশিয়াকে সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য সুদৃঢ় করে তুলবে তাঁদের সংকল্পকে।"

সামরিক নিরাপত্তা এবং নৈতিক মনোবল

শান্তির সমস্যা

১০. পূর্বের 'সামারি'তে যেমন বলা হয়েছিল, জাপানীদের পতন

নৈতিক মনোবলের উপর চমৎকার প্রভাব ফেলেছিল। যদিও অসংযত উচ্ছ্বাসের প্রকাশ ছিল অতি অল্পই। প্রাথমিক বিস্ময়ের পর এখন যখন মতামতগুলি ধীরে ধীরে দানা বাঁধতে শুরু করেছে, তখন নৈতিক মনোবলকে প্রভাবিত করার মতো বিষয়গুলি পুনরায় কতদূর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তা প্রতীয়মান হচ্ছে।

ব্রিটিশ সৈন্যদল

১১. এই 'সামারি'গুলিতে যেমন পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছিল—ব্রিটিশ সৈন্যদল, প্রায় কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই, পূর্ব এশিয়ায় চাকুরিতে যেতে অনিচ্ছুক। তারা হিসেব করে সময় কাটায় যে, আর কতোদিন বাদে মুক্তি পেয়ে অথবা পুনর্বাসনের ফলে তাঁরা ইংল্যণ্ডে এবং তাদের পরিবারের কাছে ফিরে যেতে পারবে। এই মনোভাব অফিসারদের কাছে চরম দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছিল। তাঁরা ভেবেছিলেন যে, এটি বি. ও. আর-দের (BOR) জাপানীদের পরাজিত করার মনোবলকে নষ্ট করে দেবে। কিন্তু এখন আর পরাজিত করার মতো কোন জাপানী নেই। এটা স্পষ্ট যে সাধারণ ভাবে ব্রিটিশ সৈন্যরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে।

* গোপনীয় *

পার্লামেণ্ট

হাউস অব কমন্স

প্রশ্ন নং ১১, তাং ৭ই মার্চ, ১৯২৭

মিস্টার পেথিক-লরেন্স : আণ্ডার সেক্রেটারী অব স্টেট ফর ইণ্ডিয়ার নিকট প্রশ্ন, মিস্টার সুভাষ বসুর প্রসঙ্গে বর্মা সরকারের চীফ মেডিকেল অফিসার এবং একজন চিকিৎসক সহকর্মীর রিপোর্টটির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে কিনা যে তাঁর জেলে কারারুদ্ধ থাকাকালীন পরিবেশকে তাঁরা তাঁর স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের পক্ষে উপযোগী বলে মনে করেন না; আর এই ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চান।

মিস্টার পেথিক লরেন্সের ৭ই মার্চ, ১৯২৭ তারিখের ১১নং প্রশ্নের উত্তর :

আমি রিপোর্টটি দেখিনি, তবে আমার সদাশয় বন্ধু তদন্ত করবেন।

(আই. ও. আর ফাইল নং এল/পি এণ্ড জে/৭/৭৯২ পৃ ৩১৩)

হাউস অব কমন্স

প্রশ্ন নং ৫, তাং ১৪ই মার্চ, ১৯২৭

মিস্টার ল্যান্সবুরী : আণ্ডার সেক্রেটারী অব্ স্টেট ফর ইণ্ডিয়ার নিকট প্রশ্ন, তিনি বলতে পারেন কিনা যে কলকাতা কর্পোরেশনের চীফ এক্জিকিউটিভ অফিসার মিস্টার সুভাষচন্দ্র বসু কতদিন অন্তরীণ আছেন; তাঁর বিরুদ্ধে কখনও কোন নির্দিষ্ট অভিযোগ আনা হয়েছে কিনা; তেমন কোন অভিযোগের উত্তরে সুভাষচন্দ্র বসু কোন লিখিত উত্তর দিয়েছেন কিনা; এবং তিনি তাঁর বিরুদ্ধে গঠিত অভিযোগের শর্তগুলি জানাতে পারেন কিনা।

উত্তর

১৯২৪ সালের অক্টোবর মাসে মিস্টার বসু গ্রেফতার হন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের সারমর্ম তাঁকে জানানো হয়েছিল এবং উত্তর আহ্বান করা হয়েছিল তাঁর কাছ থেকে। লিখিত কিংবা অন্য কোন উপায়ে তিনি তা করতে অস্বীকৃত হন। মিস্টার বসুর বিরুদ্ধে অভিযোগের নির্দিষ্ট

চরিত্র জানাতে আমি অস্বীকার করছি। কেবল এইটুকুই বলতে পারি যে, সেগুলি ছিল বৈপ্লবিক অপরাধ সংগঠিত করার এক ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণের সমতুল্য।

(আই. ও. আর. ফাইল নং এল/পি এণ্ড জে/৭, ৭৯২ পৃ. ৩০৮)

হাউস অব কমন্স

প্রশ্ন নং ১৫, তাং ১৪ই মার্চ, ১৯২৭

মিস্টার ল্যান্সবুরী: আণ্ডার সেক্রেটারী অব্ স্টেট ফর ইণ্ডিয়ার নিকট প্রশ্ন, তিনি কি অবগত আছেন যে ১৯২৪ সালে এপ্রিল মাসে মিস্টার সুভাষ চন্দ্র বসু কলকাতা কর্পোরেশনের চীফ এক্‌জিকিউটিভ অফিসার-পদে নিযুক্ত হন এবং তাঁর নিয়োগ বাংলার গভর্নরের অনুমোদন লাভ করে; তাঁর নিযুক্তির ছ'মাসের মধ্যে বাংলা সরকারের নির্দেশে মিস্টার বসু অন্তরীণ হয়েছেন এবং উক্ত পদে তিনি পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন; এগুলি লক্ষ্য করার পর তিনি কি জানাবেন যে, তাঁর অন্তরীণ সত্ত্বেও, তাঁর পুনর্নির্বাচন বাংলার গভর্নরের অনুমোদন লাভ করেছে কিনা।

মিস্টার ল্যান্সবুরীর ১৪ই মার্চ, ১৯২৭, তারিখের ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর:

আমি অবগত আছি যে, আলোচ্য পদে অধিষ্ঠিত হবার জন্য মিস্টার বসুকে নিয়োগ করা হয়েছিল। এই নিয়োগ কর্পোরেশন কর্তৃক আরো অনেক নিয়োগের মতোই স্থানীয় সরকারের অনুমোদনসাপেক্ষ এবং সে অনুমোদন দান করা হয়েছিল; আমি জানি যে কর্পোরেশন মিস্টার বসুর অন্তরীণের সময় থেকে তাঁকে আইনত ছুটিতে আছেন বলে ধরে নিয়েছিল। তাঁর পরিবর্তে সেখানে একজন কাজ চালিয়ে ছিলেন তাঁর পক্ষে। তাই স্থানীয় সরকার কর্তৃক তাঁর পুনর্নিয়োগ কিংবা পুনঃ অনুমোদন দানের প্রশ্নই ওঠেনি।

মিস্টার ল্যান্সবুরী: বাহ্যত যে মানুষটির প্রতি এখনও কাউন্সিলের আস্থা রয়েছে তাঁর মুক্তির কাজকে কি ত্বরান্বিত করা যায় না?

আর্ল উইন্টারটন: না, মহাশয়। এই প্রশ্ন থেকে সেটি দাঁড়ায় না। আমি মাননীয় সদস্যকে আভাস দিতে চাই যে যদি কারারুদ্ধ কোন ব্যক্তির

প্রতি কোন কোন সংগঠনের আস্থাও থাকে; তবু সেটা তাঁর শাস্তি মকুবের কিংবা অন্য ব্যক্তির তুলনায় তাঁর প্রতি ভিন্ন আচরণের কোন যুক্তি হতে পারে না।

মিস্টার ল্যান্সবুরী : মহান্ লর্ড কি আমার সঙ্গে একমত হবেন না যে সম্ভবত যাঁরা তাঁকে জেলে পুরেছেন এবং সেখানে বিনা বিচারে আটক রেখেছেন সেই পৌর কর্তৃপক্ষ এই মানুষটি এবং তাঁর কাজকর্ম সম্পর্কে ততখানিই জানেন, যতখানি জানেন জনগণ ?

(আই. ও. আর. ফাইল নং এল/পি এণ্ড জে/৭/৭৯২ পৃ. ৩১১)

হাউস অব কমন্স

প্রশ্ন নং ১৬, তাং ২১শে মার্চ, ১৯২৭

মিস্টার থার্টল্ : আণ্ডার সেক্রেটারী অব্ স্টেট ফর ইণ্ডিয়ার নিকট প্রশ্ন, যিনি ভারতে আড়াই বছরেরও বেশী সময় ধরে বিনা বিচারে বন্দী হয়ে আছেন, সেই মিস্টার সুভাষ বসুর স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্পর্কে তাঁর কাছে আর কোন তথ্য আছে কিনা।

মিস্টার থার্টলের ২১শে মার্চ, ১৯২৭, তারিখের ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর :

আমি জানি যে, বিশেষ ডাক্তারী পরীক্ষা প্রকৃত অসুখের সন্ধান না দিলেও বন্দীর স্বাস্থ্য সন্তোষজনক নয়। উন্নততর পরিবেশে তাঁকে স্থানান্তরিত করার প্রশ্নটি বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে।

(আই. ও. আর. ফাইল নং এল/পি এণ্ড জে/৭/৭৯২ পৃ. ৩০১)

হাউস অব কমন্স

প্রশ্ন নং ৪, তাং ২৮শে মার্চ, ১৯২৭

মিস্টার পেথিক-লরেন্স : আণ্ডার সেক্রেটারী অব্ স্টেট ফর ইণ্ডিয়ার নিকট প্রশ্ন, মিস্টার সুভাষ বসুকে সুইজারল্যাণ্ডে যেতে দেবার বাংলা সরকারের প্রস্তাব কি কোন শর্তাধীন ; যদি হয়, তবে শর্তগুলি কি ; আর সেই শর্তগুলি কি মিস্টার বসু মেনে নিয়েছেন ?

২৮শে মার্চ, ১৯২৭, তারিখের মিস্টার পেথিক-লরেন্সের ৪নং প্রশ্নের উত্তর :

বাংলা সরকার মিস্টার বসুকে মুক্তিদানের যে প্রস্তাব দিয়েছেন, তার শর্তগুলি হল, তিনি প্রতিশ্রুতি দেবেন যে তিনি এমন এক জাহাজে রেঙ্গুন থেকে ইওরোপে যাবেন যেটি ভারতের কোন বন্দর স্পর্শ করে না। আর, তারপর বেঙ্গল ক্রিমিনালাল (এ্যামেণ্ডমেণ্ট) এ্যাক্টের সময়সীমা অতিক্রান্ত হবার আগে তিনি ভারত, বর্মা এবং সিংহলে প্রবেশের কোন চেষ্টা করবেন না। আমার সদাশয় বন্ধু, যিনি এ বিষয়ে ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন, এখনও জানতে পারেন নি যে মিস্টার বসু প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছেন কিনা। মিস্টার বসুর সমুদ্রযাত্রা করা উচিত এবং উচিত দীর্ঘদিন সুইজারল্যাণ্ডের স্যানেটোরিয়ামে থাকা—এই ডাক্তারী পরামর্শের পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী ধাপ হিসেবে এই প্রস্তাবটি করা হয়েছে।

মিস্টার পেথিক লরেন্স: "যতোদিন না বেঙ্গল ক্রিমিনাল ল (এ্যামেণ্ডমেণ্ট) এ্যাক্টের সময়সীমা অতিক্রান্ত হয়" এই উক্তির দ্বারা ভারত-সরকার কি বোঝাতে চেয়েছেন যে স্বাভাবিক ভাবে অতিক্রান্ত হবার দিনটি পর্যন্ত, অথবা বোঝাতে চেয়েছেন যে এটির সময়সীমা বাড়ান হলে পর যখন এটির সমাপ্তি টানা হবে?

আর্ল উইন্‌টারটন: আমি ভাল করে জানিনা তাঁর অতিরিক্ত প্রশ্নটির সাহায্যে মাননীয় সদস্য কি বোঝাতে চেয়েছেন। আমার উত্তরটি অত্যন্ত সরল ছিল। এই প্রতিশ্রুতিটি হ'ল বেঙ্গল ক্রিমিনাল ল (এ্যামেণ্ডমেণ্ট) এ্যাক্টের সময়সীমা যতোদিন না অতিক্রান্ত হয়, অর্থাৎ তার সমাপ্তি ঘটে।

মিস্টার পেথিক-লরেন্স: তার অর্থ কি এই যে যতোদিন না বর্তমান আইনের অবলুপ্তি ঘটে, অথবা এর সময়সীমা বাড়ানো হলে যতোদিন না তার সমাপ্তি ঘটে?

আর্ল উইন্‌টারটন: স্পষ্টতই এর অর্থ যখন এটির অবসান ঘটবে।

(আই. ও. আর. ফাইল নং এল/পি এণ্ড জে/৭/৭৯২ পৃঃ ২৮৫)

ইউ. এস. এস.

ব্যাপারটির মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত বাহৃত মিস্টার পেথিক-লরেন্স প্রতি সপ্তাহে বারবার প্রশ্নটি উত্থাপন করতে চাইবেন। দুদিন আগে এই শেষ প্রশ্নটি পাবার পর আমার উদ্দেশ্য ছিল সোমবারের সকাল পর্যন্ত কি তথ্য পাই বা না পাই তার ভিত্তিতে প্রস্তাবিত উত্তর রচনা করার জন্য অপেক্ষা করা। আমাকে অবশ্য এটা বলা হয়েছে যে লর্ড উইন্টারটন ভাবতে পারেন যে প্রশ্নটি সম্পর্কে দীর্ঘদিন পূর্বে বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার ফলে দফতরের তারবার্তা মারফত আগামী সোমবার কি উত্তর দেওয়া যেতে পারে সে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল। আমি ভেবেছিলাম এবং এখনও ভাবি, এই ব্যবস্থা গ্রহণের কোন প্রয়োজন নেই। কারণ ২৪শে মার্চ এই একই প্রশ্ন সম্পর্কে তারবার্তা মারফৎ উত্তর চেয়ে একটা তারবার্তা পাঠিয়েছিলাম। এই তারবার্তাটি বাংলা সরকারের বক্তব্যকে পুনরাবৃত্তি করে পাঠানো ভারত সরকারের ২৩শে মার্চ তারিখের তারবার্তাকে "ক্রস" করে গেছিল। আর ফলে ২৭শে ও ২৮শে মার্চ তারিখে ভারত সরকারের পাঠানো পরবর্তী দুটি তারবার্তার একটি প্রায় নিশ্চিতভাবে জানিয়েছে যে, বসুর কাছ থেকে নিশ্চয় করে কিছু জানা মাত্রই বাংলা সরকার. কিংবা ভারত সরকার এই অফিসকে তা দ্রুত জানাতে আর ভুলে যাবেন না। আমরা অবশ্যই বাংলা সরকারকে তাঁদের প্রস্তাব বসুকে লিখিতভাবে জানাতে সরাসরি নির্দেশ দিতে পারি না। আমরা যা করতে পারি, তা হল তারবার্তা পাঠানো এবং বলা যে সোমবার উত্তরের জন্য আবার এই প্রশ্ন তোলা হয়েছে এবং আমরা কি উত্তর দেব? আমি স্বীকার করি যে এটা করা অর্থহীন।··· (যদি প্রস্তাবটি সরাসরি কাছে পাঠানো হয়, তবে সম্ভবত তিনি তা ফেরত দেবেন। তা করবেন এটা জেনে যে, যে-কোন ক্ষেত্রেই তাঁকে আর বেশি দিন কারারুদ্ধ করে রাখা যাবে না।)

স্বাঃ ডাওসন

৩১. ৩. ২৭

(আই. ও. আর. ফাইল নং এল/পি এণ্ড জে/৭/৭৯২ পৃ. ২৮০)

হাউস অব কমন্স

প্রশ্ন নং ৪, তাং ৪ঠা এপ্রিল, ১৯২৭

মিস্টার পেথিক লরেন্স : আণ্ডার সেক্রেটারী অব স্টেট ফর ইণ্ডিয়ার নিকট প্রশ্ন, তাঁর শর্তাধীন মুক্তি সম্পর্কে ভারত সরকারের প্রস্তাবের কোন উত্তর মিস্টার সুভাষ বসু এখন দিয়েছেন কিনা।

মিস্টার পেথিক-লরেন্সের ৪ঠা এপ্রিল, ১৯২৭, তারিখের ৪নং প্রশ্নের উত্তর :

না, মহাশয়।

অতিরিক্ত প্রশ্ন

মিস্টার পেথিক-লরেন্স : ভারত সরকার কি এমন কোন প্রস্তাব-দানের সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করছেন যার ফলে ভারত সরকারের ইচ্ছানুসারে মিস্টার বসুকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত অবস্থায় থাকতে না হয়?

আর্ল উইনটারটন : না, মহাশয়। অবস্থা হল এই যে, একটি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল এবং সেটি গ্রহণ কিংবা বর্জন করার ব্যাপারটি মিস্টার বসুর। যদি এবং কখন মিস্টার বসু এটিকে গ্রহণ কিংবা প্রত্যাখ্যান করেন, তা তারবার্তা মারফত জানাতে আমার সদাশয় বন্ধু ভারত সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছেন। বিষয়টি এ অবস্থায় আছে।

(আই. ও. আর. ফাইল নং এল/পি এণ্ড জে.৭/৭৯২ পৃ. ২৭৮)

আমি সম্পূর্ণ একমত

জরুরী

এ এইচ *

২.৫

লর্ড উইনটারটনের নোট

ইউ. এস. অব. এস.

পি. এস.

আমি স্যার এম. সিটনের বিকল্পটি পছন্দ করি, কিন্তু যদি অতিরিক্ত প্রশ্নে জানতে চাওয়া হয়, "আপনারা এ বিষয়ে কি করতে চলেছেন?" তাহলে

আমাকে কি বলতে হবে সে সম্পর্কে আমি সেক্রেটারী অব্ স্টেটের নির্দেশটি চাইব ; অথবা যদি তা সময়মতো সে উপদেশ না পাওয় যায় তবে চাইব ঐ দফতরের কোন পরামর্শ।

ব্যাপারটি, যেমন মিস্টার ডাওসন নিম্নের ফাইলে ইঙ্গিত করেছেন, অত্যন্ত জরুরী এবং আমি ভাবতে বাধ্য যে যদি মিস্টার বসুর অবস্থা খুব খারাপ হয় তবে মিস্টার থার্টল্ একদিন সভা মুলতুবীর প্রস্তাব উত্থাপনের চেষ্টা করবেন। তখন বিনাশর্তে মুক্তির দাবিকে প্রত্যাখ্যান করার নীতি সমর্থন করা অত্যন্ত কষ্টকর হবে। একটি অতিরিক্ত প্রশ্নে মিস্টার ল্যান্সবুরী ইতিমধ্যেই ভারত সরকারের বিরুদ্ধে (স্পিকার যেটিকে বাতিল করে দিয়েছেন) "এই মানুষটিকে হত্যা করার প্রচেষ্টা"র অভিযোগ এনেছেন। আমার মত হচ্ছে সম্ভাব্য অতিরিক্ত প্রশ্নটির উত্তরে, আমি বলব, "আমার সদাশয় বন্ধু ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন এবং এই মুহূর্তে আমার আর কোন বিবৃতি দেবার নেই।"

ডব্লিউ

* স্যার এ. হার্টেজল ১. ৫. ২৭

(আই. ও. আর. ফাইল নং এল/পি এণ্ড জে/৭/৭৯২ পৃ. ২৫৩)

হাউস অব কমন্স

প্রশ্ন নং ৬, তাং ২রা মে, ১৯২৭

মিস্টার থার্টেল্: আণ্ডার সেক্রেটারী অব্ স্টেট ফর ইণ্ডিয়ার নিকট প্রশ্ন, তিনি কি এখন জানাবার মতো অবস্থায় এসেছেন যে সুইজারল্যাণ্ডে বসবাস করার জন্য সরকারী প্রস্তাব মিস্টার সুভাষ বসু গ্রহণ করেছেন, কি করেন নি।

মিস্টার থার্টলের ২রা মে, ১৯২৭, তারিখের ৬নং প্রশ্নের উত্তর:

আমি জেনেছি যে তিনি গ্রহণ করেন নি।

অতিরিক্ত প্রশ্ন

মিস্টার থার্টল: সদাশয় লর্ড কি জানতে পারেন যে মিস্টার বসুর কাছে ভারত সরকারের আর কোন প্রস্তাব দেবার অভিপ্রায় আছে কিনা?

আর্ল উইন্‌টারটন : আমার সদাশয় বন্ধু ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন এবং এই মুহূর্তে আমার আর কোন বিবৃতি দেবার নেই।

(আই. ও. আর. ফাইল নং এল/পি এণ্ড জে/৭, ৭৯২ পৃ. ২৫৪)

হাউস অব কমন্স

প্রশ্ন নং ৪, তাং ৯ইমে, ১৯২৭

মিস্টার ল্যান্সবুরী : আণ্ডার সেক্রেটারী অব্ স্টেট ফর ইণ্ডিয়ার নিকট প্রশ্ন, বোম্বাই অর্ডিনান্সের অধীনে গ্রেফতার বন্দীদের অন্যতম মিস্টার বসুর স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্য কি তিনি সভাকে জানাবেন ; মিস্টার বসুর স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সরকার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন ; তাঁর মুক্তির ব্যবস্থা করার জন্য এবং বিনা বিচারে অন্যান্য যে সব বন্দী দীর্ঘদিন আটক আছেন, তাঁদের ব্যাপারে আর কি কোন পদক্ষেপ গ্রহণের অভিপ্রায় আছে ?

মিস্টার ল্যান্সবুরীর ৯ই মে, ১৯২৭, তারিখে ৪নং প্রশ্নের উত্তর :

অত্যন্ত সম্প্রাতিক বিস্তারিত কোন তথ্য আমার হাতে নেই, কেবল এটি ভিন্ন যে, ফেব্রুয়ারীতে দুজন চিকিৎসকের সাহায্যে তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষায় প্রাথমিক যক্ষ্মারোগের সম্ভাবনা ধরা পড়ার পর থেকে মিস্টার বসুর স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি ঘটে নি। ফলে তাঁকে বর্মা থেকে আলমোড়ায়—যক্ষ্মারোগীর পক্ষে ভারতে সবচেয়ে ভাল আবহাওয়া—স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গত শনিবার তাঁর রেঙ্গুন ত্যাগ করার কথা। বসু যখন কলকাতার উপর দিয়ে যাবেন তখন তাঁর নিজস্ব সার্জেন এবং মেডিকেল কলেজের একজন চিকিৎসককে দিয়ে বিশেষ ডাক্তারী পরীক্ষা করানোর ব্যবস্থা করছেন বাংলার গভর্নর।

মিস্টার বসু কিংবা বাংলায় আটক আর সব ব্যক্তিদের কারো মুক্তি সম্পর্কেই আমি কোন বিবৃতি দিতে পাবব না। কেবল এইটুকুই বলতে পারি যে গত ২১শে মার্চ ভারত সরকারের এক ঘোষণা মারফত এটা পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে, যার বিষয়বস্তু সরকারী বিপোর্টের সঙ্গে

আমি ২৮শে মার্চ বিতরণ করেছি, যে প্রত্যেক ব্যক্তির আটকের প্রশ্নটি ধারাবাহিক ভাবে পরীক্ষা এবং পুনরায় পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

মিস্টার ল্যান্সবুরী : এই উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে, মিস্টার স্পীকার, আপনার অনুমতিক্রমে, আমি এই প্রশ্নটিকে আগামীকালের মুলতুবী প্রসঙ্গে উত্থাপন করতে চাই।

মিস্টার টি উইলিয়মস : সদাশয় লর্ড কি বলতে পারেন যে বাংলার বন্দীদের কোন নির্দিষ্ট বিশেষে অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়েছে কিনা ?

আর্ল উইন্টারটন : এ প্রশ্নের দিক থেকে ওটি অবান্তর।

(আই. ও. আর ফাইল নং এল। পি এণ্ড জে।৭।৭৯২ পৃঃ ২৫০)

হাউস অব কমন্স

১৬ই মে, ১৯২৭

আটক ব্যক্তিরা (স্বাস্থ্য)

মিস্টার টি. উইলিয়মস : আণ্ডার সেক্রেটারী অব্ স্টেট ফর ইণ্ডিয়াকে প্রশ্ন, ১৯২৫ সালের ক্রিমিনাল ল এ্যামেণ্ডমেণ্ট এ্যাক্টের অধীনে আটক বন্দী যাঁরা যক্ষ্মারোগের আক্রান্ত হয়েছেন অথবা হয়েছেন বলে সন্দেহ করা হচ্ছে, তাঁদের নাম তিনি জানাবেন কিনা ; সরকার এইসব বন্দীদের তাঁদের স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য আরো উপযোগী পরিবেশে সরিয়ে নিয়ে যাবার কথা বিবেচনা করছেন কিনা ?

আর্ল উইন্টারটন : আলোচ্য ব্যক্তি দু'জন হলেন—জীবনলাল চট্টোপাধ্যায় এবং সুভাষচন্দ্র বসু। প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে একমাস আগে একটি স্যানেটোরিয়ামে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। মিস্টার বসু সম্পর্কে আগামী দু'দিনের মধ্যে আমি একটি ঘোষণা করতে পারব বলে আশা করছি।

(আই. ও. আর. ফাইল নং এল/পি এণ্ড জে/৭/৭৯২ পৃ. ২৪৮)

হাউস অব কমন্স

প্রশ্ন নং ৬৭, তাং ১৯শে মে, ১৯২৭

মিস্টার ল্যান্সবুরী : আণ্ডার সেক্রেটারী অব্ স্টেট ফর ইণ্ডিয়ার নিকট

প্রশ্ন, তিনি যদি জানান যে কোন শর্ত, যদি থেকে থাকে, মিস্টার বসুর মুক্তির সঙ্গে যুক্ত ছিল ; তাঁর বিনা বিচারে আটক থাকার সঠিক মেয়াদ কতো ; সেই চারজন চিকিৎসকের তৈরী রিপোর্টের একটি কপি কি তিনি সভার টেবিলে হাজির করবেন, যে রিপোর্টের ভিত্তিতে গভর্নর জেনারেল তাঁকে মুক্তির আদেশ দেন ? বেঙ্গল অর্ডিনান্সের অধীনে বন্দী অথবা আটক বাকী ব্যক্তিদের মুক্তি দেবার কোন অভিপ্রায় আছে কিনা ; অর্ডিনান্স প্রত্যাহার করে নেবার প্রশ্নটি সরকার বিবেচনা করে দেখছেন কিনা ?

মিঃ ল্যান্সবুরীর ১৯শে মে, ১৯২৭ তারিখের ৬৭ নং প্রশ্নের উত্তর :

মিস্টার বসুর মুক্তির ব্যাপারে কোন শর্ত আরোপ করা হয় নি। ১৯২৪ সালের ২৫শে অক্টোবর থেকে তিনি আটক আছেন। সর্বশেষে ডাক্তারী পরীক্ষার কোন আনুষ্ঠানিক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। প্রশ্নের শেষ দুটি অংশের উত্তর নেতিবাচক।

(আই. ও. আর. ফাইল নং এল/পি এণ্ড জে/৭/৭৯২ পৃ. ২৪৬)

হাউস অব কমন্স

প্রশ্ন নং ৯, তাং ২৩শে মে, ১৯২৭

মিস্টার ল্যান্সবুরী : আণ্ডার সেক্রেটারী অব্ স্টেট ফর ইণ্ডিয়ার নিকট প্রশ্ন, এ বিষয়ে তিনি কি তদন্ত করে দেখবেন যে চারজন চিকিৎসকের দ্বারা ডাক্তারী পরীক্ষার, যা গভর্নর-জেনারেলকে মিস্টার বসুর মুক্তির আদেশ-দানে প্ররোচিত করেছিল, কোন আনুষ্ঠানিক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল কিনা ; আর যদি তা হয়ে থাকে, তবে তিনি কি সেই রিপোর্টটি সভার সামনে হাজির করবেন।

মিস্টার ল্যান্সবুরীর ২৩ শে মে, ১৯২৭, তারিখের ৯নং প্রশ্নের উত্তর :

গত মঙ্গলবার মাননীয় সদস্যকে যেমন জানিয়েছিলাম তেমনি জানাতে চাই যে, প্রথম প্রশ্নটি সম্পর্কে আমার কাছে এখনও কোন তথ্য নেই। আর যদিও কোন আনুষ্ঠানিক রিপোর্ট তৈরী হয়ে থাকে তবে সেটি স্পষ্টতই একটি গোপনীয় দলিল। আমি সেটিকে সভার টেবিলে এনে হাজির করতে পারব না।

মিস্টার ল্যান্সবুরী : সদাশয় লর্ড কি মনে করেন না যে মিস্টার বসুর মুক্তির সময় তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্পর্কে ভারতীয় জনগণকে সরকারী ভাবে অবগত করানোর কাজটি জননিরাপত্তার স্বার্থের অনুকূল হবে ?

মিস্টার হান্নন : আমি কি প্রশ্ন করতে পারি যে এই প্রশ্নগুলির অধিকাংশকে যদি 'অর্ডার পেপারে'র বাইরে রাখা যায়, তবে তা জন-নিরাপত্তার স্বার্থের অনুকূল হবে কিনা।

আর্ল উইন্‌টারটন : আমি শংকিত যে আমি মাননীয় সদস্যের (মিস্টার ল্যান্সবুরী) পীড়াপীড়ির কারণ অনুধাবন করতে পারছি না। আমি যতোদূর জানি ডাক্তারী পরীক্ষার রিপোর্ট প্রকাশের অতীত কোন নজীর নেই, যে রিপোর্টের ফলে কোন ব্যক্তির মুক্তির অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আমি মনে করি না যে, যা স্পষ্টতই গোপনীয় রিপোর্ট, তা প্রকাশ করে কোন ভাবে জনস্বার্থ সাধন করা যেতে পারে।

মিস্টার ল্যান্সবুরী : এটা কি ঘটনা নয় যে এই ব্যক্তি তের মাস জেলে ছিলেন এবং তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা সংকটজনক বলে প্রত্যেকটি আনুষঙ্গিক রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে ; ভারত এবং এদেশের জনগণ কি জানতে চাইতে পারেন না যে ভারত সরকার তাঁর মুক্তিদানের আদেশ জারী করার সময় কেমন ছিল এই মানুষটির স্বাস্থ্য ?

আর্ল উইন্‌টারটন : না, মহাশয়। আমি মনে করি কোন ভাবেই তাদের জানবার অধিকার নেই। ভারত সরকার তাঁর বিচারবিভাগীয় ক্ষমতার প্রয়োগে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা এমন যে তাঁকে মুক্তি দেওয়া দরকার। বিষয়টির এখানেই থেকে যাওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

(আই. ও. আর. ফাইল নং এল/পি এণ্ড জে/২/৭৯২ পৃ. ২৪৪)

হাউস অব কমন্স

প্রশ্ন নং ১২, তাং ২৩শে মে, ১৯২৭

মিস্টার থার্টল্ : আণ্ডার সেক্রেটারী অব্ স্টেট ফর ইণ্ডিয়ার নিকট প্রশ্ন, তিনি যদি জানান যে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলার অন্যতম রাজনৈতিক

বন্দী মিস্টার সুভাষ বসুর আটক সম্পর্কে সরকারী নীতি পরিবর্তনের কারণগুলি কি।

মিস্টার থার্টলের ২৩শে মে, ১৯২৭, তারিখের ১২নং প্রশ্নে উত্তর ঃ

মিস্টার বসু স্বাস্থ্যের কারণে মুক্তি পান।

মিস্টার থার্টল্ ঃ সদাশয় লর্ড কি অবগত আছেন যে কিছুদিন পূর্বে তিনিই বলেছিলেন যে মিস্টার বসুর মুক্তিদান জননিরাপত্তার স্বার্থে অবিবেচনার কাজ হবে? আর তিনি কি জানাতে পারবেন যে পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন ঘটেছে, যার ফলে এটি এখন সুবিবেচনাপ্রসূত হয়ে উঠল?

আর্ল উইন্টারটন : তাঁর স্বাস্থ্য।

মিস্টার থার্টল্ ঃ তাঁর স্বাস্থ্যই কি একমাত্র পরিস্থিতি যা বিষয়টির বিবেচনার বস্তু হয়েছে?

আর্ল উইন্টারটন ঃ হ্যাঁ, মহাশয়। একমাত্র পরিস্থিতি যা ভারত সরকার এবং আমার সদাশয় বন্ধু সেক্রেটারী অব্ স্টেটকে তাঁদের গৃহীত ব্যবস্থাটি গ্রহণে বাধ্য করেছে তা হ'ল তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা।

(আই. ও. আর. ফাইল নং এল/পি এণ্ড জে/৭/৭৯২ পৃ. ২৪২)

হাউস অব কমনস্

বৃহস্পতিবার, ২রা জুন, ১৯২৭

মিস্টার ল্যান্সবুরী ঃ * * * * অবস্থাটা কি। গত ৯ই মে তিনি একটি উত্তর দিয়েছিলেন যে ৩০শে জানুয়ারী এবং ২১শে ফেব্রুয়ারী রিপোর্ট দুটিতে প্রকাশিত তথ্য অনুসারে একটি আইনের অধীনে ষোলজন ব্যক্তি কারাবাসে ছিলেন। পাঁচজনকে সরানো হয়েছিল এবং ক্রিমিনাল ল এ্যামেণ্ডমেন্ট এ্যাক্টের অধীনে গ্রামে অন্তরীণ করে রাখা হয়। ৬১ জন আটক ব্যক্তির মধ্যে ৪২ জন বেঙ্গল অর্ডিনান্সের অধীনে জেলে ছিলেন। সুতরাং মানুষকে বিনা বিচারে বন্দী করার কাজটি এখনও চলেছে।

আর্ল উইন্টারটন ঃ মাননীয় সদস্য ওকথা বলবেন না। মিস্টার বসুর বিচার করা হয়েছিল।

মিস্টার ল্যান্সবুরী : এটি এড়িয়ে যাবার ওটি খুব ভাল পথ। তাঁকে গোপনে বিচার করা হয়েছিল। দুজন জজ জেলে যান এবং কোন আইন-জীবীর সাহায্য ছাড়াই মানুষটিকে হাজির করা হ'ল তাঁদের সামনে। অথবা কেউ জানলো না তিনি কি বললেন কিংবা অন্য কেউ কি বললেন তাঁকে। বিচার বলে বর্ণনা করার মতো এটি একটি অতি চমৎকার জিনিস। অতীত দিনে এটিকে 'ইন্‌কুইজিসন'* বলা হত। সদাশয় লর্ড অত্যন্ত ভালভাবেই জানেন যে যখন আমি বলি যে এই মানুষগুলি বিনা বিচারে জেলে রয়েছেন তখন আমি সেই ধরনের বিচারকেই বোঝাতে চাই যাকে বাইরের সাধারণ মানুষ বিচার বলেন।

আর্ল উইন্‌টারটন : আমি তা বলিনি। আমি কেবল মাননীয় সদস্যের অনিচ্ছাকৃতভাবে ব্যবহৃত অযথাযথ পরিভাষাটির সংশোধন করে দিচ্ছিলাম। তিনি বলেছিলেন যে ঘটনাগুলি বিবেচনা করে দেখা হয়নি। একটা তফাত রয়ে গেছে।

মিস্টার ল্যান্সবুরী : কোন তফাত রয়েছে বলে আমি মনে করি না। দু'জন বিচারক জেলে গেলেন এবং একজন মানুষকে তাঁদের সামনে হাজির করলেন, যেমন তাঁকে করা হয়েছে বলে বসু জানিয়েছেন ; এটিকে বিচারের পদবাচ্য বলে বিবেচনা করতে আমি রাজী নই। তিনি জানিয়েছেন যে, বিস্ফোরক পদার্থ প্রস্তুতিতে সাহায্য করা, সরকারী কর্মচারীকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করা এবং এমন সব কাজ করেছেন বলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন তাঁরা। কিন্তু জেলে কোন প্রমাণ দেখানো হয়নি। বসুর সামনে কোন প্রমাণ হাজির করা হয়নি। কোন প্রমাণ দাখিল করার অনুমতি দেওয়া হয়নি তাঁকে এবং ঠিক এই কারণেই তাঁর বিচার করা হয়নি। যদি মিস্টার বসুকে জানালে হতো যে তাঁর বিরুদ্ধে কারা এই সংবাদের সরবরাহক —(বাধা) জারও ঠিক এই ধরনের যুক্তিপ্রয়োগে অভ্যস্থ ছিলেন। এটা ছিল লর্ড বালফোরের যুক্তি। 'কোয়ার্সন এ্যাক্টে'র অধীনে আটক আইরীশ বন্দীদের সম্পর্কে 'ট্রেজারী বক্স' থেকে লর্ড বালফোরকে আমি বহুবার এই একই বিবৃতি দিতে শুনেছি। সদাশয় লর্ড আমার সঙ্গে একমত হয়েছেন

* প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধমত দমনার্থে স্থাপিত বিচারালয়—লেখক।

যে আমার আলোচিত বন্দীদের জন্য সাধারণ বিচারের ব্যবস্থা করা হয়নি, যা সাধারণ বন্দীরা পেয়ে থাকেন।

(আই. ও. আর ফাইল নং এল/পি এণ্ড জে/৭/৭৯২ পৃ: ২৪০)

কার্যাবলীর বিবরণ সম্বলিত কাগজপত্র

২রা জুন মুলতুবী প্রস্তাবের উপর বির্তক চলাকালে লর্ড উইন্টারটন এবং মিস্টার ল্যান্সবুরীর মধ্যে উত্থাপিত বিষয়টি সম্পর্কে আরো আলোচনাকালে প্রশ্নটি রাখা হয়েছিল বলে ধরা যায়—হানসার্ডের সংযুক্ত উদ্ধৃত অংশ দেখুন।

দেবার মতো সবচেয়ে ভাল ধরনের উত্তর সম্পর্কে আমার কিছু সন্দেহ রয়েছে, প্রশ্নটিতে স্বীকৃত ঘটনা দুটি যেহেতু— মিস্টার ল্যান্সবুরী যেমন সম্ভবত জানেন—কখনও ঘটেনি। ফলে কোনটির ক্ষেত্রেই দিন নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

১৮১৮ সালের রেগুলেশন থ্রি অনুসারে ১৯২৪ সালের ২৫শে অক্টোবর মিস্টার বসু গ্রেফতার হন। তিনি গ্রেফতার হন ঠিক সেই দিনটিতে যেদিন ক্রিমিনাল ল এ্যামেণ্ডমেণ্ট অর্ডিনান্স পাস হয়। ১৯২৫ সালের ১৯শে জানুয়ারী তাঁকে অর্ডিনান্সটিতে "বদলী" করা হয় এবং রেগুলেশনটির অধীনে তাঁর আটক ওয়ারেণ্টের স্থলাভিষিক্ত করার জন্য বিধিবদ্ধ আইনটির অধীনে আটক রাখার নির্দেশ জারী করা হয়।

কোন এক সময়—১৯২৪ সালের নভেম্বর কিংবা ডিসেম্বর, অথবা ১৯২৫-এর জানুয়ারীতে—১৯২৫ সালের অক্টোবর মাসে রেগুলেশন থ্রির অধীনে গ্রেফতার ১৯ জন ব্যক্তির (সুভাষ বসু সহ) মামলা পরীক্ষা করে দেখার জন্য দুজন সেসন জজের সামনে সেগুলি উপস্থিত করা হয়েছিল। এটা স্পষ্টতই করা হয়েছিল, কারণ, আইন অনুসারে অর্ডিনান্সটির অধীনে এই কারণে গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে তা করার প্রয়োজন ছিল। এই ব্যাপারে রেগুলেশনের অধীনে বন্দী এবং অর্ডিনান্সের অধীন বন্দীদের ক্ষেত্রে পার্থক্য করার কোন যুক্তি নেই। জজেরা তাঁদের রিপোর্ট দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন—সুভাষ সহ তিন ব্যক্তির বিষয়ে ১৯২৫ সালের ৯ই জানুয়ারী তারিখে এবং বাকী সকলের ৬ দিন পরে।

আমরা যত দূর জানি, এই বিচারকেরা যাঁদের সম্পর্কে রিপোর্ট দিচ্ছিলেন, সেই ব্যক্তিদের কখনও দেখেননি। তাঁদের রিপোর্টের ভিত্তি ছিল গোয়েন্দা দফতরের দলিলগুচ্ছ, যার মধ্যে ছিল অভিযোগগুলি এবং তার জন্য দেখানো কারণ. সুভাষ বসু সহ ব্যক্তিদের সম্পর্কে রিপোর্টিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ছিল :

"এই যুক্তিতে সুভাষচন্দ্র বসু একটি বিস্তারিত বিবৃতিদানে অস্বীকৃত হয়েছিলেন যে প্রমাণগুলি সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন না, এবং তাঁর বিরুদ্ধে সরকার ইতিমধ্যেই মনস্থির করে ফেলেছিলেন। তিনি কেবল মৌখিক ভাবে জানান যে তিনি 'নির্দোষ'।

যে বিবৃতিগুলির উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলি স্পষ্টতই তাঁর গ্রেফতারের অব্যবহিত পরে কিছু ব্যক্তির কাছে করা (বা না করা) হয়েছিল। অর্ডিনান্সটিতে—যা, ইতিমধ্যেই জানানো হয়েছে যে, কঠোরভাবে কার্যকর ছিল না—যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছিল সে অনুসারে স্থানীয় সরকারের পক্ষে এক মাসের মধ্যে দুজন বিচারকের সামনে "আপন আয়ত্তাধীন বাস্তব ঘটনা এবং পরিস্থিতি···এবং ব্যক্তিটির বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কিত একটি বিবৃতি···আর তিনি দিয়ে থাকলে তাঁদের নিকট তাঁর দেওয়া উত্তরসমূহ" দাখিল করার প্রয়োজন ছিল। অর্ডিনান্স অথবা বর্তমান আইনের অধীনে বিচারকদের পক্ষে সাক্ষ্য গ্রহণ কিংবা ব্যক্তিগতভাবে বন্দীদের শুনানি গ্রহণের কোন প্রশ্নই উঠে না। অথবা প্রশ্ন ওঠে না, মিস্টার ল্যান্সবুরী যেমন স্পষ্টতই ভেবে বসেছেন, তদন্তকারী বিচারকের জেলে যাবার।

আমরা যত দূর জানি, যে মামলায় বসু এবং তাঁর মতো অন্যান্যদের, গ্রেফতারের সময় অথবা তার অব্যবহিত পরে, উত্তর দিতে বলা হয়েছিল ; তা ছিল কেবল বিপ্লবী ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণকারী হবার এক সাধারণ অভিযোগ। তাঁর বিরুদ্ধে "প্রমাণে"র প্রকৃতি কিংবা বিস্তারিত বিবরণ জানানো হয়নি। যে ধারণা বিচারকগণের রিপোর্টে উল্লিখিত বিবৃতির সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়, তা হ'ল "যাঁদের সম্পর্কে আমরা এখন বিচার চালাচ্ছি, সেই তিন জনের (সুভাষ বসু যাঁদের অন্যতম) বিরুদ্ধে অভিযোগ হল·· হত্যার ষড়যন্ত্রের ; এবং সেই সঙ্গে ইণ্ডিয়ান আর্মস এ্যাক্ট এবং এক্সপ্লোসিভ সাবস্ট্যানসেস এ্যাক্টের ধারা লঙ্ঘন

করার অভিযোগ।” এটিও বাংলা সরকারের মুক্তিদানের প্রথম প্রস্তাবের উল্লেখ করে লেখা বসুর দীর্ঘ চিঠিটিতে দেওয়া বিবৃতির সঙ্গে মিলে যায়। বিবৃতিটি সংবাদপত্রে প্রচারিত হয়েছিল এবং মিস্টার ল্যান্সবুরী তাঁর উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন—“আমাকে শুধুই বলা হয়েছিল যে আমি ‘অস্ত্র আমদানি করার ষড়যন্ত্রের একজন অংশগ্রহণকারী, বিস্ফোরক পদার্থ প্রস্তুত করার এবং সরকারী কর্মচারী হত্যা করার জন্য দায়ী’। আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে আমার কিছু বলার আছে কিনা। আমার ভাবতে বিস্ময় বোধ হচ্ছে যে, মৃত স্যার ই. মার্শাল হল কিংবা স্যার জে. সাইমনও কেবল “দোষী” নয় ভিন্ন আর কোন কৈফিয়ত দিতে পারতেন কিনা—এবং ঠিক সেইটি আমি করেছি।”

প্রশ্নটির একমাত্র পাওয়া উত্তরটি নিম্নলিখিত বিবরণের মতো কিছু একটা ছিল বলে মনে হয়:

“আমি যত দূর জানি বসুকে ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর মামলায় তদন্তকারী বিচারকের সামনে হাজির করা হয়নি;” তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণও “পরীক্ষার জন্য বিস্তারিত ভাবে তাঁর কাছে” দাখিল করা হয়নি। আমার কোন বক্তব্য যদি এইসব বিষয়ে মাননীয় সদস্যকে বিপথগামী করে থাকে, তবে আমি দুঃখিত।”

স্বাঃ ডাওসন

১৪.৬.২৭

(আই. ও. আর. ফাইল নং এল/পি এণ্ড জে/৭/৭৯২ পৃ. ২৩৭-৩৮)

হাউস অব কমনস্

প্রশ্ন নং ৫১, তাং ১৫ই জুন, ১৯২৭

মিস্টার ল্যান্সবুরী: আণ্ডার সেক্রেটারী অব্ স্টেটের নিকট প্রশ্ন, তিনি কি সেই তারিখটি জানাবেন যেদিন মিস্টার বসুকে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ এবং কারারোধের কারণগুলি পরীক্ষা করে দেখার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট অথবা জজের সামনে হাজির করা হয়েছিল; আর সেই সঙ্গে সেই দিনটিও

যেদিন পরীক্ষা অথবা বিরোধিতা করার জন্য মিস্টার বসুর বিরুদ্ধে আনীত প্রমাণের চরিত্র বসুকে জানতে দেওয়া হয়েছিল।

মিস্টার ল্যান্সবুরীর ১৫ই জুন, ১৯২৭ তারিখের ৫১নং প্রশ্নের উত্তর :

আমি যত দূর জানি মিস্টার বসুকে তাঁর মামলায় তদন্তকারী জজদের সামনে ব্যক্তিগত ভাবে হাজির করা হয়নি। এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণও পরীক্ষার জন্য তাঁর কাছে দাখিল করা হয়নি। আমার কোন বক্তব্য যদি এ-বিষয়ে মাননীয় সদস্যকে বিপথগামী করে থাকে তবে আমি দুঃখিত।

(আই. ও. আর. ফাইল নং এল/পি এণ্ড জে/৭/৭৯২)

হাউস অব কমনস্

প্রশ্ন নং ৩১, তাং ২১শে নভেম্বর, ১৯২৭

মিস্টার ল্যান্সবুরী : আণ্ডার সেক্রেটারী অব্ স্টেট ফর ইণ্ডিয়ার নিকট প্রশ্ন, কলকাতা কর্পোরেশনের কার্যাধ্যক্ষ মিস্টার সুভাষচন্দ্র বসুর বিবৃতির প্রতি কি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে যে কৃত্রিম উপায়ে বিপ্লবী আন্দোলন সৃষ্টি করার জন্য পুলিশ প্ররোচক এজেণ্ট নিয়োগ করেছে। এই অভিযোগ খতিয়ে দেখার জন্য তিনি পূর্ণ তদন্তের ব্যবস্থা করবেন কিনা।

মিস্টার ল্যান্সবুরীর ২১শে নভেম্বর, ১৯২৭, তারিখের ৩১ নং প্রশ্নের উত্তর :

মিস্টার বসুর দেওয়া এই ধরনের কোন বিবৃতি আমি দেখিনি, তবে এ অভিযোগ প্রায়ই করা হয়। আমার সদাশয় বন্ধু এমন কোন পরিস্থিতির অস্তিত্ব সম্পর্কে তদন্ত করার প্রয়োজন বোধ করেন না। কারণ তার প্রকৃতই কোন অস্তিত্ব থাকলে সম্ভবত তা বাংলা সরকার এবং ভারত সরকারের দৃষ্টি এড়িয়ে যেত না।

অতিরিক্ত প্রশ্ন

মিস্টার ল্যান্সবুরী : মিস্টার বসুর পদাধিকারের পরিপ্রেক্ষিতে সদাশয় **লর্ড কি মনে করেন না যে এমন এক দায়িত্বশীল ব্যক্তির পক্ষ থেকে উত্থাপিত এমন এক গুরুতর বিবৃতি সম্পর্কে তদন্ত হওয়া উচিত নয় ?**

আর্ল উইন্‌টারটন : না, মহাশয়। আমি পূর্বেই সম্মানীয় ভদ্রলোককে জানিয়েছি যে, কোন কারারুদ্ধ ব্যক্তির অধিকৃত কোন পদ সম্পর্কে আমার কোন শ্রদ্ধা থাকতে পারে না। কারারুদ্ধ ব্যক্তিদের অভ্যাসই হ'ল এই ধরনের অভিযোগ জানানো। তাঁদের অতীত পদাধিকার যাই থাকুক না কেন, এ বিষয়টির উপর তার কোন প্রভাব নেই।

মিস্টার ল্যান্সবুরী : সদাশয় লর্ড কি জানেন যে এই ভদ্রলোক তাঁর শহরের নির্বাচিত মেয়র এবং তাই তাঁকে দায়িত্বশীল ব্যক্তি বলে গণ্য করা হয়, আর তিনি যে সব বিবৃতি দেন তা অত্যন্ত স্পষ্ট? এই পরিস্থিতিতে সেগুলিকে কি তদন্ত করে দেখা উচিত নয়? সদাশয় লর্ডকে কি আমি এও জিজ্ঞেস করতে পারি যে একজন রাজনৈতিক বিদ্রোহী হওয়া এবং ভিন্ন মত পোষণকারী এক সরকার কর্তৃক জেলে প্রেরিত হওয়া কখন একজন ব্যক্তির চরিত্রের পক্ষে ক্ষতিকর?

মিস্টার স্পীকার : প্রশ্নটি অত্যন্ত বিতর্কমূলক।

(আই. ও. আর. ফাইল নং এল/পি এণ্ড জে/৭/৭৯২ পৃ, ২৩৪-৩৫)

হাউস অব কমন্স

প্রশ্ন নং ১০, তাং ২৪শে অক্টোবর, ১৯৩২

মিস্টার জন : সেক্রেটারী অব্ স্টেটের নিকট প্রশ্ন, সুভাষচন্দ্র বসুর স্বাস্থ্য সম্পর্কে তাঁর কাছে কোন রিপোর্ট আছে কিনা; এই ভারতীয় নেতা জেলে চিকিৎসা-সংক্রান্ত কোন বিশেষ পরিচর্যা লাভ করেছেন কিনা।

মিস্টার জনের ২৪শে অক্টোবর, ১৯৩২, তারিখের ১০ নং প্রশ্নের উত্তর :

হ্যাঁ, মহাশয়। সম্প্রতি মিস্টার বসুকে যুক্তপ্রদেশের ভাওয়ালীতে রাজা সপ্তম এডোয়ার্ড স্যানেটোরিয়ামে বদলী করা হয়েছে।

আমি আজই সকালে স্যানেটোরিয়াম থেকে তারবার্তা মারফত এক রিপোর্ট পেয়েছি যে তাঁর অসুস্থতা প্রধানত অজীর্ণরোগ সংক্রান্ত প্রকৃতির বলে বিবেচনা করা হচ্ছে। কোন সক্রিয় ফুসফুসের কষ্ট ধরা পড়েনি।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যে মিস্টার বসু চলাফেরা-করা রুগীর মতো হয়ে উঠবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

(আই. ও. আর. ফাইল নং এল/পি এণ্ড জে/৭/৭৯২ পৃ. ২১২)

হাউস অব কমন্স

প্রশ্ন নং ৭, তাং ৩রা এপ্রিল, ১৯৩৩

মিস্টার টমাস উইলিয়ম্‌স : সেক্রেটারী অব্‌ স্টেট ফর ইণ্ডিয়ার নিকট প্রশ্ন, কেন মিস্টার সুভাষচন্দ্র বসুর পাসপোর্টে যুক্তরাজ্য এবং জার্মানিতে তাঁর প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে তার কারণ তিনি জানাতে পারেন কিনা; ভারত সরকার এ ব্যাপারে জার্মানীর সরকারের কাছ থেকে কোন চিঠিপত্র পেয়েছেন কিনা; এবং কি কারণে এ বাদ দেবার ঘটনাটি ঘটেছে।

মিস্টার টমাস উইলিয়ম্‌সের ৩রা এপ্রিল, ১৯৩৩, তারিখের ৭নং প্রশ্নের উত্তর :

১৮১৮ সালের রেগুলেশন থ্রির অধীনে মিস্টার সুভাষ বসুকে রাজবন্দী হিসাবে গ্রেফতার করা হয়েছিল এবং সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যের কারণে তাঁকে ইউরোপে আসবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসার জন্য এবং বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণের জন্য ইউরোপের যেসব দেশে তাঁকে যেতে দেবার প্রয়োজন বোধ করা হয়েছে, সেই সব ইউরোপীয় দেশ সফরের সুযোগ দেওয়া হয়েছে তাঁকে। কিন্তু তাঁর অতীত কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে স্থির করা হয়েছে যে, তাঁকে ভ্রমণের অবাধ স্বাধীনতা অর্পণ করা সম্ভব নয়। একটি বিদেশী সরকারের কাছ থেকে চিঠিপত্র পাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

অতিরিক্ত প্রশ্ন

মিস্টার উইলিয়মস্‌ : যোগ্য মাননীয় ভদ্রমহোদয় কি মনে করেন যে, ১৮১৮ সালে তৈরী একটি আইন এ ব্যাপারটির পক্ষে পর্যাপ্ত হওয়া উচিত, যখন তিনিই জানাচ্ছেন যে এই সফর হবে মিস্টার বসুর নিজের স্বাস্থ্যের উন্নতি করার ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে?

স্যার এস্‌. হোর : আমি মনে করি, মোটের উপর ভারত সরকার এই

মানুষটির প্রতি বেশ ভাল ব্যবহার করছেন। ইউরোপে তাঁর চিকিৎসার জন্য তাঁকে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন তাঁরা। কিন্তু তাঁর অতীত কার্যকলাপের নজিরের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা তাঁকে তাঁর ইচ্ছামতো যেখানে খুশি সফর করার অবাধ সুযোগ দিতে পারি না।

মিস্টার উইলিয়ম্‌স: মাননীয় ভদ্রমহোদয় যদি নিশ্চিত হয়ে থাকেন যে, বসুর একমাত্র ইচ্ছা তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন, তবে কি তিনি মনে করেন না যে তাঁকে জার্মানী অথবা এ দেশ সফর করার অনুমতি দেওয়া উচিত ছিল?

স্যার এস্. হোর: না। মাননীয় সদস্য খেয়াল করবেন যে, আমরা তাঁকে ইওরোপের সেই সব কেন্দ্রে চিকিৎসাগ্রহণের অনুমতি দিয়েছি যেখানে তিনি সেই চিকিৎসা পেতে পারেন। আমরা যতদূর জানি, তাঁর যে চিকিৎসার প্রয়োজন, তিনি তা তাঁর গন্তব্য শহরগুলিতে পেতে পারবেন।

(আই. ও. আর. ফাইল নং এল/পি এণ্ড জে/৭/৭৯২ পৃ. ১৩৬-৩৭)

হাউস অব কমনস্

প্রশ্ন নং ৬, তাং ১৩ই নভেম্বর, ১৯৩৩

লেফ্‌টেনান্ট কর্নেল স্যার ওয়াল্‌টার স্মাইলস: সেক্রেটারী অব্ স্টেট ফর ইণ্ডিয়ার নিকট প্রশ্ন, কলকাতার প্রাক্তন মেয়র মিস্টার সুভাষচন্দ্র বসু ভারতে প্রত্যাবর্তন করলে তাঁকে পুনরায় গ্রেফতার করার জন্য তিনি ভারত সরকারের কাছে আবেদন জানাবেন কিনা; কারণ তাঁর আনুগত্যহীনতা এবং চিকিৎসার কারণে সুইজারল্যাণ্ডে অগ্রসর হবার জন্য বাংলায় আটক অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার পরবর্তী সময়ে তাঁর শত্রুতামূলক আচরণ।

লেফ্‌টেনান্ট কর্নেল স্যার ওয়াল্‌টার স্মাইল্‌সের ১৩ই নভেম্বর, ১৯৩৩, তারিখের ৬ নং প্রশ্নের উত্তর:

স্যার এস্. হোর: মিস্টার বসুকে মুক্তি দিয়ে ভারত সরকার তাঁর ভারতে প্রত্যাবর্তনকালে ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্ণ স্বাধীনতা বজায় রেখেছেন।

(আই. ও. আর. ফাইল নং এল/পি এণ্ড জে/৭/৭৯২ পৃ. ৯১)

হাউস অব কমন্স

প্রশ্ন নং ৬৫, তাং ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫

মিস্টার থর্প : সেক্রেটারী অব্ স্টেট ফর ইণ্ডিয়ার নিকট প্রশ্ন, কোন্ তারিখে বঙ্গীয় কংগ্রেসের সভাপতি মিস্টার সুভাষচন্দ্র বসু বিপজ্জনক রাজনৈতিক প্রজা হিসাবে আটক অবস্থা থেকে মুক্তি পান ; তাঁর মুক্তির পর থেকে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে কোন সুবিধা দিয়েছেন কিনা, দিয়ে থাকলে, কি সেই সুবিধা ; কোন রকম ব্রিটিশবিরোধী প্রচারে তাঁর নিজেকে যুক্ত করার প্রচেষ্টা বন্ধ করার জন্য কোন শর্ত আরোপ করা হয়েছে কিনা ; ইতালিতে এই ভদ্রলোকের সাম্প্রতিক বিবৃতিটির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে কিনা, যে বিবৃতিতে তিনি মন্তব্য করেছেন যে, ইংরেজদের পণ্যদ্রব্য বর্জন করা উচিত এবং পৃথিবীর অন্য দেশ থেকে পণ্যদ্রব্য আমদানি করা উচিত ; এই এবং এই ধরনের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য তিনি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা বিবেচনা করছেন কিনা।

মিস্টার থর্পের ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫, তারিখের ৬৫নং প্রশ্নের উত্তর :

স্যার এস্. হোর : ডাক্তারী চিকিৎসার প্রয়োজনে তিনি যাতে ইউরোপে যেতে পারেন, তাই ১৯৩৪ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী মিস্টার বসুকে মুক্তি দেওয়া হয়। পিতার মৃত্যুর কারণে তাঁর সাম্প্রতিক স্বল্পসময়ের ভারত সফর ভিন্ন, সেই সময় থেকেই তিনি ইউরোপে অবস্থান করছেন। প্রশ্নে ইতালিতে মিস্টার বসুর যে ধরনের বিবৃতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তেমন কিছু বিবৃতির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আমি বুঝতে পারছি না যে এই পরিস্থিতিতে আমার পক্ষে কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব বলে মাননীয় সদস্য মনে করেন।

অতিরিক্ত প্রশ্ন

মিস্টার থার্প : মাননীয় সদস্য কি মনে করেন যে মিস্টার বসুর আয়ারল্যাণ্ড ভ্রমণের ফলে কোন খারাপ কিছু ঘটতে পারে ?

মেজর—জেনারেল স্যার আলফ্রেড নক্স : আণ্ডার সেক্রেটারী কি বলতে পারেন যে তিনি ডাবলিনে ডাক্তারী চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন কিনা ?

মিস্টার বাটলার : তিনি ডাবলিনে কি করেছেন সে সম্পর্কে আমি অবগত নই।

(আই. ও. আর. ফাইল নং এল/পি এণ্ড জে/৭/৭৯৩ পৃ. ১২৪)

হাউস অব কমনস্
প্রশ্ন নং ৫, তাং ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৩৫

মিস্টার থার্টল : আণ্ডার সেক্রেটারী অব্ স্টেট ফর ইণ্ডিয়ার নিকট প্রশ্ন, তিনি জানাতে পারেন কিনা যে মিস্টার সুভাষচন্দ্র বসুকে একবারও এ দেশ সফরের অনুমতি দেওয়া হয়নি।

মিস্টার থার্টলের ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৩৫, তারিখের ৫নং প্রশ্নের উত্তর :

মিস্টার বাটলার : মাননীয় সদস্য সম্ভবত মিস্টার সুভাষচন্দ্র বসুর বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ সম্বন্ধে অবগত আছেন। যার ফলে তাঁকে বেঙ্গল স্টেট প্রিজনরস রেগুলেশনের অধীনে ভারতে আটক করার নির্দেশ জারীর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারীতে তাঁর বন্দী-অবস্থা থেকে মুক্তিদানের একমাত্র কারণ ছিল ইউরোপের বিশেষ কতকগুলি দেশে তাঁর সফরের সুযোগ করে দেওয়া, যেখানে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের দ্বারা চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া যেতে পারে। আমার সদাশয় বন্ধুর ধারণা যে, এদেশে তাঁর উপস্থিতি অবাঞ্ছিত হবে। তার মুক্তির পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এদেশ সফরের জন্য তাঁকে পাসপোর্টের সুযোগদানে তিনি প্রস্তুত নন। অবশ্য যে কারণে মূলত পাসপোর্টের অনুমোদন করা হয়েছে যদি না সেই চিকিৎসার কারণে তা জরুরী হয়ে পড়ে।

অতিরিক্ত প্রশ্ন

মিস্টার থার্টল্ : যদি মিস্টার বসু এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি এদেশে

কোন রাজনৈতিক প্রচারে অংশগ্রহণ করবেন না, তবে মাননীয় ভদ্রমহোদয় এই নিষেধাজ্ঞা পরিবর্তনের কথা বিবেচনা করবেন ?

মিস্টার বাটলার: আমি শঙ্কিত, যে কেবল চিকিৎসার কারণেই বিষয়টির পুনর্বিবেচনার প্রতিশ্রুতি দিতে পারি আমি।

কর্নেল ওয়েজউড: এটা কি ঘটনা যে তাঁর ভাই, মিস্টার শরৎ বসু, যিনি বাংলায় অন্তরীণ ছিলেন, এখন মুক্তি পেয়েছেন এবং তাঁর স্বাভাবিক পেশা চালিয়ে যাবার স্বাধীনতা পেয়েছেন ?

৯.১২.৩৫ তারিখে ৫ নং প্রশ্নের দফতরের নোট

১. মিস্টার থার্টলের ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৩৫, তারিখের প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য ৬.১২.৩৫ তারিখে মিস্টার জনসন যে কার্যবিবরণী প্রস্তুত করেন, তা পড়ার পক্ষে আকর্ষণীয়:

"এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে অক্টোবর মাসে বসু ভিয়েনার কন্‌সালের কাছে এক নতুন পাসপোর্টের জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। তাঁর কাছে তখন যেমন একটি পাসপোর্ট ছিল, তেমন, একই ধরনের অনুমোদনযুক্ত, আরেকটি পাসপোর্ট তাঁকে দেবার অধিকার ছিল কন্‌সালের। কিন্তু তিনি সে নির্দেশ অনুসরণ করেন নি এবং ইওরোপের সমস্ত দেশের পক্ষে বৈধ একটি পাসপোর্ট তাঁকে দেন। এটা যখন নজরে আসে তখন কন্‌সালকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে তিনি যেন তাঁর ভুল সংশোধনের জন্য সবরকম সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা করেন। সেই সঙ্গে এ ব্যাপারেও সতর্ক থাকতে বলা হয় যে, সুভাষের কাছে যেন এটা প্রকাশ না পায় যে তাঁর আয়ত্তাধীন পাসপোর্টটি এ দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ বৈধ। সুভাষ বসুর সঙ্গে কন্‌সালের ঠিক কি কথাবার্তা হয়েছে সে সম্পর্কে বৈদেশিক দফতর এখনও তথ্য সংগ্রহ করে উঠতে পারে নি এবং এও জানতে পারে নি যে তিনি কিভাবে তাঁর ভুল সংশোধনের আশা করেন। এই পরিস্থিতিতে এই প্রশ্নের উত্তরদানের ক্ষেত্রে সতর্কতা গ্রহণের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। এমন ইঙ্গিতদানের প্রয়োজন নেই যে বসুর এ দেশে আসার অনুমতির কিংবা তার পাসপোর্টটির উপর অতিরিক্ত কোন অনুমোদনের প্রয়োজন আছে…"।

(আই. ও. আর. ফাইল নং এল/পি এণ্ড জে/৭/৭৯৩ পৃ. ২৭৫)

মিস্টার পীলের উদ্দেশ্যে লেখা নোট

খসড়া উত্তরের শেষে আমি পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চাই, "তাঁকে এ দেশে আসার সুযোগ দেওয়া কাম্য নয় বলেই আমাদের ধারণা।" আমরা জানি আমাদের যুক্তি দুর্বল। বসু নিজে এখনও এটা বুঝতে পারেন নি। সোমবার পার্লামেন্টে যদি এটি উত্থাপিত হয়, যার সম্ভাবনা আছে, আমরা কিন্তু বিষয়টি চাপা দেওয়ার চেষ্টা করতে পারি না, বা করব না। বাস্তবে আমরা এমন এক অবস্থায় এসে উপস্থিত হয়েছি যখন আমাদের হয়তো বসুসহ জনসাধারণের কাছে স্বীকার করতে হবে যে আমরা তাঁর এখানে আসায় বাধা সৃষ্টি করতে পারি না। আমাদের গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে অথবা তাঁর ইংল্যাণ্ডে আসা বন্ধের জন্য কি ব্যবস্থা করতে পারি এ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠবে না এমন ভাবা আমার মনে হয় ভয়ঙ্কর জুয়া খেলার সামিল হবে। সুতরাং, আমি খসড়া উত্তরটিকে যথাযথভাবে নিখুঁত করে তৈরি করব যাতে এড়িয়ে যাবার কোন ভাব না থাকে; এর কারণ, আমাদের পরে না বলতেই হয় যে আমরা বসুকে এখানে আসা থেকে বিরত করতে পারি না।

স্বাঃ ব্রাউন ৬.১২.৩৫.

(আই. ও. আর. ফাইল নং এল/পি এণ্ড জে/৭/৭৯৩ পৃ. ২৭৪)

(গ) মিস্টার মর্লের উদ্দেশ্য আর পীলের ৭.১২.৩৫ তারিখের নোট

মিস্টার ব্রাউনের শব্দবিন্যাস অবশ্যই অত্যন্ত কঠোরভাবে যথাযথ। এর বিরুদ্ধে আমার একমাত্র আপত্তি হ'ল যে, আমার মনে হয়, এটি মূল খসড়ার তুলনায় অস্বস্তিকর অতিরিক্ত প্রশ্নের প্ররোচনা যোগাবে। মিস্টার ব্রাউন পরামর্শ দিয়েছেন যে, খসড়া উত্তরটি যথাযথভাবে নিখুঁত হওয়া প্রয়োজন, যাতে কোনরকম এড়িয়ে যাবার ভাব না থাকে তাতে, কারণ যদি পরে আমাদের একথা বলতে হয় যে বসুর এখানে আসার ব্যাপারে আমরা বাধা সৃষ্টি করতে পারি না। সেটা অবশ্যই সত্য, কিন্তু দফতরের দৃষ্টিকোণ থেকে আমি বলতে চাই যে অবাঞ্ছিতের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আমাদের পাসপোর্ট ব্যবস্থা ব্যবহারের কথা যতো কম বলা যায় ততোই ভাল। কারণ

এটা সবসময় আমাদের মনে রাখতে হবে যে ভারতে আমাদের কোন অভিবাসন আইন (ইমিগ্রেসন এ্যাক্ট) নেই এবং তাই নিয়ন্ত্রণ পাসপোর্টের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। সুতরাং আমরা এটা দুর্ভাগ্য বলে মনে করব যদি আমাদের স্বীকার করতে হয় যে আমরা যাই করি না কেন, বসু এখানে আসতে পারবেন।

২. আপনার অপর বিষয়টি সম্পর্কে উত্তর হল যে, এদেশে অনেক ভারতীয় ছাত্র আছেন যাঁদের উপর বসু এক অবাঞ্ছিত প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। আর তাঁর এখানে উপস্থিতি গ্রেট ব্রিটেনে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের উন্নতি সহজতর করে তুলবে।

স্বাঃ আর. পীল

৭.১২.৩৫

(আই. ও. আর. ফাইল নং এল/পি এণ্ড জে/৭/৭৯৩ পৃ ২৭১-৭২)

হাউস অব কমন্স

প্রশ্ন নং ১, তাং ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬

স্যার রেজিনল্ড ক্র্যাড্ডক : আণ্ডার সেক্রেটারী অব্ স্টেট ফর ইণ্ডিয়ার নিকট প্রশ্ন, বাংলার একজন বিনাবিচারে বন্দী, মিস্টার সুভাষচন্দ্র বসু, কোন পরিস্থিতিতে ভারত ত্যাগের অনুমতি পেয়েছিলেন ; এবং কিভাবে তিনি আয়ারল্যাণ্ড ভ্রমণের অনুমতি পান।

স্যার রেজিনল্ড ক্র্যাডডকের ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬, তারিখের ১নং প্রশ্নের উত্তর

মিস্টার বাটলার : আমার মাননীয় বন্ধু হয়তো অবগত আছেন যে বিশেষ ডাক্তারী চিকিৎসা গ্রহণের জন্য বসুকে ভারত ত্যাগের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। সেই ভাবেই তাঁর পাসপোর্টের বৈধ ভৌগোলিক সীমারেখা নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। স্বাধীন আইরিশ রাষ্ট্রে তাঁর প্রবেশের প্রশ্নটি স্বাধীন রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের বিবেচ্য।

(আই. ও. আর. ফাইল নং এল. / পি এণ্ড জে/৭/৭৯৩ পৃ. ২২৪)

হাউস অব কমন্স

প্রশ্ন নং ১৪, তাং ২৩শে মার্চ, ১৯৩৬

মিস্টার থার্টল্ : আণ্ডার সেক্রেটারী অব্ স্টেট ফর ইণ্ডিয়ার নিকট প্রশ্ন, তিনি কি অবগত আছেন যে ভিয়েনায় মহামহিম ব্রিটিশ কন্সাল মিস্টার সুভাষচন্দ্র বসুকে জানিয়েছেন যে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করলে তাঁর স্বাধীনতা হারাবেন ; আর, এই বিজ্ঞপ্তিটি তাঁর দফতরের নির্দেশ অনুসারে জারী করা হয়েছে কিনা।

মিস্টার থার্টলের ২৩শে মার্চ, ১৯৩৬, তারিখের ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

মিস্টার বাটলার : হ্যাঁ, মহাশয়। এই বিজ্ঞপ্তি আমার সদাশয় বন্ধুর অনুরোধে জারী করা হয়েছে।

অতিরিক্ত প্রশ্ন

মিস্টার থার্টল : আমি কি জানতে পারি যে এই ভদ্রলোককে স্বাধীনভাবে তাঁর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে দেওয়া হবে কিনা ; আর এটাও লক্ষ্য করার যে, চার বছর আগে তাঁকে প্রথম গ্রেফতার করা হয়েছিল। সরকার কি তাঁকে কোন নির্দিষ্ট অপরাধের জন্য বিচার ছাড়াই অনির্দিষ্ট কালের জন্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান।

মিস্টার বাটলার : প্রশ্নের প্রথম অংশটি সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি যে তাঁকে জানানো হয়েছে যে ভারতে প্রত্যাবর্তন করলে তিনি স্বাধীনভাবে বসবাসের আশা করতে পারবেন না। দ্বিতীয় প্রশ্নটি মূল প্রশ্নের বাইরে, এবং এর জন্য আমাকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া প্রয়োজন।

মিস্টার ম্যাক্লটন : এই বিশিষ্ট ভারতীয় নাগরিকের উপর ধারাবাহিক নির্যাতন কি শেষ হবে না ?

মিস্টার বাটলার : আমি ইতিমধ্যেই জানিয়েছি যে এটি মূল প্রশ্নের তুলনায় বৃহত্তর এবং তাই লিখিতভাবে জানালে ভাল হয়।

মিস উইল্‌কিন্‌সন : মাননীয় ভদ্রমহোদয় কি হাউসকে জানাবেন যে মিস্টার বসুর বিরুদ্ধে সরকারের কি আপত্তি আছে, এবং তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগটাই বা কি ? সেটি কি আদৌ প্রস্তুত হয়েছে ?

মিস্টার বাটলার : আমার মনে হয় প্রাথমিক অবস্থায় ভারতে তাঁর কারারুদ্ধ হবার কারণ সম্পর্কে মিস্টার বসু অবগত আছেন। চিকিৎসার কারণে তাঁকে চলে যেতে দেওয়া হয়েছে।

মিস উইল্‌কিন্‌সন : এটা কি ঘটনা নয় যে তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ সাজানো যায় নি? তিনি যদি কিছু করে থাকেন, তবে আপনারা তাঁর বিচার করছেন না কেন, শাস্তি দিচ্ছেন না কেন তাকে?

(আই. ও. আর. ফাইল নং এল/পি এণ্ড জে/৭/৭৯৩ পৃ. ২০৬-০৭)

হাউস অব কমন্স

প্রশ্ন নং ৫, তাং ৬ই এপ্রিল, ১৯৩৬

মিস্টার থার্টল্ : আণ্ডার সেক্রেটারী অব্ স্টেট ফর ইণ্ডিয়ার নিকট প্রশ্ন, সরকারের ঘোষিত অভিপ্রায় অনুসারে যদি মিস্টার সুভাষচন্দ্র বসুকে ভারতে প্রত্যাবর্তন করলে স্বাধীনতার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় তবে তিনি কি জানাবেন যে মিস্টার বসুর বিরুদ্ধে কোন নির্দিষ্ট অভিযোগ গঠনের এবং সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁর বিচার করার কোন অভিপ্রায় সরকারের আছে কিনা।

মিস্টার থার্টলের ৬ই এপ্রিল, ১৯৩৬, তারিখের ৫নং প্রশ্নের উত্তর :

মিস্টার বাটলার : মিস্টার সুভাষ বসুর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে আমার সদাশয় বন্ধু ভারতীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা অবশ্যই পরিচালিত হবেন। মিস্টার বসু ইতিপূর্বে ১৮১৮ সালের রেগুলেশন থ্রি অধীনে গ্রেফতার হয়েছিলেন। এই আইনের পদ্ধতিতে, নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে বিচারের কোন সংস্থান নেই।

অতিরিক্ত প্রশ্ন

মিস্টার থার্টল্ : মিস্টার বসুর বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে ভারত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে মাননীয় ভদ্রমহোদয় কি কিছু নিশ্চিত করে বলতে পারেন?

মিস্টার বাটলার : নিশ্চয়ই।

মিস্টার ম্যাক্সটন : এই ভদ্রলোক, যাঁর জনসেবামূলক কাজের এক উল্লেখযোগ্য রেকর্ড আছে, তাঁর প্রতি এই নির্যাতন বন্ধের জন্য কি মাননীয় ভদ্রমহোদয় তাঁর প্রভাবকে কাজে লাগাবেন?

মিস্টার বাটলার : ১৯৩২ সালে মিস্টার বসুর গ্রেফতারের কারণগুলি এখনও বর্তমান, কিন্তু চিকিৎসার কারণে তাঁর ইওরোপ সফরে অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

(আই. ও. আর. ফাইল নং এল/পি এণ্ড জে/৭/৭৯৩ পৃ ১৮৯)

হাউস অব কমন্স

প্রশ্ন নং ২৮, তাং ২১শে এপ্রিল, ১৯৩৬

মিস্টার থার্টল্ : আণ্ডার সেক্রেটারী অব্ স্টেট ফর ইণ্ডিয়ার নিকট প্রশ্ন, তিনি যদি বলতে পারেন যে, যে অভিযোগে মিস্টার সুভাষচন্দ্র বসু বর্তমানে বন্দী রয়েছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে কবে তিনি প্রথম গ্রেফতার হয়েছিলেন।

প্রশ্ন নং ২৯, তাং ২১শে এপ্রিল, ১৯৩৬

মিস্টার থার্টল্ : আণ্ডার সেক্রেটারী অব্ স্টেট ফর ইণ্ডিয়ার নিকট প্রশ্ন, এখন তিনি বলতে পারেন কিনা যে মিস্টার সুভাষচন্দ্র বসুকে বিচার করার ইচ্ছা ভারত সরকারের আছে কি নেই।

মিস্টার থার্টলের ২১শে এপ্রিল, ১৯৩৬, তারিখের ২৮ এবং ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

মিস্টার বার্টলার : মিস্টার বসু, ১৯৩২ সালের জানুয়ারীতে যেমন ছিলেন, তেমনি রেগুলেশন থ্রির অধীনে বন্দী আছেন! এই আইনের পদ্ধতি অনুসারে, যা আমি মাননীয় সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে ৬ই এপ্রিল জানিয়েছিলাম, নির্দিষ্ট অভিযোগে বিচার করা কিংবা তেমন কোন অভিযোগ গঠনের প্রয়োজন নেই।

অতিরিক্ত প্রশ্ন

মিস্টার থার্টল্ : মাননীয় ভদ্রমহোদয় কি অবগত নন যে, এই বিনা-

বিচারে বন্দী রাখার ব্যাপারটা ব্রিটিশ ন্যায়বিচারের মানের বিরোধী এবং এটির অবসানের জন্য তিনি কি ভারত সরকারের কাছে শক্তিশালী আবেদন জানাবেন ?

মিস্টার বাটলার : মিস্টার বসুর কার্যকলাপ যেহেতু সন্ত্রাসবাদী কার্য-কলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং আছে, তাই এই বিশেষ 'রেগুলেশন'-এর মতো বিশেষ পদ্ধতিসমূহের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

মিস্টার থার্টল্ : মাননীয় ভদ্রমহোদয় কি বুঝতে পারেন না যে, এই মানুষটি কোন অপরাধ করে থাকলে তা প্রমাণ করা সম্ভব হতো। তাঁর অপরাধ প্রমাণের জন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি কেন ?

মিস্টার বাটলার : আদতে এই মানুষটিকে কেন আটক করা হয়েছিল তার কারণ পরীক্ষার জন্য দু'জন বিচারকের কাছে জানানো হয়েছিল। তাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে মামলাটি বিস্তারিত ভাবে তদন্ত করে দেখেন।

মিস্টার ম্যাক্সটন : মিস্টার বসু কি প্রকৃতই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জন্য অভিযুক্ত ?

মিস্টার বাটলার : মিস্টার বসু একটি প্রধান সন্ত্রাসবাদী দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। আর এই কারণেই তাঁকে বন্দী করা হয়।

(আই. ও. আর. ফাইল নং এল/পি এণ্ড জে/৭/৭৯৫ পৃ. ১৫৭-৫৮)

হাউস অব কমন্স

প্রশ্ন নং ৮১, তাং ৩০শে এপ্রিল, ১৯৩৬

মিস্টার সোরেনসেন : আণ্ডার সেক্রেটারী অব্ স্টেট ফর ইণ্ডিয়ার নিকট প্রশ্ন, মিস্টার সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বাজেয়াপ্ত চিঠিপত্রগুলি প্রকাশ করা হবে কিনা এবং তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণ খুঁজে বের করার জন্য চর নিযুক্ত করা হয়েছে কিনা।

মিস্টার সোরেনসেনের ৩০শে এপ্রিল, ১৯৩৬, তারিখের ৮১ নং প্রশ্নের উত্তর

মিস্টার বাটলার : বাজেয়াপ্ত চিঠিপত্রের কিছু কিছু পরিচ্ছেদ ২৩শে মার্চ আইনসভায় মিস্টার বসুরবিষয় সংক্রান্ত বিতর্কের সময় সরকারের বক্তারা

পড়ে শুনিয়েছিলেন। তার রিপোর্ট আমি মাননীয় সদস্যের নিকট পাঠাচ্ছি। আর কিছু প্রকাশ করার কোন প্রস্তাব নেই। প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তর নেতিবাচক।

অতিরিক্ত প্রশ্ন

মিস্টার সোরেনসেন : ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যাঁরা আগ্রহান্বিত, এই বিশেষ মানুষটির বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলির চরিত্রের সঙ্গে তাঁদের পরিচিত হওয়াটা কি ভাল হবে না ; ভাল হবে না চিঠিপত্রগুলির প্রকৃত বিষয়বস্তুর সঙ্গে আমাদের পরিচিত হওয়া ?

মিস্টার বাটলার : আমি মাননীয় ভদ্রমহোদয়কে আইনসভার বিতর্কের রিপোর্টের একটি কপি পাঠাচ্ছি, যার মধ্যে এ বিষয়ে অনেক তথ্য আছে, এবং এই একই তথ্য সভার গ্রন্থাগারে রাখা হবে।

মিস্টার সোরেনসেন : মাননীয় ভদ্রমহোদয় কি অবগত আছেন যে সম্প্রতি মাত্র তিনি সপ্তাহ আগে আইনসভায় ৬২-৫৯ ভোটে মিস্টার বসুর গ্রেফতারকে নিন্দা করা হয়েছে ?

(আই. ও. আর. ফাইল নং এল/পি এণ্ড জে/৭৯৩ পৃ. ১৪০-৪১)

হাউস অব কমন্স

প্রশ্ন নং ৮২, তাং ৩০শে এপ্রিল, ১৯৩৬

মিস্টার সোরেনসেন : আণ্ডার সেক্রেটারী অব্ স্টেট ফর ইণ্ডিয়ার নিকট প্রশ্ন, ১৯২১ সালের পর থেকে মিস্টার সুভাষচন্দ্র বসু কত বার কারাজীবন যাপন করেছেন।

মিস্টার সোরেনসেনের ৩০শে এপ্রিল, ১৯৩৬, তারিখের ৮২ নং প্রশ্নের উত্তর

মিস্টার বাটলার : চারটি ক্ষেত্রে মিস্টার বসু দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন এবং জেলে যাবার শাস্তি পেয়েছেন। ১৮১৮ সালের রেগুলেশন থ্রির অধীনে তিনবার তিনি আটক হয়েছেন।

অতিরিক্ত প্রশ্ন

মিস্টার সোরেনসেন : আমি মাননীয় ভদ্রমহোদয়কে প্রশ্ন করতে চাই যে, তিনি কি অবগত আছেন যে বাংলায় মিস্টার বসুর গ্রেফতার সম্পর্কে অত্যন্ত উত্তেজনা রয়েছে এবং বাংলায় অনেক বিশিষ্ট উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী মনে করেন যে তাঁকে যে শাস্তি দেওয়া হয়েছে এবং যে শাস্তি তিনি ইতিমধ্যেই ভোগ করছেন, তারপর আর কোন শাস্তিদানের প্রয়োজন নেই ?

মিস্টার বাটলার : আমার সদাশয় বন্ধুর খবর হ'ল স্বাধীনতা পাওয়ার পরই মিস্টার বসু বিপ্লবী কার্যকলাপের কেন্দ্র এবং মূল আকর্ষণ হয়ে উঠেছিলেন।

মিস্টার সোরেনসেন : আমি নির্দিষ্ট ভাবে প্রশ্ন রাখতে চাই যে, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগটা কি এবং কখন ভারত সরকার তাঁর বিচারের ব্যবস্থা করবেন ?

মিস্টার বাটলার : আমি মাননীয় ভদ্রমহোদয়কে আইনসভার বিতর্কগুলি পড়ে দেখতে বলব। তা থেকে তিনি মিস্টার বসুর আটকের কারণ সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পারবেন।

মিস্টার গ্যালাচার : আমি বিপ্লবী কার্যকলাপের কেন্দ্র, এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কি মাননীয় ভদ্রলোক আমাকে গ্রেফতার করবেন ?

দফতরের নোট

সেক্রেটারী অব্ স্টেট ফর ইণ্ডিয়ার কাছে পেশ করার জন্য মিস্টার জনস্টন কর্তৃক ২.৯.৪ ৩৬ তারিখে লিখিত বসুর কারাবাসের ইতিহাস।

১. ১৯২১ সালের ১০ই ডিসেম্বর গ্রেফতার হন এবং পরে ১৯০৮ সালের ক্রিমিনাল ল এ্যামেণ্ডমেণ্ট এ্যাক্টের ১৭(২) ধারা অনুসারে ছ'মাসের সাধারণ কারাবাসের শাস্তি পান। (অবৈধ সংগঠনের কার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ করার কিংবা সাহায্য করার জন্য)।

২. ১৮১৮ সালের রেগুলেশন থ্রির অধীনে ১৯২৪ সালের অক্টোবর মাসে বন্দী ; স্বাস্থ্যের কারণে ১৯২৭-এ. মে.-তে মুক্তি।

৩. ১৯৩০ এর ২৩শে জানুয়ারী এক বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডের

শান্তি-আবেদনক্রমে ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড (সিডিসন)-এর ১২৪ এর (ক) ধারা অনুসারে ৯ মাসে হ্রাস প্রাপ্ত।

৪. কোড্ অব্ ক্রিমিনাল প্রসিডিয়র-এর ১৪৪ নং ধারার নির্দেশ অমান্য করার অপরাধে ১৯৩১ সালের জানুয়ারীতে সাতদিনের সাধারণ কারাবাস। এই নির্দেশটি ছিল জনগণের শান্তি ইত্যাদি বিঘ্নিত হতে পারে এই আশঙ্কায় কোন এক বিশেষ কাজ থেকে বিরত থাকার আদেশ।

৫. ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের (দাঙ্গা) ১৪৭ নং ধারায় ১৯৩১ সালের ২৭শে জানুয়ারীতে ছ'মাসের সশ্রম কারাদণ্ড। আরউইন-গান্ধী চুক্তি অনুসারে ১৯৩১-এর মার্চে মুক্তি।

৬. রেগুলেশন থ্রি-র অধীনে ১৯৩২ সালের জানুয়ারীতে গ্রেফতার এবং চিকিৎসার কারণে ইউরোপে আগমনের জন্য ১৯৩৩-এর ফেব্রুয়ারীতে মুক্তি।

৭. ভারতে প্রত্যাবর্তন করলে ১৯৩৬ সালের ৮ই এপ্রিল গ্রেফতার।
(আই. ও. আর ফাইল নং এল.পি.এণ্ড জে/৭/৭৯৩ পৃ. ১৩৫ ও পৃ. ১৩৬--৩৭)

হাউস অব কমন্স

প্রশ্ন নং ৮৩, তাং ৩০শে এপিল, ১৯৩৬

মিস্টার সোরেনসেন : আণ্ডাব সেক্রেটারী অব্ স্টেট ফর ইণ্ডিয়ার নিকট প্রশ্ন, কেন পোর্ট সৈয়দে মিস্টার সুভাষচন্দ্র বসুর পাসপোর্ট আটকানো হ'ল; বন্দরে জাহাজে থাকাকালে একজন পুলিশকে ঘোড়ায় চড়ে তাঁর উপর নজর রাখার হুকুম দেওয়া হয়েছিল কেন; ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের অনুরোধে অস্ট্রিয়ান পুলিশ বাডগাষ্টাইনে কেন তাঁর উপর গোপনে নজর রেখেছিল; কেন ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ।

মিস্টার সোরেনসেনের ৩০শে এপ্রিল, ১৯৩৬, তারিখের ৮৩ নং প্রশ্নের উত্তর

মিস্টার বাটলার: প্রশ্নের প্রথম দুটি অংশের বিষয়ে আমার কোন তথ্য জানা নেই। উক্ত কাজ মিশরীয় কর্তৃপক্ষের গৃহীত ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। তৃতীয় অংশটি সম্পর্কে বলা যায় যে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মিস্টার বসুর গতিবিধি

সম্পর্কে জানার জরুরী প্রয়োজন ছিল। কিন্তু একথা ভাববার কোন কারণ আছে বলে আমার মনে হয় না যে গৃহীত ব্যবস্থাগুলি উদ্দেশ্যটির পক্ষে অতিরিক্ত কিছু ছিল, কিংবা সেগুলি ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপের মতো কিছু।

২৯.৪.৩৬ তারিখে মিস্টার জনস্টন কর্তৃক তৈরী কার্যবিবরণী

সন্দেহ নেই যে প্রশ্নটি করা হয়েছিল ইণ্ডিয়া লীগের কৃষ্ণমেননের অনুরোধে এবং এর ভিত্তি ছিল বন্ধুদের লেখা বসুর অভিযোগপূর্ণ চিঠিগুলি।

প্রশ্নের প্রথম দুটি অংশ প্রসঙ্গে বলা যায় যে মিশরীয় কর্তৃপক্ষ জানতে চেয়েছিলেন যে বসু পূবদিকে বিমানে গেছেন কিনা। গৃহীত ব্যবস্থাটি তাঁরা সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে গ্রহণ করেছিলেন।

তৃতীয় অংশটি আরো অস্বস্তিকর। ভিয়েনায় কনসাল অস্ট্রিয়ান পুলিশের সঙ্গে একটি দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা করেছিলেন যে তাঁরা বসুর গতিবিধি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত রাখবেন। তাঁকে যখন বসুকে সতর্ক করে দেবার নির্দেশ দেওয়া হ'ল, তখন সম্ভবত তিনি পুলিশকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন যে তাঁরা যেন বাডগাষ্টাইনে বসুর অবস্থানরত স্যানাটোরিয়ামের নাম তাঁকে সংগ্রহ করে দেন। আর প্রায় নিশ্চিতভাবেই, তাঁদের তিনি জানাতে অনুরোধ করেছিলেন যে বসু চলে গেছেন কিনা এবং গেলে কোন্ দিকে। এটা একান্তই অসম্ভব যে কন্‌সাল এর চেয়ে বেশী দূর এগিয়ে ছিলেন। বৈদেশিক দফতরের সঙ্গে আমি কথা বলেছিলাম, তাঁরা বসুর উপর গোপন নজর রাখার অনুরোধ করার ব্যাপারটি দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করার পক্ষে। অতোদূর এগুনো সম্ভবত কাম্য হবে না।

হাউস অব কমন্স

প্রশ্ন নং ৯৫, তাং ২৮শে মে, ১৯৩৬

মিস্টার গ্রেনফেল : আণ্ডার সেক্রেটারী অব্ স্টেট ফর ইণ্ডিয়ার নিকট প্রশ্ন, বন্দী অবস্থা থেকে সুভাষ বসু এখনও মুক্তি পেয়েছেন কিনা ; আর তাঁকে পূর্ণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেওয়া হবে কিনা সে সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত হয়েছে কিনা।

মিস্টার গ্রেনফেলের ২৮শে মে, ১৯৩৬, তারিখের ৯৫ নং প্রশ্নের উত্তর

মিস্টার বাটলার: আমি জানি যে মিস্টার বসু হাজত থেকে মুক্তি পেয়েছেন এবং কার্শিয়াঙে তাঁর ভাইয়ের বাড়িতে তাঁকে অন্তরীণ করে রাখা হয়েছে।

(আই. ও. আর. ফাইল নং এল/পি এণ্ড জে/৭/৭৯৩ পৃ. ১১৫)

হাউস অব লর্ডস

১লা ডিসেম্বর, ১৯৩৬

মিস্টার সুভাষ বসু

আর্ল অব কিননৌল সরকারকে প্রশ্ন করেন যে কতোদিন মিস্টার বসুকে বিনাবিচারে গৃহে অন্তরীণ করে রাখা তাঁদের উদ্দেশ্য; আর তাঁকে আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হবে কিনা।

মহামান্য আর্ল বলেন—মহামান্য লর্ডগণ, এতো দেরীতে প্রশ্নটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার চেষ্টা কিংবা তা করা অর্থহীন। কিন্তু আমি মনে করি যে, আপনাদের কাছে এবং সদাশয় মারকুইসের কাছে, যিনি সরকারের পক্ষে জবাব দেবেন, আমি অন্তত এইটুকু জানাতে বাধ্য যে, কে এই ভদ্রলোক; এবং যেহেতু এটি আমার প্রশ্নের পক্ষে প্রয়োজনীয় তাই তাঁর অতীত ইতিহাস সম্পর্কে এক অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানাব। প্রথমত মিস্টার সুভাষ বসু বাংলার কংগ্রেসের সভাপতি। তিনি সর্বভারতীয় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটিরও একজন সদস্য। তিনি কলকাতার মেয়রও ছিলেন। তাঁর যে ইতিহাস আমার প্রশ্নটির পক্ষে প্রয়োজনীয় তা এই রকম: ১৯২৪ সালে তিনি প্রথম গ্রেফতার হন। তিনি তখন কলকাতা কর্পোরেশনের চীফ এক্‌জিকিউটিভ অফিসার ছিলেন। ১৯২৭ সাল পর্যন্ত তিনি হয় জেলে অথবা গৃহে অন্তরীণ ছিলেন। কলকাতার মেয়র থাকা-কালে তিনি পুনরায় গ্রেফতার হন ১৯৩০ সালে। গান্ধী যে বছর ইংল্যাণ্ডে আসেন, সেই বছরেই তিনি মুক্তি পান। ১৯৩২ সালে তিনি পুনরায় গ্রেফতার হন, কিন্তু সে বছরের শেষের দিকে দুর্বল স্বাস্থ্যের কারণে তাঁকে ইউরোপ

সফরের অনুমতি দেওয়া হয়। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হ'ল তিনি একজন ব্রিটিশ পাসপোর্টধারী ব্রিটিশ প্রজা হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে এদেশ সফরের অনুমতি দেওয়া হল না। তাঁকে ইওরোপ যাবার অনুমতি দেওয়া হল এবং তিনি তাঁর অসুখের চিকিৎসার জন্য অস্ট্রিয়া গেলেন। ১৯৩৪ সালে তিনি তাঁর মৃতপ্রায় পিতাকে দেখবার জন্য ভারতে ফিরে যান। তিনি তখন তিন মাসের জন্য অন্তরীণ ছিলেন এবং তারপর ইউরোপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার অনুমতি পান। এ বছরের এপ্রিল মাসে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁকে তখন জেলে বন্দী করা হয় এবং তখন থেকে তিনি দার্জিলিং-এর কাছে তাঁর ভাইয়ের বাড়িতে অন্তরীণ অবস্থায় রয়েছেন।

সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে এটা প্রয়োজনীয় হতে পারে, আমি বলছি না যে হবেই, যে সংকটের সময় কোন কোন রাজনৈতিক পরিচিত ব্যক্তিকে বিনা অভিযোগে এবং বিনা বিচারে আটক রাখার প্রয়োজন হয়। কিন্তু সর্বদাই সংকটজনক পরিস্থিতি থাকতে পারে না। আমি জানাতে চাই যে, এই ভদ্রলোক ১৯৩২ সাল থেকে, তাঁর ইওরোপে আসার সময় ছাড়া, একটানা বন্দীজীবন যাপন করেছেন। সেদিন আমি একটি ভারতীয় সংবাদপত্র থেকে একটি কপি সংগ্রহ করেছি যার মধ্যে বেঙ্গল লেজিস্‌লেটিভ এসেম্ব্লিতে উত্থাপিত কিছু প্রশ্নের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। প্রথম প্রশ্নে জেলে এবং আটক-শিবিরে বিনাবিচারে আটক বন্দীর সংখ্যা জানতে চাওয়া হয়েছে। আমি পাঁচটি প্রশ্নের সবকটির মধ্যে গিয়ে আপনাদের বিরক্তি উৎপাদন করতে চাই না, কিন্তু চতুর্থ প্রশ্নটি ছিল গত দুবছরে আত্মহত্যা করা বিনা বিচারে বন্দীর সংখ্যা সম্পর্কে। উত্তর দেওয়া হয়েছিল, পাঁচ। ঘটনাক্রমে বিনাবিচারে বন্দীর সর্বমোট সংখ্যা ছিল দু'হাজার। আমি যখন সেগুলি পড়ি, আমার জার্মানীর কন্‌সেন্‌ট্রেশন ক্যাম্পের কথা মনে পড়ে যায়। রাজনৈতিক শত্রুদের এইভাবে আটক-শিবিরে বন্দী করে রাখার অভ্যাসের মধ্যে ফ্যাসিবাদের গন্ধ পাওয়া যায়, এবং তা অত্যন্ত জোরালভাবে নাৎসী কন্‌সেন্‌ট্রেশন ক্যাম্পের ইঙ্গিত দেয়।

আমি সরকারকে প্রশ্ন করতে চাই, তাঁরা কি মিস্টার বসুকে চিরদিন বিনাবিচারে বন্দী রাখতে চান। আমি জানি, বাংলার সবচেয়ে শক্তিশালী

দলের নেতা তিনি এবং আগামী ১লা এপ্রিল অবস্থান্তর ঘটলে কংগ্রেসদল ক্ষমতাদখলের ইচ্ছা পোষণ করতে পারে। নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য তাঁকে কি মুক্তি দেওয়া হবে? আমি মহামহিম সরকারকে একটি শেষ প্রশ্ন করতে চাই এবং সেটি হল এই যে ভদ্রলোকের স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্পর্কে তাঁদের কাছে আর কোন রিপোর্ট আছে কিনা। কাগজপত্রগুলি পেশ করার জন্য আমি আবেদন জানাচ্ছি।

দি সেক্রেটারী অব্ স্টেট ফর ইণ্ডিয়া (দি মারকুইস অব্ জেটল্যাণ্ড): মহামান্য লর্ডগণ, মিস্টার সুভাষ বসুর আটকের বিষয়ে যে পর্যবেক্ষণ করেছেন মহামহিম আর্ল, আমি মুহূর্তের জন্যও তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছি না; কারণ, সত্যিই কোন শাসকের পক্ষে এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের মতো অপ্রিয় আর কিছু নেই। তা সত্ত্বেও, অত্যন্ত তিক্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি সন্তুষ্ট যে ভারতের পরিস্থিতিতে এটা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। আমি মহামহিম লর্ডের মনকে এমন কোন ধারণা থেকে মুক্ত করতে চাই যে, বসুর মতো ব্যক্তির বিরুদ্ধে আটক অধিকার প্রয়োগ করার পূর্বে প্রমাণ পরীক্ষায় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়নি।

যে অস্বাভাবিক সতর্কতা গ্রহণ করা হয়েছে তাঁর সম্পর্কে ব্যাখ্যা করার মতো করে আমি মহামহিম আর্লকে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আসা বিষয় থেকে উদাহরণ দিতে চাই। অত্যন্ত গোলমালের সময় আমি বাংলাদেশে ছিলাম। তখন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ছিল অতি গুরুতর ভীতির কারণ এবং বেশ কিছুসংখ্যক ব্যক্তিকে অন্তরীণ করে রাখার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। তাদের এক বিরাট সংখ্যকের বিরুদ্ধে প্রমাণ আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখেছিলাম এবং নজিরগুলি তাদের অপরাধ নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে বলে আমার ধারণা জন্মেছিল। তা সত্ত্বেও কিছুটা নিজেকে এবং কিছুটা জনমতকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমি ভারতের বিভিন্ন হাইকোর্ট থেকে দু'জন বিজ্ঞ বিচারককে আহ্বান জানিয়েছিলাম সেই সমস্ত ব্যক্তির দলিলগুচ্ছ পরীক্ষা করে দেখবার, যাঁদের বিরুদ্ধে আমরা অগ্রসর হয়েছিলাম, এবং তাঁদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেবার জন্য। সেই বিচারকদের একজন ছিলেন ইংরেজ এবং অপর জন একজন ভারতীয়—মিস্টার জাসটিস

বীচক্রফট এবং মিস্টার জাস্‌টিস চন্দ্রাভকর। তাঁরা তা করেছিলেন এবং যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন তা হ'ল ৮০৬টি ক্ষেত্রের মধ্যে (আমাদের যাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে হয়েছিল সেইসব মানুষের সংখ্যা) কেবলমাত্র ৬টি ক্ষেত্রে তাঁদের মনে সেইসব মানুষদের অপরাধ সম্পর্কে আদৌ সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিল। আমি যদি তা বর্ণনা করি, তবে তা আমার কাছে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ফল বলে মনে হয়। সেইসব মানুষদের বিরুদ্ধে সরকারের ব্যবস্থা গ্রহণের যৌক্তিকতা সম্পর্কে ৮০৬টি মামলার মধ্যে কেবল ছ'টি সম্পর্কে সেই জ্ঞানী বিচারকদের মনে কোনরকম সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে এটি এসে পড়ল।

এখন আমি মিস্টার সুভাষ বসুর নিজের ব্যাপারটি সম্পর্কে আলোচনায় আসছি। প্রশ্নকর্তা মহামহিম লর্ড মিস্টার সুভাষ বসুর জীবনের ঘটনা সম্পূর্ণ সঠিকভাবে বর্ণনা করতে পারেন নি। দুর্ভাগ্যক্রমে, অত্যন্ত কর্মদক্ষতাসম্পন্ন, সম্ভবত প্রতিভাবান একজন ব্যক্তি হয়েও মিস্টার বসু হয় ভুলক্রমে নতুবা দুর্ভাগ্যের ফলে তাঁর প্রায় সব কর্মক্ষমতা সৃজনশীল উদ্দেশ্যে ব্যয় না করে ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যবহার করছেন। যুবক অবস্থায় তিনি ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের একজন সদস্য হয়েছিলেন। কিন্তু শিক্ষানবিস থাকাকালে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে তাঁর পক্ষে দু'জন প্রভুকে, যেমন তিনি বর্ণনা করেছেন—দেশের সরকার এবং দেশের জনগণ, —সেবা করা সম্ভব নয়। তিনি তাই পদত্যাগ করেন। তিনি বাংলায় আসেন এবং ১৯২১-২২ সালে যখন মহামহিম, তৎকালীন মহামহিম প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স, ভারত সফর করেছিলেন তখন মিস্টার বসু অবৈধ স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী সংগঠিত করার কাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল পুলিশকে তার প্রকৃত কাজকর্ম থেকে বঞ্চিত করা এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাদের কাজকর্ম নিজেদের হাতে নিয়ে নেওয়া।

মহামান্য লর্ড, আপনি অবগত আছেন যে, ধ্বংসাত্মক কাজকর্মের ফলে এমনকি এদেশেও আমরা যথেষ্ট পরিমাণ অসুবিধা বোধ করেছি। লাইসেন্সবিহীন ইউনিফর্ম পরিধান, শোভাযাত্রা সংগঠিত করা এবং আরো

সবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য অতি সম্প্রতি আইন-প্রণয়নের কথা বিবেচনা করেছি। ভারতে আমাদের ঐসব ক্ষমতা আছে এবং আমার পক্ষে প্রয়োজন হয়েছে ঐ এ্যাক্টের সাহায্যে মিস্টার বসুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হবার। ঐ এ্যাক্ট ওসব ক্ষমতা এক্‌জিকিউটিভের উপর অর্পণ করেছে।

বিচারালয়ে মিস্টার বসুকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। এটা তাঁকে বিনাবিচারে অন্তরীণ করে রাখায় ব্যাপার ছিল না। তিনি দোষী সাব্যস্ত হন এবং শাস্তি ভোগ করেন। এতো দেরীতে মিস্টার বসুর পরবর্তী কার্যকলাপের সম্পূর্ণ ইতিহাস জানিয়ে, মহামান্য লর্ড, আপনাকে আমি কষ্ট দেবার চেষ্টা করব না। সেগুলি দুর্ভাগ্যজনক ভাবে ধ্বংসাত্মক চরিত্রের; এবং অনেক ক্ষেত্রে তাঁকে বন্দী রাখতে হয়েছে হয় আদালতের শাস্তিদানের ফলে, অথবা, যা মহামান্য লর্ড ইঙ্গিত করেছেন, এই ধরনের কাজকর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মোকাবিলা করার জন্য একজিকিউটিভের উপর অর্পিত বিশেষ ক্ষমতার সাহায্যে। আমি এখন বর্তমান বছরে ফিরে আসি। এটা অতীব সত্য, যেমন মহামান্য লর্ড বলেছেন, যে মিস্টার সুভাষ বসুকে চিকিৎসার জন্য ইউরোপে আসার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, এবং আমার ধারণা তিনি অনেকটা সময় ভিয়েনায় কাটিয়ে ছিলেন। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে এটি সরকারের নজরে আসে যে ভিয়েনায় অবস্থানকালে তিনি তাঁর ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ অব্যাহত রেখেছিলেন। সুতরাং, তাঁকে সতর্ক করে দেওয়া হয় যে, তিনি যদি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন, তবে তাঁকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে না। তিনি সে সতর্কবার্তা উপেক্ষা করেন এবং বসন্তে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গ্রেফতার হন। গ্রেফতার হবার অল্প কিছু সময় বাদে তাঁকে দার্জিলিং-এর অদূরে কার্শিয়াঙে, তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে, তাঁর ভাইয়ের বাড়িতে বসবাস করার অনুমতি দেওয়া হয়। তাঁর স্বাধীনতার উপর আরোপিত কিছু নিষেধাজ্ঞার অধীনে তিনি এখন সেখানে বাস করছেন। সেই নিষেধাজ্ঞাগুলির অন্যতম একটি হ'ল যে নিষেধাজ্ঞার অধীনে থাকাকালে তিনি কোন প্রকার রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করবেন না।

মহামান্য লর্ড আমাকে দুটি প্রশ্ন করেছেন। তিনি প্রথম প্রশ্ন করেন;

এই ঈষৎ পরিবর্তিত নিষেধাজ্ঞার অধীনে সরকার কতোদিন মিস্টার বসুকে আটক রাখতে চান? এবং দ্বিতীয়ত, তিনি কি আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণের অনুমতি পাবেন? মিস্টার বসু সম্পর্কে আমি যা বলেছি, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমার ধারণা, মহামান্য লর্ড আশ্চর্যান্বিত হবেন না, যদি আমি বলি যে এখনই সঠিক ভাবে জানানো সম্ভব নয় যে মিস্টার বসুর স্বাধীনতার উপর কতোদিন নিষেধাজ্ঞা বজায় রাখার প্রয়োজন বিবেচিত হবে। যে পরিস্থিতির মধ্যে তিনি আপাতত তাঁর ভাইয়ের গৃহে বাস করছেন, তাতে আসন্ন নির্বাচনে তাঁর পক্ষে সক্রিয় অংশগ্রহণ সম্ভব নয়। আমি মনে করি, ভারতের আইনসভায় গত নির্বাচনের সময় তাঁর ভাই যা করেছেন, তিনি তাই করতে পারবেন। সেই সময় মিস্টার বসুর ভাই, শরৎ বসু, দুঃখজনক ভাবে বন্দী ছিলেন। যদিও প্রকৃতপক্ষে জেলে নয় কিভাবে এখন আমি তা মনে করতে পারছি না। কিন্তু তিনি একজন অনুপস্থিত প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি নির্বাচিতও হন। তাঁর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা বজায় থাকাকালে তিনি অবশ্য তাঁর পদগ্রহণের অনুমতি পাননি। কিন্তু সে আদেশগুলি বর্তমানে বাতিল করা হয়েছে; আমার মনে হয় মিস্টার সুভাষ বসুর পক্ষে ভাইয়ের উদাহরণ অনুসরণ করা সম্ভব হবে। আমি শঙ্কিত যে, এই উত্তর প্রশ্নটির উত্থাপক মহামান্য লর্ডের সম্পূর্ণ সমর্থন বিধান করতে সক্ষম হবে না। কিন্তু সময় পাওয়া গেলে, যা সত্যিই এই শেষসময়ে পাওয়া সম্ভব নয়, আমি আমার ব্যক্তিগত জ্ঞান থেকে মহামান্য লর্ডকে ভালভাবে কারণগুলি দেখাতে পারতাম যে কেন মিস্টার বসুকে পূর্ণ-স্বাধীনতা দেওয়া সম্ভব নয়।

দি আর্ল অব্ কিননৌল: মহামান্য লর্ডগণ, মহামহিম মারকুইসকে তাঁর উত্তরের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বলতে চাই যে তাঁর পূর্ণ স্পষ্টবাদিতায় যাহোক আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি। তিনি বলেছেন যে মিস্টার সুভাষ বসু, একমাত্র অনুপস্থিত প্রার্থী হওয়া ভিন্ন অন্য কোন ভাবে আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণের অনুমতি পাবেন না। মহামান্য লর্ডের উত্তর অবশ্য আমার উল্লিখিত ফ্যাসিবাদ কিংবা নয়া-ফ্যাসিবাদের অভিযোগ থেকে আমার মনকে মুক্ত করতে পারেনি। আমি নিজে এটা দেখতে অত্যন্ত

আগ্রহী যে ভারতে কোন মানুষকে যেন বিনাবিচারে গ্রেফতার করা অথবা জেলে বন্দী রাখা না হয়। তবে আমি মহামহিম মারকুইসের দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবন করতে পেরেছি; এবং তাঁর স্পষ্ট উত্তরের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি প্রস্তাবটি তুলে নেবার অনুমতি চাইছি।

দলিলপত্রের জন্য প্রস্তাব অনুমতিক্রমে তুলে নেওয়া হয়।

(আই. ও. আর. ফাইল নং এল/পি এণ্ড জে/৭/৭৯৩ পৃ. ৬১-৬২)

হাউস অব কমন্স

প্রশ্ন নং ৬, তাং ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭

মিস্টার জাগগার: আণ্ডার সেক্রেটারী অব্ স্টেট ফর ইণ্ডিয়ার নিকট প্রশ্ন, এই ঘটনাটির প্রতি কি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে যে মিস্টার সুভাষ বসুর জ্বর হয়েছে এবং সম্প্রতি তাঁর কুড়ি পাউণ্ড ওজন হ্রাস পেয়েছে; মিস্টার বসুর সংকটজনক অবস্থা এবং সে ব্যাপারে ভারতীয় জনগণের উদ্বেগের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি কি মিস্টার বসুকে মুক্তি দেবার নির্দেশ দেবেন; অনুমতি দেবেন ভারতে অথবা বিদেশে চিকিৎসা-সংক্রান্ত পরিচর্যা লাভের জন্য ?

মিস্টার জাগগারের ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭, তারিখের ৬ নং প্রশ্নের উত্তর

মিস্টার বাটলার: তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মিস্টার বসুকে ডিসেম্বর মাসে কার্শিয়াং থেকে কলকাতার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে; আমি নিশ্চিত যে সেখানে তাঁর যথাযথ পরিচর্যা লাভের সুযোগ রয়েছে।

(আই. ও. আর. ফাইল নং এল/পি এণ্ড জে ৭/৭৯৩ পৃ. ৪৯)

হাউস অব কমন্স

প্রশ্ন নং ৫, তাং ২২শে নভেম্বর, ১৯৩৭

মিস্টার থার্টল্: আণ্ডার সেক্রেটারী অব্ স্টেট ফর ইণ্ডিয়ার নিকট

প্রশ্ন, তিনি এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন কিনা যে তাঁর আসন্ন ইউরোপ সফরকালে ভারত সরকার মিস্টার সুভাষচন্দ্র বসুর ঐ দেশসফরে বাধা সৃষ্টি করবেন না।

মিস্টার থার্টলের ২২শে নভেম্বর, ১৯৩৭, তারিখের ৫নং প্রশ্নের উত্তর

লর্ড স্ট্যানলী : আমি জানি যে মিস্টার বসু ইতিমধ্যেই ভারত ত্যাগ করেছেন এবং আমার জানা নেই যে ভারত সরকার তাঁর এদেশে আগমনের ব্যাপারে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছেন কিনা।

অতিরিক্ত প্রশ্ন

মিস্টার থার্টল্ : মাননীয় ভদ্রমহোদয় কি অবগত আছেন যে বসু যখন শেষবার ইউরোপে এসেছিলেন এই দেশের সরকার তখন তাঁর এদেশে আসার ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিলেন ; তিনি কি এই প্রতিশ্রুতি দেবেন যে এবার তেমন কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হবে না ?

লর্ড স্ট্যানলী : যদি এবং যখন ঐ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হবে তখন তার মুখোমুখী হওয়াই ভাল।

(আই. ও. আর ফাইল নং এল/পি এণ্ড জে/৭/৭৯৩ পৃ. ৩০)

হাউস অব কমন্স

উত্তর দেওরা হয় ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৪১, তারিখে—প্রশ্ন নং ৪২

মেজর জেনারেল স্যার আলফ্রেড নক্স : সেক্রেটারী অব্ স্টেট ফর ইণ্ডিয়ার নিকট প্রশ্ন, কংগ্রেসদলের প্রাক্তন নেতা সুভাষচন্দ্র বসুর বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে তাঁর কাছে কোন তথ্য আছে কিনা

মেজর জেনারেল স্যার আলফ্রেড নক্সের ৪২নং প্রশ্নের উত্তর

মিস্টার আমেরী : ভারত সরকারের সাম্প্রতিক বিবৃতি অনুসারে ভারতে যেসব প্রচারপত্র প্রকাশ পেয়েছে তা থেকে সন্দেহের অবকাশ নেই যে সুভাষ বসু শত্রুশিবিরে যোগদান করেছেন। খবর পাওয়া গিয়েছে যে,

তিনি হয় রোমে অথবা বার্লিনে আছেন। কিন্তু আমার কাছে সঠিক কোন তথ্য নেই।

স্যার এ নক্স : এটা কি সত্যি যে মিস্টার বসু ভারতের কংগ্রেসদলের প্রাক্তন সভাপতি ?

মিস্টার আমেরী : সামগ্রিক ভাবে দেখতে গেলে, আমি মনে করি না যে দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে কংগ্রেসের উপর চাপান সঠিক হবে ; তিনি ছিলেন কি ছিলেন না সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই।

স্যার এ নক্স : তিনি কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন না ?

মিস্টার আমেরী : আমি নিশ্চিত নই যে তিনি কখনও প্রকৃতই মনোনীত হয়েছিলেন কিনা।

মিস্টার সোরেনসেন : এটা কি ঘটনা নয় যে মিস্টার বসুকে তাঁর সহকর্মীরা জোর করে কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত করেছিলেন ?

মিস্টার ম্যাককিন্‌লে : তিনি কি একজন সমাজবাদী ?

মিস্টার ম্যাক্সটন : তাঁর বার্লিন অথবা ইতালিতে থাকার বিষয়ে যে তথ্যের উপর সেক্রেটারী অব্‌ স্টেট ফর ইণ্ডিয়া নির্ভর করেছেন, তা কি বেশ কিছুটা অস্পষ্ট নয় ?

দুটির মধ্যে কিছুটা দূরত্ব আছে ; এটাই কি সত্যি যে আসলে তিনি জানেনই না।

মিস্টার ম্যানডার : তাঁর সঙ্গে মুফতি সেখানে আছেন না ?

(আই. ও. আর. ফাইল নং এল/পি এণ্ড জে/৮/৬৩৯)

পরিশিষ্ট

কার্যবিবরণী দলিল

এই চিঠিটি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর ভাই শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর উদ্দেশ্যে লেখেন। সরকারী প্রস্তাবটিকে কেন তিনি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেন না, তার এক বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে চিঠিটিতে।

শ্রীচরণেষু,

মাননীয় মিস্টার মবারলি যে প্রস্তাব করেছেন, সে সম্পর্কে আমার মতামত জানবার জন্য আপনি নিশ্চয়ই উদ্বিগ্ন এবং এ বিষয়ে আমার মনকে ভারমুক্ত করার এটাই উপযুক্ত সময়। আমি জানিনা আপনার সঙ্গে আমার মুখোমুখি দেখা হবে কিনা, কিন্তু আমি এ সম্পর্কে আমার যথাযথ মতামত জানাচ্ছি।

মাননীয় সদস্যের বিবৃতিটি আমি অতি সতর্কতার সঙ্গে বারবার পড়েছি। তাঁর বিবৃতির প্রতিটি বাক্য এবং প্রতিটি শব্দ নিয়ে আমি গভীর ভাবে চিন্তা করেছি। প্রসঙ্গক্রমে আমি অবশ্যই স্বীকার করি যে বিবৃতিটি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে প্রস্তুত করা হয়েছে। যথেষ্ট সময় নিয়ে তাঁর প্রস্তাবের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় আমি বিবেচনা করে দেখেছি এবং স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য তাড়াহুড়ো করিনি।

আমি আপনাকে যা লিখতে চলেছি তা হলো দীর্ঘ চিন্তাভাবনার পর আমার এই মুহূর্তের মতামত। কিন্তু আমি ভুল সংশোধনে রাজী। যদি এমন কোন তথ্য কিংবা যুক্তি থেকে থাকে যা আমি খেয়াল করিনি অথবা যা আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে, তবে আমি আমার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে প্রস্তুত।

আমি শুরুতেই মাননীয় সদস্যের বিবৃতির স্পষ্টবাদিতার প্রশংসা করতে চাই এবং আমি কর্তব্যে অবহেলা করব যদি এর প্রতিদান না দিই। আমি স্পষ্টভাষণে বিশ্বাস করি এবং আমি মনে করি যে, স্পষ্টভাষণ শেষ পর্যন্ত কাজে দেয়।

মাননীয় সদস্যের বিবৃতিতে এমন কতকগুলো বিষয় আছে, যার জন্যে আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। তিনি যখন বলেছিলেন যে, তিনি অতীত সম্পর্কে কোন স্বীকারোক্তি অথবা, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন প্রতিশ্রুতি চান না—যখন তিনি বলেছিলেন যে, তিনি আমাকে মুক্তি দিতে প্রস্তুত যদি আমি আমার "সম্মানজনক প্রতিশ্রুতি" ইত্যাদি দিই—শেষের দিকে তিনি যখন মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি প্রথমে আমাকে প্রস্তাবটি দিতে চাননি, কারণ যদি আমি মনে করি যে প্রস্তাবটি আমার উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তখন তিনি একজন ভদ্রলোক হিসেবে এবং একজন সম্মানীয় ব্যক্তি হিসেবে আমার অনুভূতির প্রতি প্রশংসনীয় গুরুত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। যদিও আমি প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে পারছি না,—যার কারণ বর্ণনা আমি এখন করব, তা সত্বেও প্রস্তাবের সম্মানজনক বিষয়গুলির আমি প্রশংসা করি। তা ছাড়া লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের একজন সদস্য

হিসেবে মাননীয় সদস্যের অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রে সভার আস্থা অর্জন করার বিষয়টিকে আমি অভিনন্দন না জানিয়ে পারি না। কিন্তু আমি যখন একথা বলছি, আমি শঙ্কিত, যে আমি বলতে চেয়েছি প্রস্তাবটির সমর্থনে তিনি যা বলতে চেয়েছেন তার সম্বন্ধে।

চিকিৎসা-সংক্রান্ত রিপোর্ট

একটি প্রাথমিক বিষয়ে আমি আপনার মন থেকে ভুল ধারণা দূর করতে চাই। ছোটদাদার রিপোর্ট এবং সুপারিশ দেওয়া হয়েছিল আমার কাছে কোন উল্লেখ না করেই অথবা আমার সঙ্গে পরামর্শ করার আগেই। তিনি যদি আমার সঙ্গে পরামর্শ করতেন, তবে আমি ঐ জাতীয় এক পরামর্শের বিরোধিতা করতাম। সেটি পেশ করার পর তিনি যখন তাঁর পরামর্শের প্রকৃতি সম্পর্কে আমাকে অবহিত করেন, আমি এর উপযোগিতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করি—যেটি, এখন আমি বুঝি যে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ছিল। অবশ্যই ছোটদাদা এখানে এসেছিলেন একজন রুগী হিসেবে আমাকে পরীক্ষা করা এবং একজন চিকিৎসক হিসেবে তাঁর মতামত দেবার জন্য, আর আমি এও মনে করি যে, তিনি তাঁর কর্তব্য বৈজ্ঞানিক নিরপেক্ষতা এবং পেশাগত আবেগশূন্যতার সঙ্গে পালন করেছিলেন। তাঁর সুপারিশের রাজনৈতিক দিকগুলি সম্পর্কে তিনি চিন্তিত ছিলেন না; এবং এর থেকে যে সরকার তার রাজনৈতিক ফয়দা তুলতে পারেন সে সম্পর্কেও তিনি ভাবেননি। কেউই, এমন কি আমিও, তাঁকে দোষ দিতে পারি না। চিকিৎসা-বহির্ভূত আর সকল বিষয় বাদ দেবার জন্য এবং তাঁর পরামর্শে রাজনৈতিক ফলাফলকে উপেক্ষা করার জন্য। আমার ক্ষেত্রে তিনি সেই পরামর্শই দিয়েছেন, যা অন্য যে-কোন রুগীর ক্ষেত্রে তিনি দিতেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে যেহেতু তাঁর অনেক রুগী সুইস স্যানেটোরিয়ামে চিকিৎসার ফলে সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন, তাই যাঁদের সামর্থ্য আছে তিনি সেই সমস্ত যক্ষ্মারুগীকেই সুইজারল্যাণ্ডে চিকিৎসা গ্রহণের জোরাল পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এই পরিস্থিতিতে এটা স্পষ্ট যে. কোন প্রস্তাব গ্রহণ করব সে ব্যাপারে কোনভাবেই আমি পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ পাইনি।

দেখে মনে হয় যে, সরকার ছোটদাদার রোগনির্ণয়কে মেনে নেননি (যদিও তাঁরা তাঁর সুপারিশকে কাজে লাগাতে প্রস্তুত), কারণ মাননীয় সদস্য বলেছিলেন, "এটা দেখা যাচ্ছে যে মিস্টার সুভাষচন্দ্র বসু এই মুহূর্তে গুরুতর অসুস্থ নন এবং নিশ্চিত ভাবেই অক্ষম নন তিনি।" কোন্ স্তরে সরকার আমাকে অক্ষম কিংবা গুরুতর রূপে অসুস্থ বলে মনে করবেন, তা জানাটা আকর্ষণীয় হবে। এটাই কি, যখন চিকিৎসকেরা আমাকে নিরাময়ের অতীত, কিংবা আমার মৃত্যুকে কয়েকটা মাস কিংবা দিনের ব্যাপার বলে ঘোষণা করবেন? আরো যে, সরকার যদি ছোটদাদার রোগনির্ণয়কে মেনে না নেন, তা হ'লে কেন তাঁরা সেটি গ্রহণ করতে এতো উদ্বিগ্ন যা উপরে উপরে কেবল বাহিক

ভাবে তাঁর সুপারিশ বলে মনে হয়। ছোটদাদার সুপারিশে বলা নেই যে, বিদেশযাত্রার আগে আমাকে বাড়ীতে যেতে দেওয়া হবে না এবং আমায় লোকজনের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া উচিত নয়। সেটিতে এ কথাও বলা নেই যে, যে জাহাজে আমি ভ্রমণ করব তা ভারতের কোন বন্দর স্পর্শ করবে না। আর এও বলে না যে, আমি সুস্বাস্থ্য ফিরে পেলেও বেঙ্গল ক্রিমিনাল এ্যামেণ্ডমেন্ট এ্যাক্টের মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত গৃহে ফিরতে পারব না। এই সমস্তই আমার মনে সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছে যে, আমার স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য আমাকে সুযোগ দেবার কোন প্রকৃত ইচ্ছা তাঁদের আছে কি না।

কার্যত মাননীয় সদস্য বলেছেন : আমার ক্ষেত্রে কেবল দুটি বিকল্প খোলা রয়েছে, (১) জেলে বন্দী থাকা এবং (২) অনির্দিষ্ট কালের জন্য একটি বিদেশী রাষ্ট্রে চিকিৎসা-গ্রহণ। কিন্তু দুটির মধ্যে কি প্রকৃতই কোন মধ্যপন্থা নেই? তেমন কিছু নেই বলে আমি নিশ্চিত নই।

বাংলা সরকার চান যে বেঙ্গল ক্রিমিনাল এ্যামেণ্ডমেন্ট এ্যাক্টের মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৯৩০-এর জানুয়ারী পর্যন্ত আমি বিদেশে বাস করি। কিন্তু কে নিশ্চিত করে বলতে পারে যে আইনটির মেয়াদ ১৯৩০ সালের আগেই শেষ হবে এবং আবার বাড়ানো হবে না? মিস্টার লোম্যানের (ডি. আই. জি., আই বি. সি. আই. ডি) সঙ্গে ১৯২৬-এর অক্টোবরে আমার যে শেষ কথোপকথন হয়, তা ছিল এ বিষয়ে পুনর্নিশ্চয়তাদান। আমি বিস্মিত হব না যদি ১৯২৯ সালে, ১৯২৫ সালের বেঙ্গল ক্রিমিনাল ল' এ্যামেণ্ডমেন্ট এ্যাক্টকে স্থায়ী করা হয় আইনের খাতায়। সে ক্ষেত্রে আমার বাড়ির বাইরে থাকাটাকে স্থায়ী করা হবে এবং বিংশ শতাব্দীর এক 'স্বার্থবিরোধী অর্ডিন্যান্সের' সাহায্যে নিজেকে ভারত থেকে নির্বাসিত রাখার জন্য আমাকে কেবল নিজেকেই ধন্যবাদ জানাতে হবে। এই বিষয়ে সরকারের উদ্দেশ্য যদি খুব পরিষ্কার থাকত, তাহলে কতদিন পর্যন্ত আমাকে বিদেশে থাকতে হবে তার এক নির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ করতেন তাঁরা।

আবার ইউরোপে আমাকে কতদূর স্বাধীনতা দেওয়া হবে সে সম্পর্কেও আমাকে কোন নিশ্চয়তা দেওয়া হয় নি। সরকার কি সুইজারল্যাণ্ডে ভরা অসংখ্য গুপ্তচরের দয়ালু দৃষ্টি থেকে আমাকে রক্ষা করবেন? এটা অস্বীকার করে লাভ নেই যে, আমি একজন রাজনৈতিক সন্দেহভাজন ব্যক্তি এবং তেমনই হয়ে থাকব, যতদিন না রূপান্তরিত ব্যক্তিতে পরিণত হই এবং পুলিশের গুপ্তচর হয়ে যাই—আর এটা খুবই সম্ভব যে বিদেশে গুপ্তচরেরা প্রতি পদক্ষেপে আমাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে অতিষ্ঠ করে তুলবে আমার জীবন। আমি জানি যে সুইজারল্যাণ্ডে কেবল ব্রিটিশ গুপ্তচরই নেই, ব্রিটিশ সরকারের নিযুক্ত সুইস, ইতালীয়, ফরাসী, জার্মান এবং ভারতীয় গুপ্তচর রয়েছে। সরকারের কাছে আমাকে আরো খারাপ করে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে এদের কিছু অতি-

উৎসাহী এজেন্ট যদি আমার সম্পর্কে মিথ্যা রিপোর্ট পরিবেশন করে তাই বা বন্ধ করব কিভাবে? আমি আন্তরিক ভাবেই চিন্তা করি, এবং গত বছর এ ব্যাপারে মিস্টার লোম্যানকেও আমি বলেছিলাম যে তেমন ইচ্ছা করলে গোয়েন্দা দফতর রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যে-কোন নাগরিক সম্পর্কে আপাতদৃষ্টিতে ন্যায়সঙ্গত একটা মামলা দাঁড় করাতে পারে, যা অর্ডিনান্সের অধীনে তাঁকে আটক করার জন্য অনুমতিলাভের পক্ষে যথেষ্ট হবে। এটি আরো সত্য সেই সব রাজনৈতিক সন্দেহভাজন ব্যক্তির পক্ষে যারা কখনও ইওরোপে থেকেছেন, বিনা শাস্তিতে গৃহে প্রত্যাবর্তনের অনুমতিলাভের জন্য এই রাজনৈতিক সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের যে অসুবিধের সম্মুখীন হতে হয়, তা কেউ ভুলতে পারে না। এমনকি লালা লাজপত রায়ের মতো মর্যাদাসম্পন্ন এবং বিশিষ্ট নেতাকেও গৃহে ফিরতে হয়েছিল কেবল মাত্র প্রভাবশালী এম. পি.-দের সাহায্যে, যাঁদের কেউ কেউ ছিলেন প্রাক্তন ক্যাবিনেট মন্ত্রী। দুর্ভাগ্যক্রমে সরকারের দৃষ্টিতে আমি এখন একান্ত অপ্রিয় ব্যক্তি এবং আমাকে যে অসুবিধার মুখোমুখি হতে হবে তা সহজেই অনুমেয়।

অতি উৎসাহী পুলিশ এজেন্ট

তা ছাড়া, অতি উৎসাহী পুলিশ এজেন্টের সামনে আমি এমন অসহায় বোধ করি যে, আমি প্রায় নিশ্চিত যে, ইওরোপে আমার অবস্থানকালে আমি যতই সতর্ক, এমনকি নিরীহ থাকি না কেন ভারত সরকারের কাছে আমার সম্পর্কে প্রতিকূল রিপোর্ট পৌঁছান বন্ধ করতে পারব না। আমার সব সতর্কতা এবং নিরীহ ভাবকে চালাকি আর চতুরালি বলে গণ্য করা হবে এবং প্রকৃতই তেমন কিছু না থাকলেও সব ধরনের কুকর্মের জন্মদাতা হিসেবে কল্পনা করা হবে আমাকে। সমগ্র পরিস্থিতির সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপারটি হবে যে, আমার সম্পর্কে কি রিপোর্ট পাঠানো হচ্ছে তা জানার কোন উপায় থাকবে না আমার। আর যেসব বিষয় এবং ঘটনা সত্যিই ক্ষতিকর নয়, তা বিশ্লেষণ করার কোন সুযোগ দেওয়া হবে না আমাকে। এইভাবে এটা সম্ভব, যে ১৯২৯ সাল এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমি ভারত সরকারের কাছে একজন সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বলশেভিক এজেন্ট (কারণ ইওরোপে এখন একটিই দুঃস্বপ্ন, তা হল বলশেভিক-ভীতি) হয়ে উঠব, এবং অবশ্যম্ভাবী ফল হবে যে, হয় আমার ভারতে প্রত্যাবর্তনে বাধা দেওয়া হবে অথবা সেখানে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় গ্রেফতার করা হবে আমাকে। জন্মভূমি থেকে স্বেচ্ছা-নির্বাসনের কোন ইচ্ছা নেই আমার এবং তাই আমি কামনা করি যে, আমার দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে সরকার এক মুহূর্তের জন্যও বিষয়টিকে দেখুন। যদি আমার বলশেভিক এজেন্ট হওয়ার সামান্যতম ইচ্ছা থাকত, তা হলে প্রস্তাবটি উত্থাপন করা মাত্রই আমি তা গ্রহণ করতাম এবং প্রথম পাওয়া জাহাজেই ইওরোপ রওনা হতাম। আমি যদি আমার স্বাস্থ্য-

পুনরুদ্ধারে সক্ষম হতাম, তবে, তখন, আমি সেই প্রাণোচ্ছল দলে যোগদান করতাম, যারা প্যারী থেকে লেলিনগ্রাদ পর্যন্ত ছুটোছুটি করে বেড়ায়, বিশ্ব-বিপ্লবের কথা বলে এবং তাঁদের বক্তব্যে ঝরায় রক্ত আর বজ্রধ্বনি। কিন্তু এখন আমার তেমন কোন আকাঙ্ক্ষা কিংবা ইচ্ছা নেই।

আমি কি এতই ভয়ঙ্কর

যখন আমি দেখি যে আমাকে প্রতিশ্রুতি দিতে বলা হয়েছে যে ভারত, বর্মা এবং সিংহলে আমি আর প্রত্যাবর্তন করব না, তখন আমি কেবল আমার চোখ রগড়াই এবং নিজেকে প্রশ্ন করি—"আমি কি ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অস্তিত্বের পক্ষে এতোই ভয়ঙ্কর যে বাংলা থেকে নির্বাসনকেও যথেষ্ট নিরাপদ বলে মনে করা হচ্ছে না, নাকি এর সবকিছুই একটা ভাঁওতা? যদি প্রথমটি সত্য হয়, তবে একদিক থেকে একজন জাতীয়তাবাদীর পক্ষে তাঁকে একথা বলা কিছুটা গর্বের যে, তিনি আমলাতন্ত্রের কাছে এতো বড় এক উপদ্রব। কিন্তু আমি যখন তথ্যসমূহ লক্ষ্য করি এবং গ্রেফতার হবার আগের আমার জীবন ও কার্যকলাপকে বিশ্লেষণ করি, তখন আমি এটা অনুভব না করে পারি না: য আমার রাজনৈতিক রং এতোখানি লাল নয় যতোখানি কিছু স্বার্থান্বেষী এবং বিদ্বেষপরায়ণ ব্যক্তি সরকারকে বিশ্বাস করাতে চেয়েছেন। বাংলার বাইরে আমি রাজনৈতিক কাজকর্ম করিনি এবং তা করার তেমন কোন ইচ্ছাও আমার নেই, অন্তত সামনের কয়েকটা বছরের জন্য—কারণ আমার পক্ষে এবং আমার উচ্চাশার পক্ষে বাংলা যথেষ্টই বড়। আমি মনে করি না যে বাংলা ছাড়া আর কোন সরকারের (তো সে ভারত সরকারই হোক কিংবা অন্য কোন প্রাদেশিক সরকার হোক) আমার বিরুদ্ধে বলার কিছু আছে এবং আমার যতদূর মনে পড়ছে কেবলমাত্র পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া কিংবা এ. আই. সি. সি. অথবা কংগ্রেসের সভায় যোগদান করতে যাওয়া ছাড়া গত দু'বছরের মধ্যে আমি আমি বাংলা ছেড়ে বাইরে যাইনি। তাহলে আমাকে এক ভয়ঙ্কর ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করে এবং ভারত, বর্মা ও সিংহলে আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ করে অন্যান্য সরকারের কাছে আমার সম্পর্কে এমন প্রতিকূল ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা কেন? সিংহল একটি ব্রিটিশ উপনিবেশ হওয়ায়, আমার সন্দেহ, এমন শর্ত স্থাপন করার কোন এক্তিয়ার বাংলা সরকার অথবা এমন কি ভারত সরকারেরও আছে কিনা।

"আমি অল্পই ঘোরা ফেরা করেছি"

বাংলা সরকার এখন আমার গতিবিধির উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে চান, কিন্তু মুক্ত থাকাকালে আমি অল্পই ঘোরা ফেরা করেছি। ১৯২৩-এর অক্টোবর থেকে ১৯২৪-এর অক্টোবরের মধ্যে আমার মনে হয় না যে দু'বারের বেশী আমি কলকাতা ছেড়েছি—

প্রথমবার খুলনা জেলা সম্মেলনে যোগদানের জন্য দ্বিতীয়বার একজন সম্ভাব্য এম. এল. সি.-র জন্য নদীয়া জেলায় কিছু নির্বাচনী সভায় বক্তৃতা দেওয়ার উদ্দেশ্যে। আর ১৯২৪ সালের ফেব্রুয়ারী এবং অক্টোবরের মধ্যে আমার মনে পড়ে না যে আমি আদৌ কলকাতা ছেড়ে নড়েছি কিনা। সিরাজগঞ্জ সম্মেলনের সঙ্গে আমাকে যুক্ত করার সব চেষ্টাই অর্থহীন এবং বিদ্বেষপ্রসূত, কারণ যখন সম্মেলন বসেছিল তখন সবেমাত্র আমি চীফ এক্‌জিকিউটিভ্‌ অফিসারের কার্যভার গ্রহণ করেছি এবং পৌর কাজকর্মে আর ঝাড়ুদারদের এক আসন্ন ধর্মঘট মিটমাটের কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম। ফলে এক মিনিটের জন্যও কলকাতা ত্যাগ করার উপায় ছিল না। ১৯২৪ সালের মে থেকে অক্টোবরের মধ্যে আমার কাজকর্ম এবং চলাফেরা সম্পর্কে উল্লেখের কোন প্রয়োজন নেই, কারণ, সেগুলি সকলেরই জানা বিষয়। আমার গ্রেফতারের পূর্বে আমার গতিবিধি সম্পর্কে সরকার সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন এবং তাই আমার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করাই যদি আমাকে বন্দী করার উদ্দেশ্য হতো, তা হলে আমাকে গ্রেফতার করার আদৌ কোন প্রয়োজন ছিল না।

বিশেষভাবে নির্মম

মাননীয় সদস্যের প্রস্তাবের একটি দিক বিশেষভাবে নির্মম বলে আমার মনে হয়েছে। সরকার জানেন যে প্রায় আড়াই বছর যাবৎ আমি আমার পিতা-মাতা সহ অধিকাংশ আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিনি। তা সত্ত্বেও তাঁদের প্রস্তাব হল যে, পরিজনদের সঙ্গে সাক্ষাতের কোন সুযোগ গ্রহণ না করেই আমি যেন অন্তত আড়াই/তিন বছরের জন্য বিদেশে চলে যাই। এটা আমার পক্ষে কষ্টকর—আরো বেশী তাঁদের পক্ষে যাঁরা আমাকে ভালবাসেন—যাঁদের সংখ্যা আমার ধারণা খুবই বেশী। একজন পশ্চিমী মানুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় যে প্রাচ্য দেশীয় মানুষদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনের প্রতি কি গভীর আসক্তি থাকে। আমার মনে হয়, এই অজ্ঞানতাই—ইচ্ছাকৃত নয়, এর জন্য দায়ী, যাকে আমি সরকারী প্রস্তাবের এক হৃদয়হীন দিক বলে মনে করি। এই ধারণা কেবলমাত্র এক পশ্চিমী মনের বৈশিষ্ট্যের পক্ষেই সম্ভব যে, যেহেতু আমার বিয়ে হয়নি, সুতরাং আমার কোন পরিবার (শব্দটিকে বৃহত্তর অর্থে ধরে) কিংবা কারো জন্য কোন আসক্তি থাকতে পারে না।

সরকার মনে হয় একেবারেই ভুলে গেছেন যে গত আড়াই বছর ধরে আমাকে কি কষ্ট স্বীকারে বাধ্য করেছেন তাঁরা। বিনা কারণে তাঁরা এই সময় আমাকে কারারুদ্ধ করে রেখেছেন। আমাকে কেবল বলা হয়েছিল যে আমি অস্ত্র আমদানির ষড়যন্ত্রের একজন সদস্য, এবং বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুত করার ও সরকারী কর্মচারী হত্যার জন্য দায়ী; আর আমার কিছু বলার আছে কিনা জানতে চাওয়া হয়েছিল। আমার বিস্ময়

বোধ হয় যে, স্বর্গীয় স্যার এডওয়ার্ড মার্শাল হল অথবা স্যার জন সাইমন কেবল "নির্দোষ" বলা ভিন্ন আত্মপক্ষ সমর্থনে আর কোন যুক্তি প্রদর্শন করতে পারতেন কিনা—ঠিক এই কাজটি আমি করেছি। যখন দ্বিতীয়বারের জন্য অভিযোগগুলি আমার সামনে উপস্থিত করা হয়, আমি নিজেই প্রশ্ন করেছিলাম যে, সকলের মধ্যে আমিই কেন পুলিশী নির্যাতনের শিকার হচ্ছি—এবং আমার মনে হয়, আমি তার একটি মনমতো ব্যাখ্যা দিতে পেরেছি। আমার গ্রেফতারের পর থেকে বাংলা সরকার আমার পোষ্যগণের ভরণপোষণ এবং আমার জীবনযাত্রানির্বাহের জন্য কোন প্রকার অনুদান মঞ্জুর করেন নি। শেষ ব্যবস্থা হিসেবে আমি যখন মহামান্য ভাইসরয়ের কাছে আমার আবেদন জানাই, বাংলা সরকার আমার আবেদনটিকে আটক করে রাখেন। এর উপর তাঁরা চান যে প্রায় তিন বছরের জন্য আমি নির্বাসিত জীবনযাপন করি এবং আয়ের ব্যবস্থা করি ইউরোপে আমার নির্বাসন-কালে আমার ভরণপোষণের জন্য। এটা কি ভাল এবং যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব? যদি সরকার আর কোন স্বাভাবিক দায়িত্ব স্বীকার করতে না-ও চান, তবে অন্তত তাঁদের এই বাধ্য-বাধকতা অনুভব করা উচিত যে ১৯২৪ সালে আমার স্বাস্থ্যের যে অবস্থা ছিল তাদের উচিত আমার মুক্তিদানের সময় সে স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দেওয়া। কারাবাসের কারণে যদি আমার স্বাস্থ্যহানি ঘটে থাকে, তবে তাঁদের উচিত আমাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া। আমার অতীত স্বাস্থ্য ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত সমস্ত খরচা বহনের দায়িত্ব অন্তত নেওয়া উচিত তাঁদের। কতোদিন সরকার তাঁর নৈতিক দায়িত্ব অস্বীকার করে চলবেন? আমার বিদেশযাত্রার আগে সরকার যদি একবার আমাকে বাড়িতে যেতে দিতেন, যদি ইওরোপে আমার সমস্ত খরচা বহনে স্বীকৃত হতেন এবং সুস্থ হয়ে উঠলে বাধাবিপত্তি ছাড়াই আমাকে ফেরাব অনুমতি দিতেন, তবে প্রস্তাবটিতে কিছুটা মানবিক ব্যাপার থাকত।

নম্রতার মোড়কে আক্রমণের ভীতি

সর্বশেষে মাননীয় সদস্য আমাকে নম্রতার মোড়কে আক্রমণের ভয় দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন—"সরকার এবং মিস্টার বসু উভয়ই জানেন যে তাঁরা তাঁকে ক্রিমিনাল ল' এ্যামেণ্ডমেণ্ট এ্যাক্টের মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আটক রাখতে পারেন।" আমি তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত এবং আমি আরো অগ্রসর হয়ে বলব, আমি জানি যে, সরকার যতদিন খুশী আটক রাখতে পারেন আমাকে। কারণ এ্যামেণ্ডমেণ্ট এ্যাক্টের মেয়াদ শেষ হলে তাঁরা হয় তার মেয়াদ বৃদ্ধি করতে পারেন অথবা পারেন ১৮১৮ সালের রেগুলেশন থ্রি'র অধীনে আমার উপর নতুন নির্দেশ জারী করতে। সত্যি কথা বলতে কি, আমি মিস্টার লোম্যান সহ বহু উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীকে বলেছি যে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমি অনুভব করি যে, আমাদের সারাজীবন আটক রাখা থেকে সরকারকে

নিবৃত্ত করার মতো কোন ব্যবস্থা নেই। যদিও এর জন্য এম. এল. এ. এবং এম. এল. সি. গণ তাঁদের ক্রোধ ও অধীরতা প্রকাশ করতে পারেন, আর ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারেন একজিকিউটিভ কাউন্সিলারদের সফরের অর্থ। সরকার যে আমাদের সারাজীবন এখানে আটক রাখতে প্রকৃতই ইচ্ছুক নন তা জানতে আমার এখনও বাকী আছে : আমার মনে পড়ছে পূতস্মৃতি দেশবন্ধু আমাকে যা বলে ডাকতেন (একজন "তরুণ বৃদ্ধ ব্যক্তি")। কারণ, তিনি এটিকে আমার নিরাশাবাদ বলে মনে করতেন। এক দিক থেকে আমি নিরাশাবাদী, কারণ সবচেয়ে খারাপ যা ঘটতে পারে আমি সর্বদাই তার ছবি আঁকতে চেষ্টা করি। যদি আমি সরকারের প্রস্তাব গ্রহণ না করি, তবে, এই ক্ষেত্রে আমার ব্যাপারে সবচেয়ে খারাপ যা ঘটতে পারে আমি তা অনুধাবন করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমি নিজেকে বুঝিয়ে উঠতে পারিনি যে, জেলে সমাধিলাভের তুলনায় জন্মভূমি থেকে এক স্থায়ী নির্বাসন ভাল কিছু হবে। এই নিরানন্দ ভবিষ্যতের মুখে নিস্তেজ হয়ে পড়ছি না আমি, কারণ কবির মতো আমিও বিশ্বাস করি যে "বিজয়-গৌরবের পথ কবরের দিকেই ছুটে চলে।"

আমার বিশ্বাস সরকারী প্রস্তাবের পক্ষে এবং বিপক্ষে যা যা বলা যায় তার সবই বলেছি আমি। আমার মুক্তির সম্ভাবনা বিরল বলে কেউ যেন দুঃখ না করেন। সর্বোপরি আমাদের প্রিয় বাবা-মাকে সান্ত্বনা দিন, কারণ তাঁদের ভাগ্যই সবচেয়ে কষ্টকর ; আর সেই সঙ্গে সান্ত্বনা দেবেন আর আর সকলকে, যাঁরা ভালবাসেন আমাকে। স্বাধীনতার অমূল্য সম্পদ সংগ্রহ করার আগে ব্যক্তিগত ও সংঘবদ্ধ ভাবে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে আমাদের। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আমি নিজে শান্ত আছি এবং আমি তাঁর দেওয়া সব কষ্টের মুখোমুখি হতে পারব শান্ত মনোভাব নিয়ে। আমি আমার নিজস্ব বিনীত উপায়ে আমাদের জাতির সমস্ত অতীত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছি বলে মনে করি। আমি খুশি আছি এবং থাকব আমার এই প্রায়শ্চিত্তে। আমাদের আদর্শের মৃত্যু নেই, আমাদের আদর্শ জাতির স্মৃতিপট থেকে মুছে যাবে না এবং আমাদের উত্তরসূরীরা আমাদের অতি প্রিয় স্বপ্নের কথা স্মরণ করে গর্বিত বোধ করবে,—এই বিশ্বাসই আমাকে আমার চিরদিনের দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্যে বাঁচিয়ে রাখবে।

তাড়াতাড়ি উত্তর দেবেন।

আপনার একান্ত প্রিয়,

স্বাঃ সুভাষ

(আই. ও. আর. ফাইল নং এল/পি এণ্ড জে/৭/১৯২)

উদ্দেশ্যে,

মাননীয় হোম-মেম্বার, ভারত সরকার,
সিভিল সার্জেন, লক্ষ্ণৌ এবং যুক্তপ্রদেশ
সরকারের মাধ্যমে।

ইওরোপে যাবার অনুমতি সম্পর্কে

প্রিয় মহাশয়,

আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পাটনার মিস্টার সতীশচন্দ্র বসু আমাকে আমার মামলার বিষয়ে ভারত সরকারের নির্দেশ জানিয়েছেন। আমি ঐ নির্দেশের জন্য কৃতজ্ঞ এবং এর অন্তর্নিহিত মনোভাবের প্রশংসা করি। পরিস্থিতি অনুমোদন করলে, আমি বিশ্বাস করি যে নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত সরকারী প্রস্তাব ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হবে।

২. এই নির্দেশের সঙ্গে সম্পর্কিত দুটি বিষয় রয়েছে, তুলনামূলক ভাবে যেগুলি কম গুরুত্বপূর্ণ, যেটি সম্ভবত আমার দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে বিবেচনা করে দেখা হয় নি। এই বিষয়গুলি সম্পর্কে যথাসম্ভব স্পষ্টভাবে আমি আমার অসুবিধের কথা জানাচ্ছি। প্রথমত, এই নির্দেশ অনুসারে ভারতের উপকূল ত্যাগ করার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত আমাকে বন্দী থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত, পাসপোর্ট দেওয়া হবে কেবল ফ্রান্স ও সুইজারল্যাণ্ডের জন্য।

৩. প্রথমত বিষয়টি সম্পর্কে আমি জানাতে চাই যে কলকাতা এবং পাটনা থেকে বেশ কিছু দূরে বন্দী অবস্থায় ইওরোপে দীর্ঘদিন বসবাসের ব্যবস্থা করা আমার পক্ষে কষ্টকর হবে—যদি না অসম্ভব হয়। বর্তমানে আমি সপ্তাহে কেবল তিনটি চিঠিই লিখতে পারি এবং যদিও আইনত সপ্তাহে একটি সাক্ষাতের অনুমতি আছে, কার্যত, এই সুযোগ প্রায়ই ব্যবহার করতে পারি না, কারণ হল বাংলার গোয়েন্দা দফতরের প্রয়োজনীয় অনুমতি সংগ্রহের অসুবিধে। সুতরাং আমার বর্তমানের এই দুরবস্থার মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ সম্পর্কে দেখাশোনা করা কিংবা নির্দেশদান আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। আমি তেমন ব্যক্তিদের একজন নই যাঁরা বছর অন্তর ইওরোপে যাত্রা করেন এবং তাই মুহূর্তের নোটিশে পারেন যাত্রা শুরু করতে। আবার ধুতি ও লেংটি পরেও আমি ইউরোপভ্রমণে যেতে ইচ্ছুক নই। ফলে আমার পক্ষে প্রয়োজনীয় জামাকাপড় জোগাড় করে ওঠা এক অসুবিধের কাজ হবে। প্রতি পদক্ষেপে অসংখ্য প্রশ্ন আসবে, যার জন্য প্রতিদিনকার আলোচনা আর তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রয়োজন হবে। যাত্রাপথ, জাহাজ কোম্পানি, পরিচর্যাকারী পরিচারক, জামাকাপড়, ইউরোপ পৌঁছে যেসব প্রথা-পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে, কোন্ চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে, কোন্ স্যানেটোরিয়ামে যেতে হবে, প্রভৃতি প্রশ্নগুলি আমার অনুপস্থিতিতে, অন্য কারো

পক্ষে, আমার সঙ্গে আলোচনা না করে মীমাংসা করা সম্ভব হবে না। তাই আমি মনে করি যে আমাকে যদি এখন বাড়িতে যেতে দেওয়া হয় তবে ইউরোপযাত্রার ব্যবস্থা করারই কেবল সুবিধে হবে না, যথেষ্ট দ্রুততার সঙ্গে তা করা সম্ভব হবে। আমার দিক থেকে যত তাড়াতাড়ি ইউরোপে পৌঁছাতে পারি ততোই ভাল,—কারণ দেরী করার অর্থ স্বাস্থ্য আরও খারাপ হওয়া এবং আরোগ্যের সম্ভাবনা হ্রাস পাওয়া। অধিকন্তু, আমার আত্মীয়স্বজনকে বিদায়সম্ভাষণ না জানিয়ে বিদেশ যাওয়া আমার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হবে। আমার পিতা-মাতা (যাঁরা এখন কটক অথবা পুরীতে আছেন) বৃদ্ধ হয়েছেন, এবং বিশেষ করে হৃদ্‌যন্ত্রের কষ্টে ভুগছেন আমার পিতা। কেবল ঈশ্বরই জানেন ইওরোপ থেকে ফিরে আমি তাঁদের দেখতে পাব কিনা? তাছাড়া আমার অন্যান্য ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনরা হয় কলকাতায় অথবা তার কাছে ছড়িয়ে আছেন। আমার অধিকাংশ আত্মীয়স্বজনের পক্ষে লক্ষ্ণৌ কিংবা বোম্বাইতে আমাকে বিদায় জানাতে আসা একান্তভাবেই অসম্ভব, আমার সাক্ষাৎলাভের অনুমতির প্রশ্নটি না হয় বাদই দিলাম।

৪. দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে আমি জানাতে চাই যে, আমার অসুখের কিছু জটিলতার দরুন ফ্রান্স ও সুইজারল্যাণ্ড বাদে অন্যান্য দেশসফরের সম্ভাবনার প্রয়োজন হতে পারে। যদিও আমি শল্যচিকিৎসা এড়াবার আপ্রাণ চেষ্টা করব, তবু আমার ভুললে চলবে না যে বহু বিশিষ্ট চিকিৎসক তার প্রয়োজন হতে পারে বলে মত প্রকাশ করেছেন। সেক্ষেত্রে আমাকে ভিয়েনা কিংবা বার্লিন অথবা ডেনমার্কে যাবার পরামর্শ দেওয়া হতে পারে—অথবা এমনকি লণ্ডনের কিছু বিশেষজ্ঞের সঙ্গেও আমার আলোচনার প্রয়োজন হতে পারে। আমি হতাশ হব যদি ইউরোপে পৌঁছিয়ে আমাকে শুনতে হয় যে আমি ফ্রান্স কিংবা সুইজারল্যাণ্ডের বাইরে যেতে পারব না। আর তা কেবল এই কারণে যে ভারত সরকার তাঁর নির্দেশে এবং পাসপোর্টে সেই মত ব্যক্ত করেছেন।

৫. তাই আমার অনুরোধ—(১) বিদেশযাত্রার ব্যবস্থা দ্রুত করে ওঠার জন্য আমাকে এখন বাড়িতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হোক, এবং (২) পাসপোর্টটিকে ফ্রান্স ও সুইজারল্যাণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ না করে তা দেওয়া হোক সমগ্র ইওরোপের জন্য।

সরকার যদি সন্দেহ করেন যে আমাকে বাড়িতে যাওয়ার অনুমতি দিলে আমি পুনরায় রাজনৈতিক কাজকর্ম শুরু করব, তবে আমি বলতে পারি যে আমার বর্তমান শারীরিক অবস্থায় তার আদৌ কোন সম্ভাবনা নেই। অধিকন্তু, বিধিবদ্ধ আইন, রেগুলেশন এবং অর্ডিনান্সের অধীনে সরকারের যথেষ্ট ক্ষমতা রয়েছে যার দ্বারা তাঁরা আমাকে বাড়িতে যাবার স্বাধীনতা দিতে পারেন, কিন্তু ইওরোপযাত্রার পূর্বে ঐ সময়ের মধ্যে আমি যাতে পুনরায় রাজনৈতিক কাজকর্ম শুরু করতে না পারি, তার জন্য, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে, গ্রহণ করতে পারেন নিশ্চিন্ত ব্যবস্থা। আমি একথা বলছি, কারণ

সরকার হয়তো এই ভাবনা পোষণ করে থাকতে পারেন যে এখন জনকল্যাণমূলক কাজকর্ম আবার শুরু করার পক্ষে শারীরিকভাবে অক্ষম হবার মতো অসুস্থ নই আমি।

৬. সর্বশেষে আমার কেবল এটাই বলার আছে যে নির্দেশটির মধ্যে যে মহৎ মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে, উপরি-উক্ত বিষয় দুটি অনুকূল ভাবে বিচার করতে অস্বীকার করে তা নষ্ট করবেন না।

ধন্যবাদ জানবেন

আপনার একান্ত,
স্বাঃ সুভাষচন্দ্র বসু

বলরামপুর হাসপাতাল,
লক্ষ্ণৌ,
১৭.১.৩৩

(আই. ও. আর. ফাইল নং এল/পি এণ্ড জে/৭/৭৯২)

সি/ও দি আমেরিকান এক্সপ্রেস কোম্পানি
কার্নটনোরিং ১৪,
ভিয়েনা ১.
১৭.৩.৩৩.

প্রিয় মিস্টার থাটল,

আপনার ১৫ তারিখের সহৃদয় পত্রখানি পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি।

গত জানুয়ারী মাসে ভারত সরকার যখন আমার কাছে প্রস্তাবটি করেন, আমি প্রত্যুত্তরে সাধারণভাবে সমগ্র ইওরোপের জন্য আমার পাসপোর্টের সুযোগ বাড়াবার অনুরোধ জানিয়েছিলাম—কেবল ফ্রান্স ও সুইজারল্যাণ্ডের জন্য নয়। অনেক দরকষাকষির পর তাঁরা ইতালি ও অষ্ট্রিয়ার জন্যও পাসপোর্ট দিতে সম্মত হন। কিন্তু তাঁরা যখন আমাকে পাসপোর্টটি মঞ্জুর করেন, তখন তাতে লিপিবদ্ধ করেন যে পাসপোর্ট জার্মানি ও যুক্তরাজ্যের জন্য কার্যকর নয়। আমি ভারত সরকারকে জানিয়েছিলাম যে, ইওরোপের গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা-কেন্দ্রগুলিতে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শের উদ্দেশ্যে আমি সফরের অনুমতিলাভের জন্য বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন—যেমন ভিয়েনা, বার্লিন এবং লণ্ডন; কিন্তু তাঁরা কেবল অষ্ট্রিয়ার জন্য পাসপোর্টের সুযোগ বৃদ্ধি করেন।

এখানে চিকিৎসকেরা যে রোগ নির্ণয় করেছেন, তার সঙ্গে ভারতে সরকারী ও বেসরকারী চিকিৎসকদের রোগনির্ণয়ে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। স্বাধীনতা পেলে আমি বার্লিন এবং লণ্ডনে কয়েকজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করতে ইচ্ছুক ছিলাম। কিন্তু পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাতে তা সম্ভব নয়।

আমার ভাইয়ের সম্পর্কে বলতে গেলে, আপনি জানেন যে ১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে তিনি বন্দী রয়েছেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি ডায়েবেটিস রোগে আক্রান্ত হয়েছেন এবং জেলের অধীক্ষক, যিনি নিজেও আই. এম. এস-এর একজন উচ্চপদস্থ চিকিৎসক, বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, কারারুদ্ধ অবস্থায় আমার ভাইয়ের স্বাস্থ্যের উন্নতির কোন সম্ভাবনা নেই। ইওরোপের যাত্রাপথে বোম্বাইয়ে যাবার সময় আমি মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি এবং তাঁকে অত্যন্ত অসুস্থ দেখতে পাই। গ্রীষ্মকালে জব্বলপুর একটি ফারনেসে পরিণত হয়। এটি গ্রীষ্মাঞ্চলের একদম কেন্দ্রে অবস্থিত। আমি আশঙ্কিত যে আগামী কয়েকটি মাস তাঁর অত্যন্ত খারাপ যাবে। যেহেতু তাঁর রোজগার অত্যন্ত ভাল ছিল, তাই তাঁর কারাবাস সমগ্র পরিবারকে অত্যন্ত দুরবস্থার মধ্যে ফেলেছে। তাঁর গ্রেফতারের মাত্র কয়েক মাস আগে তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রকে স্নাতকোত্তর বিদ্যাশিক্ষার জন্য মিউনিখে পাঠিয়েছিলেন এবং তিনি যখন হঠাৎ বন্দী হন, তখন তাঁর পুত্রের পড়াশুনা চালিয়ে যাবার জন্য অর্থ ঋণ করতে হয়। সমগ্র বিষয়টির সবচেয়ে বিস্ময়কর দিক হ'ল এটি একটি বিনাবিচারে কারাবাসের ঘটনা এবং তা অনির্দিষ্টকালের জন্য। এখনও পর্যন্ত আমরা কেউই অভিযোগের প্রামাণিক তথ্যগুলি সম্পর্কে অবহিত নই, যেসবের ভিত্তিতে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করা হয়েছিল।

যদি আমার ভাইয়ের জন্য এবং আমার পাসপোর্টের সুযোগবৃদ্ধির জন্য কোন কিছু করা সম্ভব হয়, তবে আমি সত্যিই অত্যন্ত খুশী হব। আমার ধারণা আমার ভাইকে মুক্তি দেবার এটাই সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। এই সময়ে ইণ্ডিয়া অফিস থেকে পাওয়া একটি নির্দেশ অত্যন্ত কার্যকর হবে। আমার মনে হয় সবচেয়ে ভাল হবে, সম্ভব হলে, যদি মিস্টার ল্যান্সবুরী বিষয়টি নিয়ে স্যার স্যামুয়েল হোরের সঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি যদি স্যার স্যামুয়েলের সঙ্গে কথা বলেন, তবে পরিস্থিতি কোন্ অবস্থায় আছে তা তিনি জানাতে পারবেন। আমি আপাতত ভিয়েনা সিটির একটি স্যানেটোরিয়ামে আছি। আশা করি, আপনি ভাল আছেন। মিসেস্ থার্টল এবং আপনার জন্য সহৃদয় নমস্কার রইল।

আপনার একান্ত

স্বাঃ সুভাষ বসু

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

আমি আশা করি এই পরিস্থিতির অস্বাভাবিকতা সকলেই উপলব্ধি করতে পারবেন যে আমাকে একটি ব্রিটিশ পাসপোর্ট দেওয়া হয়েছে অথচ যা গ্রেট ব্রিটেনে যাওয়ার পক্ষে বৈধ নয়।

আমার ভাইয়ের সম্পর্কে বলতে গেলে আপনাকে এটা জানানো প্রয়োজন যে বাংলার এ্যাডভোকেট-জেনারেলের—সরকারের আইনসংক্রান্ত সর্বোচ্চ পরামর্শদাতা—মত হ'ল যে ১৮১৮ সালের রেগুলেশন থ্রি-এর অধীনে তাঁকে গ্রেফতার করার যথেষ্ট কারণ নেই। এ্যাডভোকেট-জেনারেল কিছুদিন পূর্বে এই মতামত বাংলার গভর্নরকে জানিয়েছিলেন। আমার ধারণা, গতবার ইংল্যাণ্ডে অবস্থানকালে তিনি আমার ভাইয়ের মামলাটির বিষয়ে স্যার স্যামুয়েলের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিলেন। এ্যাডভোকেট-জেনারেল হলেন স্যার এন. এন. সরকার—যিনি বাংলার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য সরকার মনোনীত সদস্য ছিলেন তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠকে।

সু. চ. ব

(আই. ও. আর. ফাইল নং এল / পি / এণ্ড জে / ৭/৭৯২ পৃ. ১৪৯-৫১)

সি/ও দি আমেরিকান এক্সপ্রেস কোম্পানি

১৪, কার্নটনেরিং

ভিয়েনা

তাং ৩রা মার্চ। এপ্রিল, ১৯৩৩

স্যানেটোরিয়াম

ডাঃ ফার্থ

উইন

৮।১ সিমিডগাস ১৪

টেলিফোন এ-২৯-৫-৩৫ সেরি

সমীপেষু,

মাননীয় আণ্ডার সেক্রেটারী অব স্টেট ফর ইণ্ডিয়া,

ইণ্ডিয়া অফিস, হোয়াইটহল,

লণ্ডন।

প্রিয় মহাশয়,

ভারত ত্যাগের পূর্বে আমি ভারত সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলাম যে, আমাকে যেন এমন এক পাসপোর্ট মঞ্জুর করা হয় যার সাহায্যে, অন্যান্য স্থানের সঙ্গে, প্রয়োজনে, আমি ভিয়েনা, বার্লিন এবং লণ্ডন সফর করতে পারি। যাই হোক, ভারত সরকার কেবল ইতালি ও অস্ট্রিয়ার জন্য আমার পাসপোর্টের সুযোগ বৃদ্ধি করেন ; তাঁরা আমাকে জানান যে পাসপোর্টের অন্তর্ভুক্ত স্থানগুলি ভিন্ন আমি যদি আর কোন স্থান

সফর করতে চাই, তবে যেন আপনার কাছে আবেদন জানাই এবং তা যথাযথ ভাবে বিবেচনা করে দেখা হবে। ৮ই মার্চ থেকে আমি ভিয়েনায় রয়েছি এবং চিকিৎসাধীনে রয়েছি প্রায় তিন সপ্তাহ।

মাদ্রাজ, ভাওয়ালী এবং লক্ষ্ণৌতে যেসব চিকিৎসক আমাকে পরীক্ষা করেছিলেন, তাঁদের রোগনির্ণয়ের সঙ্গে আমার পরামর্শকারী ভিয়েনার চিকিৎসকদের রোগনির্ণয়ে তফাত ঘটেছে। ঐসব স্থানে আমাকে পরীক্ষা করেছিলেন আই. এম. এস-এর বিশিষ্ট সদস্যগণ এবং বিশিষ্ট বেসরকারী চিকিৎসকেরা। এখন পর্যন্ত আমার উন্নতি সন্তোষজনক নয় এবং আমার ইচ্ছা জার্মানি ও ইংল্যাণ্ডের কয়েকজন বিশিষ্ট চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করা। উদ্দেশ্যে, আমি যে রোগে আক্রান্ত হয়েছি, তা নির্ণয় ও তার চিকিৎসা এবং কোন অপারেশনের প্রয়োজন আছে কিনা, আর তা যুক্তিযুক্ত কিনা, তা জানা। আমি তাই জার্মানি এবং ইংল্যাণ্ড সফরের উদ্দেশ্যে আমাকে প্রয়োজনীয় পাসপোর্ট মঞ্জুর করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

ধন্যবাদ সহ,

আপনার একান্ত

স্বাঃ সুভাষচন্দ্র বসু

(আই. ও. আর. ফাইল নং এল / পি এণ্ড জে /৭/৭৯২ পৃ. ১৩৩)

দি ইণ্ডিয়া লীগ

(অতীতের কমনওয়েলথ অব ইণ্ডিয়া লীগ)

প্রধান কার্যালয় : ১৬৫ স্ট্র্যাণ্ড, লণ্ডন, ডব্লিউ. সি. ২

টেলিফোন : টেম্পেল বার ৩৬৮৯.

বিষয়

স্বরাজের (স্বায়ত্তশাসন) জন্য ভারতের দাবির প্রতি সমর্থন :

চেয়ারম্যান
বার্টাণ্ড রাসেল

কোষাধ্যক্ষ
মণিকা হোয়েটলি

সম্পাদকদ্বয়
জেম্স্ মার্লে
ভি. কে. কৃষ্ণমেনন

সহকারী চেয়ারম্যান
ডি. আর. গ্রীনফেল, এম. পি.

পার্লামেণ্টারী সম্পাদক
উইলিয়মস, এম. পি.

৩০শে মার্চ, ১৯৩৬

উদ্দেশ্যে,

দি সেক্রেটারী অব স্টেট ফর ইণ্ডিয়া,

ইণ্ডিয়া অফিস,

হোয়াইট হল,

মহাশয়,

আপনার অবগতির জন্য আমি, গত ২৮ তারিখে, শনিবার, অল্‌ডারম্যান ডব্লিউ. টি. কেলী. এম. পি.-র সভাপতিত্বে লণ্ডনের এসেক্স হলে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় অনুমোদিত দুটি প্রস্তাবের একটি করে নকল এর সঙ্গে পাঠালাম।

একান্তই আপনার

স্বাঃ ভি. কে. কৃষ্ণমেনন

অবৈতনিক যুগ্ম সম্পাদক

১৬৫ স্ট্র্যাণ্ড

লণ্ডন. ডব্লিউ. সি. ২—টেম্পল বার ৩৬৮৯

অল্‌ডারম্যান উইলিয়ম টি. কেলী, এম. পি-র, সভাপতিত্বে ২৮শে মার্চ এসেক্স হলে অনুষ্ঠিত জনসভায় অনুমোদিত প্রস্তাবগুলি।

১. স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে স্বাধীন জীবনযাপনের অনুমতি পাবেন না বলে মিস্টার সুভাষ বসুর প্রতি যে সতর্কবার্তা জারী করা হয়েছে, ভারত সরকারের সেই স্বেচ্ছাচারী কাজের বিরুদ্ধে এই সভা প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং এই সভা সরকারের কাছে মিস্টার বসুকে এদেশে আসার জন্য পাসপোর্টের সুযোগদানের আরো অনুরোধ জানাচ্ছে। সেটি এতদিন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং তার জন্য কোন কারণও দেখানো হয়নি।

২. এই জনসভা, ইণ্ডিয়ান লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলে প্রত্যাখ্যাত ভারতীয় জনমতকে উপেক্ষা করে, ভারতের ভাইসরয় কর্তৃক ইণ্ডিয়ান ক্রিমিনাল ল' এ্যামেণ্ডমেণ্ট এ্যাক্টের বিধিবদ্ধকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং আহ্বান জানাচ্ছে আইন, ন্যায় ও শাসনের যে-কোন উৎকৃষ্ট মানের বিপরীত এই জঘন্য আইনটিকে বাতিল করার জন্য। এই সভা, ভারতে দমনমূলক ব্যবস্থাগ্রহণ, গ্রন্থনিষিদ্ধকরণ, সংবাদপত্রের উপর আক্রমণ ও বাজেয়াপ্তকরণ, স্বেচ্ছাচারী গ্রেফতার, বিনাবিচারে আটক, গ্রামে সৈন্যবাহিনীর ব্যবহার, স্বাধীনতাদমন ও শ্রমিক-আন্দোলনের উপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছে; এবং সরকারের নিকট আহ্বান জানাচ্ছে রাজবন্দীদের মুক্তি ও পুলিশী কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে তদন্তের নির্দেশ দেবার জন্য।

(আই. ও. আর ফাইল নং এল/পি এণ্ড জে/৭/৭৯৩)

২৫. ১১. ১৯৩৭

পোস্ট রেসতান্ত,
বাডগাস্টাইন (অষ্ট্রিয়া)
মহামান্য লর্ড,

আমি বাডগাস্টাইনে এক ধারাবাহিক চিকিৎসার জন্য স্বল্পকালের সফরে ইওরোপে এসেছি, এবং কিছুকাল বাদে, দেরী হলেও জানুয়ারীর মাঝামাঝি নাগাদ, কলকাতায় পৌছনোর উদ্দেশ্যে বিমানে বাড়ি ফিরে যেতে চাই। সত্যি কথা বলতে কি, দ্রুত প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা করব আমি।

এখানে চিকিৎসার জন্য এক মাস অথবা পাঁচ সপ্তাহ লাগবে। আমি বাড়িতে আবার ফিরে যাওয়ার আগে আমার বন্ধুদের সঙ্গে এবং অধ্যয়নরত আমার ভাইপোর সঙ্গে সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে এক দ্রুত ইংল্যাণ্ডসফরে উৎসুক। মহামান্য লর্ড জানেন যে, ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৬-এর মধ্যে আমি যখন ইওরোপে ছিলাম, তখন আমার লণ্ডন সফরের উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। এই নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই আমার পাসপোর্টে, কিন্তু মৌখিক ভাবে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে বিশেষ অনুমতি ভিন্ন আমি যেন ইংল্যাণ্ড সফর না করি। সে নির্দেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছিলাম আমি। সে নিষেধাজ্ঞা এখনও বহাল কিনা আমার জানা নেই। যদি তা থেকে থাকে আমার অনুরোধ নিষেধাজ্ঞাটি তুলে নেওয়া হোক এবং ইংল্যাণ্ড সফরের অনুমতি দেওয়া হোক আমাকে।

যদি আমাকে ইংল্যাণ্ড সফরের অনুমতি দেওয়া হয়, তবে খুব বেশী হলে সপ্তাহ-খানেক অথবা দিনদশেক আমি অতিবাহিত করব সেখানে। এটাও সম্ভব যে আমার অবস্থানের সময়কাল আরও সংক্ষিপ্ত হতে পারে, যদি আমার এখানকার চিকিৎসা দীর্ঘস্থায়ী হয়—কারণ কোন অবস্থাতেই আমি আমার ইউরোপে অবস্থানকে ১০ই জানুয়ারীর অধিক স্থায়ী করতে পারব না। সে সময়ের মধ্যে আমাকে অবশ্যই ভারতে ফিরে যেতে হবে।

আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতাবোধ করব যদি মহামান্য লর্ড আমার ইংল্যাণ্ডসফরের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার জন্য দ্রুত নির্দেশ জারী করেন।

মহামান্য লর্ড আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

মাননীয় মারকুইস্ অব্ জেটল্যাণ্ড,
সেক্রেটারী অব স্টেট ফর ইণ্ডিয়া,
হোয়াইট হল,
লণ্ডন

আপনার একান্ত,
স্বাঃ সুভাষচন্দ্র বসু

(আই. ও. আর. ফাইল নং এল/পি এণ্ড জে/৭/১৯৩ পৃঃ ২৭-২৮)

সুভাষচন্দ্র বসু*

কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে বসুর পুনর্নির্বাচন এবং গান্ধীর ভূমিকা সম্পর্কে স্যার আর. টোটেনহেমের মন্তব্য ঃ

১৯৩৮ সালের শুরুতে তাঁর (নেহরুর) স্থলাভিষিক্ত হন, এমনকি, আরো চরমপন্থী এক ব্যক্তি,—মিস্টার সুভাষচন্দ্র বসু। বাংলায় সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে যুক্ত থাকার অপরাধে ১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাসে মিস্টার বসুকে গ্রেফতার করা হয়, কিন্তু আইন অমান্য আন্দোলনে তাঁর সমর্থন দানের জন্য নয়। এক বছর বাদে তাঁর স্বাস্থ্যের কারণে তাঁকে ইওরোপে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় এবং সেখানে অবস্থানকালে তাঁর গণ-বিদ্রোহের কার্যকলাপ সমর্থনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাই তাঁকে সতর্ক করে দেওয়া হয় যে ভারতে প্রত্যাবর্তন করলে তাঁকে মুক্ত অবস্থায় থাকতে দেওয়া হবে না! তিনি সেই সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে ১৯৩৬ সালে প্রত্যাবর্তন করেন এবং গ্রেফতার হন ; পুণা জেলে স্বল্পকাল অবস্থানের পর তাঁকে কার্শিয়াঙে তাঁর ভাই, শরৎচন্দ্র বসুর বাড়িতে স্থানান্তরিত করা হয়……

১৯৩৮ সালের বাকী সময়ে একাধিক ক্ষেত্রে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মিস্টার গান্ধীর সঙ্গে কংগ্রেস সভাপতির বনিবনা নেই ; কিন্তু ১৯৩৯-এর শুরুতে সভাপতি হিসেবে মিস্টার সুভাষ বসুর পুনর্নির্বাচন কংগ্রেস মহলকে বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে ঠেলে দেয়। মিস্টার গান্ধীর প্রার্থীর বিনা নির্বাচনে সভাপতি হওয়ার রীতি কয়েক বছর যাবৎ স্বীকৃত ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এইবারের ক্ষেত্রে নির্বাচকেরা তিনজন প্রার্থীকে মনোনীত করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে সরকারী প্রার্থী হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল। নির্বাচনের কয়েকদিন আগে তিনি পট্টাভি সিতারামাইয়ার পক্ষে প্রার্থী-পদ প্রত্যাহার করেন। মৌলানার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন না মিস্টার বসু। কিন্তু, মিস্টার গান্ধীর ব্যক্তিগত আবেদন সত্ত্বেও মিস্টার সিতারামাইয়াকে জমি ছেড়ে দিতে অস্বীকার করেছিলেন তিনি। ঘটনাক্রমে ৩০০০ হাজার ব্যক্তির নির্বাচনে তিনি দুশো ভোটের সংখ্যাধিক্যে জয়লাভ করেন। এর পরিণতিতে মিস্টার গান্ধী ঘোষণা করেন যে

---

*"হাউ্ কংগ্রেস ফেইল্ড ?" ১৯১৮-১৯৩৮ বছরগুলির এক ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণ, পৃ. ৫০-৫১। স্যার রিচার্ড টোটেনহেম, অতিরিক্ত সচিব, ভারত সরকার (স্বরাষ্ট্র দফতর), নতুন দিল্লী, ১৯৪৩। আই. ও. আর. এম. এস. এস. ই. ইউ. আর. এফ. ১৬১/২৯ বি—পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সুভাষচন্দ্র বসুর লেখা "ভারতের ইতিহাসে মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকা" ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল গ্রন্থে প্রকাশিত (১৯২০-৩৪) রচনাটির প্রতি।

মিস্টার বসুর বিজয় তাঁর এক ব্যক্তিগত পরাজয়। তিনি ইঙ্গিত দেন যে, ওয়ার্কিং কমিটি, প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা এবং কংগ্রেসে তাঁর অনুগামীগণ দলত্যাগ করে মিস্টার বসু ও তাঁর গোষ্ঠীকে জমি ছেড়ে দিয়ে যেতে ইচ্ছুক। শেষোক্ত ব্যক্তি এইভাবে এক উভয়-সংকটের মধ্যে উপনীত হন। কারণ, তিনি অবগত ছিলেন যে মিস্টার গান্ধীর সমর্থন ভিন্ন তাঁর পক্ষে অল্পই সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হবে। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের হারানো প্রভাব ব্যক্তিগতভাবে পুনরুদ্ধার করার প্রয়োজন ছিল মিস্টার গান্ধীর, এবং আশা করা গিয়েছিল যে ভারতীয় রাজ্যসমূহের বিরুদ্ধে কিছুকাল যাবৎ প্রচলিত আন্দোলনটিতে দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করে তিনি এই উদ্দেশ্যসাধন করবেন। এইভাবে আভ্যন্তরীণ সমস্যা থেকে দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে দেবেন।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে উত্তেজনাপূর্ণ পথ তিনি গ্রহণ করেছিলেন তা পূর্বে অনুধাবন করতে পারেন নি কেউ। সেটি ছিল ১৯৩৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখের সুবিখ্যাত রাজকোট "আমরণ অনশন......"। কোন অস্তিত্ব রইল না কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির। তার ষোল জন সদস্যের মধ্যে বারো জন এক যুক্ত পত্রে পদত্যাগ করলেন এবং সভাপতির প্রতি আহ্বান জানালেন তাঁর নিজস্ব ক্যাবিনেট গঠন করতে এবং আপন নীতি অনুসরণ করার জন্য। আর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এক দীর্ঘ বিবৃতি প্রকাশ করে আক্রমণ করলেন মিস্টার সুভাষ বসুকে। এমন এক পরিস্থিতিতে, এবং মূল দৃষ্টি রাজকোটে কেন্দ্রীভূত করে, ত্রিপুরীতে কংগ্রেস সম্মেলন শুরু হল ৭ই মার্চ—ঠিক সেইদিন যেদিন মিস্টার গান্ধীর অনশন ভঙ্গ হ'ল। মিস্টার বসু অসুস্থ ছিলেন বলে ধারণা এবং তিনি সম্মেলনে যোগদান করেন একটি স্ট্রেচারে করে। প্রধান যে প্রস্তাব ২১৮-১৩৫ ভোটে কমিটিতে এবং উন্মুক্ত সম্মেলনে বিনা বিরোধিতায় গৃহীত হয় তা মিস্টার গান্ধীর নীতি ও কর্মসূচীর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে এবং অবলুপ্ত ওয়ার্কিং কমিটির প্রতি আস্থাজ্ঞাপন করে মহাত্মার ইচ্ছা অনুসারে। নতুন কমিটির সদস্যদের সম্পর্কে মিস্টার গান্ধী ও কংগ্রেস সভাপতি ঐক্যমতে উপনীত হতে ব্যর্থ হন এবং ২৭শে এপ্রিল মিস্টার সুভাষ বসু পদত্যাগ করেন। সেই মানুষটির বিরুদ্ধে এই ছিল কংগ্রেস স্বৈরাচারীর প্রতিশোধ, যিনি ঠিক তিনমাস আগে স্বৈরাচারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ন্যায্যভাবে এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে কংগ্রেস সভাপতির পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

* * *

এটা কি ঘটনা অথবা ঘটনা নয় যে মিস্টার গান্ধী এবং তাঁর অনুগামীদের কোন প্রচেষ্টাই কখনও সফল হয় নি, কিংবা অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, হিংসা অথবা কষ্ট স্বীকার ভিন্ন আর কোন উল্লেখযোগ্য ফলাফলের দিকে পরিচালিত হয়নি?......

রাজনীতিকে সম্পূর্ণ বাদ দিলে, এমন কি সেইসব ক্ষেত্রে যেখানে কোন সরকারী বিরোধিতা ছাড়াই তিনি কাজকর্মের পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেছেন—উদাহরণস্বরূপ সেইসব ক্ষেত্র, যেমন সাম্প্রদায়িক ঐক্য, অস্পৃশ্যতা, মদ্যপান নিষিদ্ধকরণ এবং এমন কি চরকা কাটা—সেখানে মিস্টার গান্ধী নিজে শুরু করে কোন কাজকে কি কখনও সম্পূর্ণ করে তুলতে পেরেছেন ? তিনি কি প্রত্যেককে এইসব পরিকল্পনায় কিছুদূর পর্যন্ত অগ্রসর করিয়ে তারপর অসম্পূর্ণ অবস্থায় পরিত্যাগ করেন নি ?

বলা হয় যে, মিস্টার গান্ধী তাঁর সময় থেকে শত বৎসর এগিয়ে ছিলেন ; তা হতে পারে। কেবল শতাব্দীর অতিক্রমণই তা বলতে পারে। যদি তা সত্যি হয়, তবে এটিও সমভাবে সত্য যে, একজন মানুষ, যিনি সময় থেকে এতোখানি এগিয়ে, তিনি আমাদের প্রতিদিনকার পৃথিবীর দৈনন্দিন কাজকর্মের একজন বাস্তববাদী নেতা হিসেবে তাঁর অনেক পিছনের সারির নেতার থেকে বেশী কার্যকারী নন। আজ ভারতের প্রয়োজন একজন যুবকের অথবা একদল যুবকের, যাঁদের দৃষ্টি আছে অথচ যাঁরা অলীক কল্পনাপ্রবণ নন ; এমন একদল যুবক চাই যাঁরা পরিস্থিতির যথাযথ অবস্থা অনুযায়ী বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পারেন ; যাঁরা দৃঢ়তার সঙ্গে প্রয়োজনে দেখাতে পারেন আপস করার সাহসকে...

ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট লেবর পার্টি
মার্থীর, আবেরডেয়ার এবং ডিস্ট্রিক্ট ফেডারেশন
চেয়ারম্যান : ই. ওস্মেণ্ট
অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ : ডি. মূলকেহি
সম্পাদক : জি. উইলিয়মস্

দি সেক্রেটারী অব্ স্টেট ফর ইণ্ডিয়ার উদ্দেশ্যে লেখা সম্পাদকের ২৮শে মার্চ, ১৯৩৬ তারিখের চিঠির একটি কপি :

মহাশয়,

মিস্টার সুভাষচন্দ্র বসুর ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে সরকারের নিকট তীব্র প্রতিবাদ জানানোর জন্য উপরি-উক্ত সংগঠনের পক্ষ থেকে আমি নির্দেশ পেয়েছি।

আমি মনে করি যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একজন নাগরিক হিসেবে তাঁর লণ্ডন সফর করার তেমনই অধিকার আছে, যদি না আরো বেশী থেকে থাকে, যেমন রয়েছে বর্তমানে ইংল্যাণ্ডসফররত অন্যান্য দেশের জাতীয় প্রতিনিধিদের।

যাঁরা তাঁর ভারতে প্রত্যাবর্তন নিষিদ্ধ করেছেন তাঁদের তুলনায় ভারতে, তাঁর নিজের দেশে, আপন জনগণের মধ্যে, তাঁর বসবাস করার অধিকার নিশ্চয়ই বেশী রয়েছে।

আশা করি বিষয়টি অবিলম্বে ব্রিটিশ সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করবে।

আপনার একান্ত অনুগত

স্বা. জি. উইলিয়ম্‌স

সুভাষ বসুর গ্রেফতার
তাঁর অকাল মুক্তির আশঙ্কা

তথ্যের জন্য আরো দুটি তারবার্তা পেশ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী অথবা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে সুভাষ বসুকে মুক্তিদানের চিন্তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে বাংলার গভর্নরের এক দ্রুত কলকাতা সফরের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে।

মন্ত্রীদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও যদি বসু মুক্তি পান, তবে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক জারী-করা এক ওয়ারেণ্টের ভিত্তিতে তাঁকে স্পষ্টতই পুনরায় গ্রেফতার করা হবে।

স্বা : অস্পষ্ট

২২. ৭. ৪০

(আই. ও. আর. ফাইল নং এল / পি জে /৮ / ৬৩২)

জার্মানীতে ভারতের চরমপন্থী নেতা

"স্বাধীন ভারতে সৈন্য প্রেরণের চুক্তি"

নতুন দিল্লী, সোমবার

এখানে জানা গিয়েছে যে অক্ষশক্তির বেতার প্রচার, ভারতের চরমপন্থী নেতা সুভাষচন্দ্র বসুর অবস্থান সম্পর্কে কাউন্সিল অব স্টেট স্বরাষ্ট্র সচিব মিস্টার কনরান স্মিথের দেওয়া বিবৃতিটিকে সমর্থন করেছে।"

১২ই নভেম্বর এক ইতালীয় কেন্দ্র থেকে হিন্দুস্থানী ভাষায় প্রচারিত বেতার প্রচার জানায় : "জার্মান বেতার সুভাষচন্দ্র বসুর জার্মানীতে উপস্থিতির কথা ঘোষণা করেছে··· ভারতীয়গণ বসুর ভাষণের জন্য উদ্বেগ ও আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছে।

একই দিনে হিন্দুস্থানী ভাষায় প্রচারিত একটি জাপানী বেতার প্রচার ঘোষণা করে : "ভারতীয় ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের সভাপতি রাসবিহারী বসু সুভাষ বসুর নিরাপদে জার্মানীতে পৌছনোর জন্য এক অভিনন্দনজ্ঞাপক তারবার্তা পাঠিয়েছেন। সুভাষ বসু ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসে ভারত থেকে নিরুদ্দেশ হন। এখন এটা জানা গিয়েছে যে, তিনি

জার্মানিতে গিয়ে পৌঁছেছেন এবং ভারতকে স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে এক সৈন্যবাহিনী প্রেরণের জন্য চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন।"

ডি টি আই এস—১৭

আর আই ভি—২৩১৭

(আই ও. আর ফাইল নং পি জে/৬/৬৩৯ পৃ. ১৫)

গোপন সাংকেতিক তারবার্তা

ওয়্যারলেস্

ডব্লিউ. এস. ২৮ ২৯৯/১০

সেক্রেটারী অব স্টেট ফর ইণ্ডিয়া কর্তৃক

প্রেরিত: ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪, ১৯.১৫

ভারত সরকারের উদ্দেশ্যে,

গুরুত্বপূর্ণ ৪০৮৭ যুদ্ধ-দফতর, ডি. এম্. আই.-এর জন্য,

ফিজির গভর্নর জানাচ্ছেন যে, "সুভাষচন্দ্র বসুর মুক্তিবাহিনীর বিজয় অগ্রগতির" সংবাদ সেখানকার ভারতীয়দের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে এবং বিপক্ষে প্রচারের জন্য তথ্য চেয়ে পাঠিয়েছেন তিনি।

এম. ও. আইকে তথ্য প্রেরণের উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন উপনিবেশ সংক্রান্ত দফতর। কিন্তু এই সঙ্গে সুভাষ বসুর সৈন্যবাহিনী ও কার্যকলাপ সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ-সম্বলিত সারমর্মবাহী তারবার্তা প্রেরণের অনুরোধ জানিয়েছেন; একথা জানাতে অনুরোধ জানিয়েছেন যে, সেগুলি বর্মায় সামরিক অভিযানের পক্ষে বিপজ্জনক কিনা অথবা মূল্যের দিক থেকে কেবলই উপদ্রব মাত্র। তাঁরা এগুলি গভর্নরের ব্যক্তিগত তথ্যের জন্য চান এবং এডেন, মরিশাস ও পূর্ব আফ্রিকায় প্রেরণেও ইচ্ছুক।

আপনার সঙ্গে আলোচনা না করে কোন ব্যবস্থা নিতে অনিচ্ছুক। আপনি যদি সম্মত হন, তবে আপনি কি জানাতে চান তার সারমর্ম পাঠাতে অনুরোধ করছি। এম. আই ২-র সঙ্গে পরামর্শ করা হয়েছে এবং সম্মত হয়েছেন।

এম. আই. ২ কর্তৃক যুদ্ধ-দফতরে বিতরণ।

এম. আই ২-এর উদ্দেশ্যে (ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য):

(আই. ও. আর. ফাইল নং এল/ডব্লিউ এস/১৫৭৬)

আভ্যন্তরীণ তারবার্তা

গোপন

১০৪১৫

তথ্য দফতরের জন্য নির্দিষ্ট

কপিগুলি বিতরণ করা হয়েছে

সাংকেতিক তারবার্তা (ও. টি. পি.)

ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার দফতরের কাছ থেকে

সেক্রেটারী অব স্টেট ফর ইণ্ডিয়ার উদ্দেশ্যে

তাং নতুন দিল্লী, ভোর ৪.৩০ মিনিট, ২৫শে মার্চ, ১৯৪৪।

প্রাপ্তিস্বীকার : ভোর ৫.৪৫ মিনিট, ২৫শে মার্চ, ১৯৪৪,

গুরুত্বপূর্ণ

৩৩৫৯

টেকলার প্রেরিত একটি বার্তা আমরা সেন্সরে দেখতে পেয়েছি। তিনি জানাচ্ছেন যে, লণ্ডনের সান্ধ্য দৈনিকগুলি তোজোর বেতারপ্রচারকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছে। সে প্রচারে তিনি জানিয়েছিলেন যে, সুভাষ বসুর নেতৃত্বে ভারতের জাতীয় সৈন্যবাহিনী ভারত সীমান্ত অতিক্রম করেছে। ভারতীয় সংবাদপত্রে, বসু এবং ভারতের জাতীয় সৈন্যবাহিনীর প্রচার অগ্রাহ্য করার আমাদের নীতি অনুসারে, বার্তাটির প্রচার বন্ধ করা হয়েছে। বার্তাটি যদি লণ্ডনে দৃষ্টি আকর্ষণ করে চলে, তবে আপনার ওখানকার সংবাদ, দাতা ও এজেন্সিগুলি স্বাভাবিক ভাবেই বহির্বিশ্বে প্রেরিত বার্তাগুলিতে বিষয়টিকে উপেক্ষা করায় অনীহা প্রদর্শন করবেন। তাই আমাদের পরামর্শ হ'ল যে, নতুন পরিস্থিতি থেকে রাজনৈতিক ফয়দা তোলার টেকলারের প্রচেষ্টার মতো ব্যাপারগুলিকে যদি এড়াতে হয়, তবে সে পথে অগ্রসর হবার সবচেয়ে ভাল পন্থা হবে ইংল্যাণ্ডের সংবাদ-পত্রগুলির মাধ্যমে। গোপনে তাদের কাছে পরিস্থিতি বুঝিয়ে বলা কি সম্ভব হবে, সম্ভব হবে কি বসু এবং ভারতের জাতীয় সৈন্যবাহিনীর তথাকথিত কার্যাবলীকে হালকাভাবে উড়িয়ে দেওয়ার জন্য তাঁদের সহযোগিতার প্রার্থনা করা। এই বিষয়টির প্রচার এখন শত্রুদের পক্ষে সুবিধাজনক হয়েছে। তারা অবশ্যই চেষ্টা করছে ভারতের জাতীয় সৈন্য-বাহিনীকে এক নির্দিষ্ট যুদ্ধরত শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি পাইয়ে দেবার, যাতে তারা যুদ্ধের আইন এবং প্রথা অনুসারে সুযোগ-সুবিধা লাভ করে। যুদ্ধ-দফতরে প্রেরিত সামরিক গোয়েন্দা পরিচালন দফতরের ২৪শে মার্চের ৬৭৬৫২/১ নং তারবার্তাটিও লক্ষ্য করুন। সে কপিটি ইণ্ডিয়া অফিসে পাঠান হবে।

(আই. ও. আর. ফাইল নং এল/ডব্লিউ এস/১৫৭৬, পৃ. ৩৮৬)

তৎকালীন ইণ্ডিয়া অফিসে কর্মরত ব্যক্তিদের পরিচয়

মাইলস্ জন ক্লাউসন—এ্যাক্টীং প্রিন্সিপাল, পাবলিক এ্যাণ্ড জুডিসিয়াল ডিপার্টমেন্ট—১৫ই ডিসেম্বর তারিখে বোস সম্পর্কে বিবরণটি তিনি লেখেন।

স্যার স্যামুয়েল হোর—সেক্রেটারী অব্ স্টেট ফর ইণ্ডিয়া—আগষ্ট ১৯৩১ থেকে জুন ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত।

মারকুইস অব্ **জেটল্যাণ্ড**—সেক্রেটারী অব স্টেট ফর ইণ্ডিয়া—স্যার স্যামুয়েল হোরের পর ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত।

স্যার স্যামুয়েল এফ্ স্টুয়ার্ট—পারমানেন্ট আণ্ডার সেক্রেটারী অব স্টেট ফর ইণ্ডিয়া—১৯৩০, ১৯৪২।

রোলাণ্ড টেনিসন পীল—এ্যাক্টীং এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী, পাবলিক এ্যাণ্ড জুডিসিয়াল ডিপার্টমেন্ট ১৯৩১—১৯৩৭।

আর্ল উইনটারটন—পার্লামেন্টারী আণ্ডার সেক্রেটারী অব স্টেট ফর ইণ্ডিয়া—মার্চ ১৯২২—জানুয়ারী ১৯২৪ এবং নভেম্বর ১৯২৪—জুন ১৯২৯।

স্যার আর্থার হিরজেল—পারমানেন্ট আণ্ডার সেক্রেটারী অব স্টেট ফর ইণ্ডিয়া—১২ই জুন ১৯২৪ সালে নিযুক্ত হন।

স্যার ভারনন ডওসন—ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস থেকে ১৯২১ সালে পদত্যাগ করেন। প্রিন্সিপাল ইণ্ডিয়া অফিস এপ্রিল ১৯২১—এপ্রিল ১৯৩০। ১৯৩০ এপ্রিলে তিনি পাবলিক এ্যাণ্ড জুডিসিয়াল ডিপার্টমেন্ট-এর এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হন। ইণ্ডিয়ান রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে (১৯৩০-১৯৩২) ব্রিটিশ ডেলিগেটদের জয়েন্ট সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হন। মার্চ ১৯৪১ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

উইলফ্রেড জনস্টন—প্রিন্সিপাল, ইণ্ডিয়া অফিস (জুন ১৯২৯-ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯) ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯ সালে বার্মা অফিসের এ্যাক্টীং এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হন।

স্যার স্টুয়ার্ট কে ব্রাউন—ডিসেম্বর ১৯৩৪ সাল থেকে জানুয়ারী ১৯৪২ সাল পর্য্যন্ত এ্যাসিস্ট্যান্ট আণ্ডার সেক্রেটারীর পদে বহাল থাকেন। ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

আলেকজেণ্ডার ফ্রান্সিস্ মরলে—১৯৩৬ সালের ইন্টারন্যাশনেল লেবার কনফারেন্সে ভারত সরকারের উপদেষ্টা ও সেক্রেটারী হিসাবে যোগ দেন।

আমাদের প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

'শ্রী সেবাব্রত গুপ্ত প্রায় ত্রিশ বছর ধরে চিত্র সমালোচনা থেকে শুরু করে বাংলা চলচ্চিত্রের নানান দিক নিয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। বর্তমান সংকলনে চলচ্চিত্র সম্পর্কে শ্রীগুপ্তর এই দীর্ঘকালব্যাপী ভাবনা-চিন্তার একটা সমগ্র রূপ ধরা পড়েছে।'

—সত্যজিৎ রায়

'...সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে সিনেমার রঙ-ঢঙ-ও পাল্টেছে ক্রমাগত এবং স্বভাবতই লেখকের মনের ও মতেরও বদল ঘটেছে। বদল ঘটেছে হয়তো নিঃসাড়ে, হয়তো বা জানান দিয়েই। এবং এইখানেই বোধের কথাটা উঠে আসে যা কিনা তর্ক করে যুক্তি প্রয়োগ করে বোঝানো সম্ভব নয় সব সময়ে। লেখকের এই স্বীকারোক্তি অনু-ধাবনযোগ্য, সততার ছাপ সুস্পষ্ট।...' মৃণাল সেন (দেশ)

'...লেখকের সিনেমা সম্পর্কিত নিজস্ব ভাবনা-চিন্তা, মতাদর্শ ও নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা বলে রচনাগুলিতে স্বকীয়তার ছাপ রয়েছে যা পাঠককে যথেষ্ট ভাবায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সুস্থ বিতর্কের মুখোমুখি পৌঁছে দেয় ' —বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত (আনন্দবাজার পত্রিকা)

...'সিনেমার নিজের ভাষায়' তাঁর নিজের ভাষাতেই লেখা। অহেতুক উদ্ধৃতি নেই, পাদটীকার কাঁটাবেড়া নেই, মামুলী কিংবা বাড়তি বাত গদাইলস্করি চালে পরিবেশন করার প্রবণতা নেই। এই ছিমছাম বইটিতে রয়েছে চলচ্চিত্র প্রাসঙ্গিক চব্বিশটি নির্মেদ প্রবন্ধ।...

—রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (আজকাল)

সেবাব্রত গুপ্ত-এর এই মুহূর্তে চলচ্চিত্র বিষয়ক সর্বাধিক মূল্যবান গ্রন্থ

সিনেমার নিজের ভাষায় ১৫·০০